ISSN-0971-8435

বিশেষ সংখ্যা

যোজনা

ধনধান্যে

ডিসেম্বর ২০১৫ উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা ₹২০

জলবায়ু পরিবর্তন ও সুস্থায়ী উন্নয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও সুস্থায়ী উন্নয়ন
কে জি সাক্সেনা

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যয়সমূহ
পূর্ণমিতা দাশগুপ্ত

জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তি এবং সুস্থায়ী শক্তিসম্পদ
মালতী গোয়েল

বিশেষ নিবন্ধ
সাম্য এবং একটি বিশ্বজনীন জলবায়ু চুক্তি
টি জয়রামন

ফোকাস

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও কৃষি সুরক্ষা

এম এস স্বামীনাথন

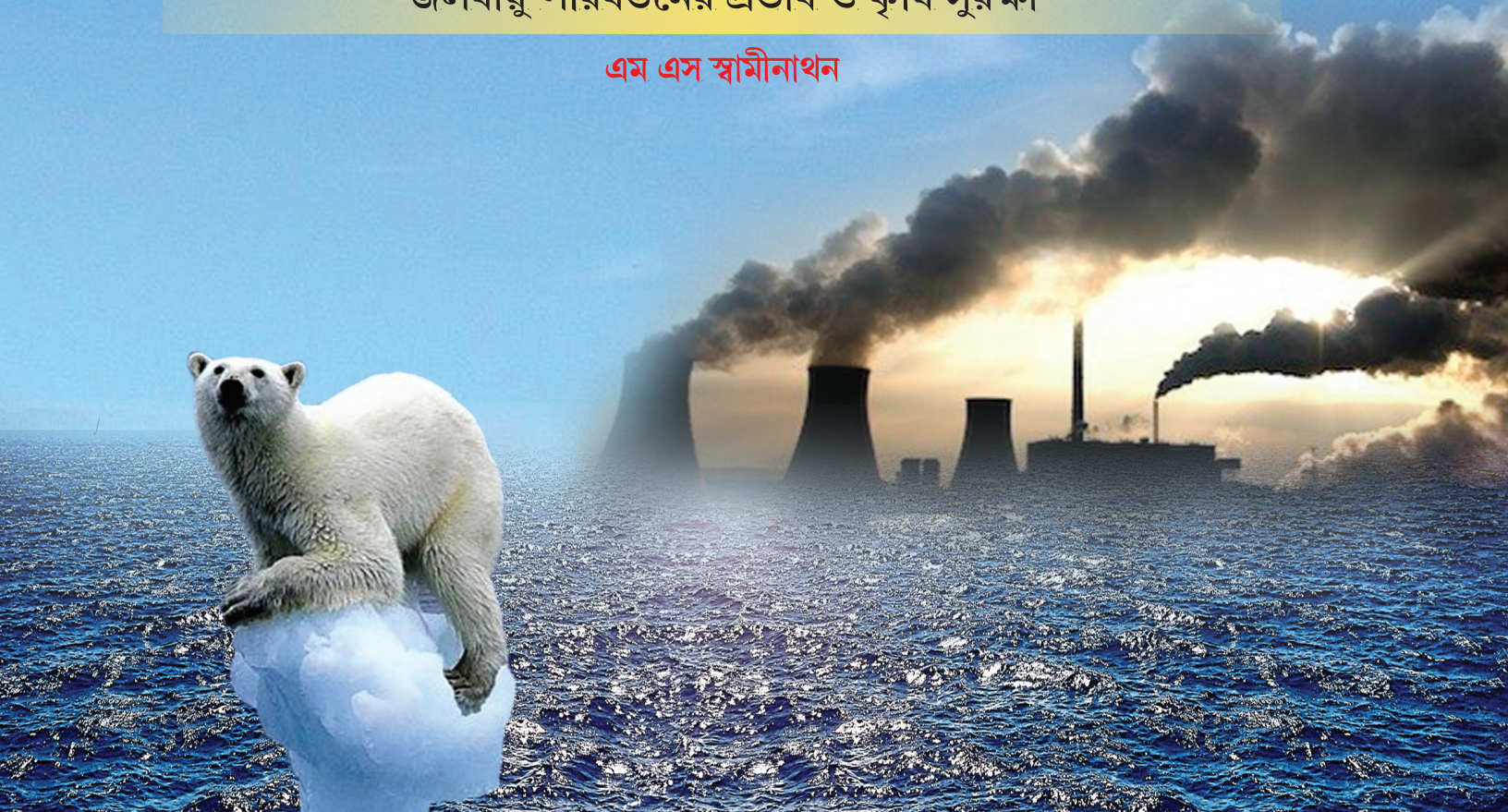

জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমন—তাৎপর্য

ওয়ারশয়তে ২০১৩ সালের ১৯তম 'কনফাররেন্স অব পার্টিস'-এ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রত্যেকটা দেশ ২০২০ সালের পর কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন করবে তার রূপরেখা নির্ধারণ করে তা ঘোষণা করবে—একেই প্রত্যেকটা দেশের জন্য জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমন (INDC) বলা হবে। এটা নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫-র প্যারিসে রাষ্ট্রসংঘের ২১তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে পেশ করা হবে এবং তা নতুন আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তির আওতায় পড়বে। জাতীয় নীতি ও লক্ষ্য, পরিস্থিতি ও ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে অভিপ্রেত নির্গমন জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত হবে। আন্তর্জাতিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কম কার্বন নির্গমনকারী, জলবায়ু সুস্থিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। কোনও দেশের জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমন জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন, কার্বন-মুক্ত ও জলবায়ু সুস্থিত ভবিষ্যতের যৌথ লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে আন্তর্জাতিক স্তরে তারা কীভাবে সহযোগিতা করতে পারবে বা কী ধরনের সহযোগিতা তাদের প্রয়োজন, এ সব বিষয়গুলোর প্রতি সেই দেশের অভিমুখের প্রতিফলন। দেশগুলো ২০১৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্যারিসে আয়োজিত রাষ্ট্রসংঘের ২১তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে এই জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমনের প্রস্তাব পেশ করবে, যা কিনা নতুন আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তির সূচনা করবে।

এক ঝলকে ভারতের জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমন

দূষণবিহীন শক্তি, বিশেষত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, শক্তির ব্যবহারে অপচয় কম করা, কম কার্বন নিবিড় ও সুস্থিত শহুরে কেন্দ্র স্থাপন করা, বর্জ্য থেকে সম্পদ গড়া, সুরক্ষিত, স্মার্ট ও সুস্থায়ী পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, দূষণ রোধ করার মতো নীতি ও প্রকল্প এবং বনভূমির প্রসার ঘটিয়ে অতিরিক্ত 'কার্বন সিঙ্ক' সৃষ্টি করার ভারতের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে ভারতের জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমন নির্ধারণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে নাগরিক ও বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকার কথাও মাথায় রাখা হয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমনের প্রস্তাবের আওতাধীন :

ক। সুসাধ্য জীবনশৈলী; **খ**। দূষণবিহীন আর্থিক উন্নয়ন; **গ**। মোট জাতীয় উৎপাদনের নির্গমন নিবিড়তা হ্রাস; **ঘ**। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যতীত বিকল্প উৎসের শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি; **ঙ**। অতিরিক্ত কার্বন সিঙ্ক সৃষ্টি (বনভূমির প্রসার); **চ**। অভিযোজন; **ছ**। তহবিল গড়া; **জ**। প্রযুক্তির হস্তান্তর ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি।

জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

- পরম্পরা ও চিরায়ত মূল্যবোধ-ভিত্তিক স্বাস্থ্যকর ও সুসাধ্য জীবনশৈলী সূচনা ও প্রসার
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম-পর্যায় অন্যদের তুলনায় কম দূষণকারী ও জলবায়ু-বান্ধব পথ অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়া
- ২০০৫ সালের তুলনায় ২০৩০ সালের মধ্যে নির্গমনের তীব্রতা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩৩-৩৫ শতাংশ কমিয়ে আনা
- প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সবুজ জলবায়ু তহবিল (গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড)-এর মতো স্বল্পব্যয়ের অর্থ-ভাণ্ডারের সাহায্যে ২০৩০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যতীত শক্তির উৎস থেকে ক্রমসঞ্চিত বৈদ্যুতিন শক্তির প্রায় ৪০ শতাংশ অর্জন করা
- বন ও বনাঞ্চল আরও প্রসারিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে ২.৫-৩ বিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর সমতুল্য কার্বন সঞ্চিত রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন অতিরিক্ত 'কার্বন সিঙ্ক' সৃষ্টি করা
- যে সব ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি, বিশেষত কৃষি, জলসম্পদ, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, তটবর্তী অঞ্চল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থার মতো ক্ষেত্রের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়িয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন করা
- পূর্বোল্লেখিত প্রশমন ও অভিযোজন সংক্রান্ত পদক্ষেপ প্রণয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও উপলব্ধ সম্পদের ঘাটতির প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ এবং উন্নত দেশগুলো থেকে নতুন ও অতিরিক্ত অর্থ তহবিলের ব্যবস্থা করা
- ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতে অত্যাধুনিক জলবায়ু প্রযুক্তির প্রসার তথা ভবিষ্যতে সহযোগিতামূলক যৌথ গবেষণা ও উন্নয়নের দ্রুত আদান-প্রদানের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কাঠামো সৃষ্টি করা

ডিসেম্বর, ২০১৫

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- জলবায়ু পরিবর্তন ও সুস্থায়ী উন্নয়ন — কে জি সাক্সেনা ৫
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যয়সমূহ — পূর্ণমিতা দাশগুপ্ত ৯
- জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তি এবং সুস্থায়ী শক্তিসম্পদ — মালতী গোয়েল ১৩
- জলবায়ু সুস্থিত কৃষি — ড. সগর মৈত্র ২০
- অথ জলবায়ু কথা — অনিন্দ্য ভুক্ত ৩০
- উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্ব এবং উষ্ণায়ন — দেবজ্যোতি চন্দ ও অমর্ত্য সাহা ৩৬
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্যারিস সম্মেলনে কী হবে — ড. মোহিত রায় ৩৯
- জলবায়ুর পরিবর্তন ঠেকাতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ভূমিকা — অমিত কুমার ৪৩
- মানবসভ্যতা ও সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ওপর জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণের প্রভাব — ড. জে এস পান্ডে ৪৭
- জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা — ড. অনিল কুমার গুপ্তা ৫২
- জলবায়ু পরিবর্তন ও সুস্থিত উন্নয়ন — সুভাষ শর্মা ৫৭

বিশেষ নিবন্ধ

- সাম্য এবং একটি বিশ্বজনীন জলবায়ু চুক্তি — টি জয়রামন ৬১

ফোকাস

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও কৃষি সুরক্ষা — এম এস স্বামীনাথন ৬৫

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — ভাটিকা চন্দ্রা ৬৭
- যোজনা ডায়েরি — পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৬৮

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

ধরিত্রী মাতার পরিত্রাণ

কথায় বলে যে, 'পৃথিবী মানুষের নয়, মানুষ পৃথিবীর।' তবুও মানুষ নির্বিকারে সর্বদাই পৃথিবীকে নিজের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক একটা প্রতিবেদন অনুযায়ী 'আর্থ ওভারশুট ডে' (অর্থাৎ, প্রাকৃতিক সম্পদের বিশ্বজনীন চাহিদার যেটুকু এক বছরে এই গ্রহের বাস্তুতন্ত্র পুনর্নবীকরণ করতে পারবে সেই মাত্রা যেদিন ছাড়িয়ে যায় সেই দিনটা) ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ৬ দিন এগিয়ে এসেছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, গত ১৫ বছরে, এই 'আর্থ ওভারশুট ডে' ক্রমশ এগিয়ে আসছে—২০০০ সালে ১ অক্টোবর থেকে গত বছর ১৯ আগস্ট, আর এ বছর ১৩ আগস্ট। এর মানে, আমরা ইতিমধ্যেই এ বছরের বরাদ্দ বাস্তু-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেছি।

পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং জীবনের মানোন্নয়নের জন্য মানুষের চাহিদার বাড়-বাড়ন্তের ফলে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সৃষ্টি হয়েছে। এই সব উদ্ভাবন জীবনকে আরও আরামদায়ক করেছে বটে, কিন্তু এর ফলে খাবার, বাতাস, জল, খনিজ ও শক্তির চাহিদা বেড়ে গেছে। অথচ, এ সব সম্পদ পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ক্ষমতা সীমিত। আমাদের আশপাশের প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুতগতিতে নিঃশেষ হওয়ার কারণে ভূমণ্ডলীয় জলবায়ুতে যে নজিরহীন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তার ফলে পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। এটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে ডায়নোসররা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি বলেই তাদের বিলোপ ঘটে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ প্রজাতির (প্রাণী/উদ্ভিদ) বিলোপ ঘটতে চলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি প্রাকৃতিক, যান্ত্রিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেনের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমনের ফলে ভূমণ্ডলের জলবায়ুতে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন আসে, সেই দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়। এই সব গ্যাস স্ট্রাটোস্ফিয়ার বা আন্তর-আকাশে জমা বা সঞ্চিত হয়ে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তাপ আটকে রাখে, যার ফলে ভূমণ্ডলীয় উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর ধারায় পরিবর্তন ঘটে। ঋতুর সাধারণ সময়কাল বদল, ভূমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান, কৃষির ধারায় পরিবর্তনের ফলে দেখা দিয়েছে ভূস্খলন, সুনামি, খরা, দুর্ভিক্ষ, জনসংখ্যার প্রব্রজন এবং ব্যাপক স্বাস্থ্যজনিত বিপত্তি; শুধুমাত্র আমরাই নই, এ বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমাদের আগামী প্রজন্মের উপরও।

যোজনা

এখন টেকসই সমাধানসূত্রের কথা ভাবতে হবে। ক্ষণস্থায়ী সমাধান নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের কথাও মাথায় রাখতে হবে। এটা বোঝা দরকার যে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত, আর সেই জন্য টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে এগুলোর ব্যবহার পরিমিতভাবে করতে হবে। পরিবেশবান্ধব বিকল্প উৎস যেমন বায়ুকল, জলবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ, পার্থিব-তাপীয় ও বায়ো-মাস (জীবসমষ্টি) থেকে শক্তি উৎপাদন করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে তা কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকোপ থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা কোনও দেশেরই একার দায়িত্ব নয়, সারা দুনিয়াকে এক সঙ্গে এর প্রতিরোধ করতে হবে। এই দিশায় বিশ্বজনীন যৌথ প্রয়াসের সূচনা হয় ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেইরোতে—জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের কাঠামোগত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মাধ্যমে। প্যারিসে রাষ্ট্রসংঘের একুশতম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে দেশগুলো জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমনের প্রতিশ্রুতি দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারত ইতোমধ্যেই জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমনের প্রস্তাব দিয়েছে—ভারতের উদ্দেশ্য গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমনের মাত্রা ৩৩-৩৫ শতাংশ কম করা, যার জন্য দূষণবিহীন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যতীত বিকল্প উৎসের ব্যবহার করা, বনভূমির প্রসার ঘটিয়ে আরও ২.৫-৩ বিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমতুল্য 'কার্বন সিঙ্ক' (যেখানে পৃথকীকরণের পর কার্বন সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব) সৃষ্টি করা, কম কার্বন নিবিড় ও সুস্থিত শহরে কেন্দ্র স্থাপন করা, বর্জ্য থেকে সম্পদ গড়া, সুরক্ষিত, স্মার্ট ও সুস্থায়ী বা টেকসই পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রভৃতি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও এই ক্ষেত্রে ভারত উন্নত দেশগুলোর থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নতুন তহবিল গড়তে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তথা সহযোগিতামূলক গবেষণা ও উন্নয়নের আদান-প্রদানের জন্য একটা আন্তর্জাতিক কাঠামো স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর। এই অভিপ্রায় থেকেই জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে 'সমস্যার অংশ না হওয়া সত্ত্বেও, সমাধানসূত্রের অংশ হওয়ার' ভারতের অঙ্গীকার স্পষ্ট।

গান্ধীজি বলতেন, 'সকলের প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট সম্পদ পৃথিবীর আছে, কিন্তু সকলের লোভের জন্য নয়।' সারা দুনিয়া আজ এক হয়ে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে এগিয়ে এসেছে, যাতে আমরা সকলের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সম্পদ সৃষ্টি করতে পারি। ❑

জলবায়ু পরিবর্তন ও সুস্থায়ী উন্নয়ন

উন্নয়ন। আরও আরও উন্নয়ন। মানুষের এই অন্তহীন লোভের হাড়িকাঠে বলি হয়েছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। পরিবেশের ভোল গেছে বদলে। উষ্ণায়ন আজ আর কোনও বিশেষ দেশের সমস্যা নয়। বিশ্বজোড়া। স্থাবর-জঙ্গম আতান্তরে পড়েছে সবাই। ঠেলায় পড়ে সমাধানের পথ হাতড়াচ্ছে উন্নয়নের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মানুষ। চটজলদি বেহিসেবি উন্নয়ন নয়। মুশকিল আসান হতে পারে টেকসই বা সুস্থায়ী উন্নয়ন। টেকসই উন্নয়নের কিছু তত্ত্বতালাশ মিলবে **কে জি সাক্সেনা**-*র এই নিবন্ধে।*

উন্নয়ন এক নিয়ত কর্মকাণ্ড। আরও উন্নত বা পরিপূর্ণ জীবনযাপনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেদের সামর্থ্য বাড়ানো অথবা কাজে লাগাতে তা মানুষকে শক্তি জোগায়। প্রকৃতির পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা সীমিত। আর এই প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারের উপরেই নির্ভর করছে মানবজীবনের অস্তিত্ব। জনসংখ্যার বাড়বাড়ন্ত, প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি এবং গত দু'শতক যাবৎ উদ্ভাবিত নিত্যনতুন রাসায়নিক (যেমন রাসায়নিক কীটনাশক, প্লাস্টিক) পদার্থ বাস্তুসংস্থানে ছড়িয়ে যাওয়ার দরুন পরিবেশের ভোল গেছে বদলে। মানুষ পড়েছে আতান্তরে। জীবনযাত্রার কিছু ক্ষেত্রে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে (যেমন, শীতাতপ, সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ) থাকতে গিয়ে মানুষকে মাশুল গুনতে হয়েছে বইকি। হাজির হয়েছে আনকোরা সব সমস্যা। জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র হানি, ভূ এবং জল সম্পদের ক্ষয় ও অবনয়ন। আর উন্নয়নে অসাম্য, মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদনে প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন ও ভূকম্পের মতো আগেকার সমস্যার প্রকোপ বেড়েছে। পরিবেশ/বাস্তুসংস্থান বিকাশের অগ্রগতি আমাদের জানিয়েছে স্বাভাবিক বাস্তুসংস্থানের পক্ষে মানুষের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকর্ম সইয়ে নেবার ক্ষমতা সীমিত। এর পাশাপাশি, সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্ব নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিভিন্ন রকমের সমাজবিজ্ঞান। এসব বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা জেনেছি স্থানীয় মহল্লা থেকে বিশ্ব এবং স্বল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ এর সমস্যা ও সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে স্থায়ী উন্নয়নের ভিত্তি। একেই ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশন অন্যভাবে বলেছে "ভাবী প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না করে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের এক প্রক্রিয়া।" এই সংখ্যা ১৯৯২-এ রিওতে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ সম্মেলনে (সাধারণ্যে বসুন্ধরা শিখর সম্মেলন বলে পরিচিত) যথেষ্ট সাধুবাদ কুড়িয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC) এবং কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি চালুর ফলে জীববৈচিত্র হানি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অস্থায়িত্বের আশঙ্কা থেকে মানবজাতিকে রেহাই দেবার এক আন্তর্জাতিক কর্মকৌশল বা স্ট্র্যাটেজি তৈরি হয়েছে। গড়ে উঠেছে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি (GEF)-এর মতো পরিবেশ-উন্নয়ন তহবিল ব্যবস্থা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে বায়ুমণ্ডলের গঠন, জমির ব্যবহার, মরুভূমির বিস্তার, জীবাণু হানা ইত্যাদিতে। রদবদল ঘটে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক আবহেও (যেমন, বিশ্বায়ন, অবাধ বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক অভিযোজন, নতুন মেধাস্বত্ব ব্যবস্থা এবং দ্বিপাক্ষিক/বহুপাক্ষিক সহযোগিতা/জোট)। যুগপৎ হরেক সমস্যার আসানে যথেষ্ট কার্যকর বলে সুস্থায়ী উন্নয়ন কৌশলের গুরুত্ব অনেক। জোহানেসবার্গে ২০০২-এর সুস্থায়ী উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ সম্মেলন সুস্থায়ী উন্নয়ন তত্ত্বে আরও জোরদার সমর্থন করে। সুস্থায়ী উন্নয়নের মূল কথা, তা হবে পরিবেশবান্ধব, অর্থনৈতিক দিক থেকে সক্ষম ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত। সম্মেলনে এজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও মানব সম্পদ বাড়ানোর বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

কেন এই জলবায়ু পরিবর্তন। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর বাড়বাড়ন্ত এজন্য দায়ী। জলবায়ুর রদবদল রোখার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গমন কমানো এবং বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ হ্রাস করা দরকার। জলবায়ুর ভোলবদলের চলতি ধাঁচ থামাতে না পারলে আগামী দিকে প্রাণবৈচিত্র সংরক্ষণ ব্যাহত হবে। বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মানুষের হতশ্রী জীবনযাত্রার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জীববৈচিত্র ব্যবস্থাপনাকে হাতিয়ার করার লক্ষ্যে এ দশকের দুটি বড়সড় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ—ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম অন বায়োডাইভারসিটি অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস (IPBES) এবং দ্য রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিস প্রোগ্রাম

সারণি-১
সহস্রাব্দ উন্নয়ন আশা, লক্ষ্য এং ফল

আশা	লক্ষ্য	ফল
১। ভুখ ও গরিবি কমানো	দিনে ১ ডলারের কম রোজগেরেদের অনুপাত ১৯৯০ এবং ২০১৫-এর মধ্যে অর্ধেক নামিয়ে আনা	বিশ্বে হতদরিদ্রদের অনুপাত অর্ধেক কমেছে।
	সকলের জন্য কাজ	উন্নয়নশীল দেশে দিনপিছু ১.২৫ ডলারের কম খরচে জীবন কাটানো লোকের সংখ্যা ২০১০-এ ৪৭ শতাংশ থেকে কমে ২২ শতাংশ।
	ভুখা লোকের অনুপাত ১৯৯০ এবং ২০১৫-র মধ্যে আধা কমানো	অপুষ্টিপীড়িতদের অনুপাত ১৯৯০-৯২-এর ২৩.২ শতাংশ থেকে নেমে ২০১০-১২-তে ১৪.৯ শতাংশ। ৮৭ কোটি মানুষ (১৩ শতাংশ) এখনও খিদেয় ভোগে।
২। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা	২০১৫-র মধ্যে সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা	সাক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক ও যুবাদের হার বৃদ্ধি, সাক্ষরতায় মেয়েদের পিছিয়ে থাকা কমছে, স্কুল-ছুটদের সংখ্যা হ্রাস—২০০০-এ ১০ কোটি ২০ লক্ষের জায়গায় ২০১১-য় ৫ কোটি ৭০ লক্ষ। ২০১০-এ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি ৯০ শতাংশ শিশু।
৩। লিঙ্গ অর্থাৎ নারী-পুরুষ সমতার বিকাশ এবং মেয়েদের ক্ষমতা বাড়ানো	সম্ভব হলে ২০০৫-এর মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ছেলে ও মেয়েদের অনুপাতের ফারাক দূর করা এবং ২০১৫-র মধ্যে সব স্তরে।	২০১২-তে খেতখামার ছাড়া অন্যান্য কাজে মেয়েদের নিযুক্তি বেড়ে ৪০ শতাংশ। আর আইনসভায় মহিলা সদস্য বৃদ্ধি ২০ শতাংশ।
৪। শিশু মৃত্যু হ্রাস	১৯৯০ থেকে ২০১৫-র মধ্যে ৫ বছরের কম বয়েসি শিশু মৃত্যু দুই-তৃতীয়াংশ কমানো।	১৯৯০ থেকে এই মৃত্যু কমেছে ৪৭ শতাংশ। তা সত্ত্বেও প্রতিদিন মারা যাচ্ছে ১৭ হাজার শিশু। সাহারা-লাগোয়া আফ্রিকার দেশগুলিতে ৫-এর কম বয়েসি ১০টি শিশুর মধ্যে মৃত্যু হচ্ছে ১ জনের। এই হার উন্নত দেশের তুলনায় ১৫ গুণ বেশি।
৫। প্রসূতিদের স্বাস্থ্যের মান বৃদ্ধি	১৯৯০ থেকে ২০১৫-র মধ্যে প্রসূতি মৃত্যুহার দুই-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা।	গত দু' দশকে এই মৃত্যুহার কমেছে ৪৭ শতাংশ।
	২০১৫-র মধ্যে সব গর্ভবতীর জন্য স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা	উন্নয়নশীল বিশ্বে গর্ভবতী মহিলাদের মাত্র অর্ধেক প্রসবের আগে চারবার ডাক্তার দেখানোর সুযোগ পায়। উপযুক্ত পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে উন্নয়শীল দেশে প্রসূতি মৃত্যুর অধিকাংশ রোধ করা সম্ভব। স্বাস্থ্য পরিচর্যার মধ্যে পড়ে পরিবার পরিকল্পনা, দক্ষ দাই বা নার্সের তত্ত্বাবধানে প্রসব ইত্যাদি।
৬। এইচআইভি/এডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোধ প্রতিরোধ	২০১৫-র মধ্যে এইচআইভি/এডস-এর বিস্তার রোধ	বিশ্বে নতুন এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস। ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত কমেছে ৩৩ শতাংশ। ২০১২-তে ২০০১-এর তুলনায় ১৫ বছরের নীচের বয়েসিদের মধ্যে আক্রান্ত ২ লক্ষ ৯০ হাজার কম।
	এইচআইভি/এডসে আক্রান্তদের জন্য চিকিৎসার সুযোগ	২০১২-তে ৯৭ লাখ মানুষ অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি পেয়েছে। এ এক রেকর্ড।
	২০১৫ নাগাদ ম্যালেরিয়া ও অন্য সব বড়সড় রোগ বিস্তার প্রতিরোধ ও নির্মূল করার সূচনা	এই শতকের প্রথম দশকে ১১ লক্ষ ম্যালেরিয়া রুগিকে বাঁচানো গেছে। আর যক্ষ্মা থেকে সেরে উঠেছে কমবেশি ২ কোটি লোক।
৭। পরিবেশ টিকিয়ে রাখা সুনিশ্চিত করা	দেশের নীতি ও কর্মসূচিতে স্থায়ী উন্নয়নের তত্ত্বকে জোড়া এবং পরিবেশ সম্পদের ক্ষতি পূরণ করা	১৯৯০-এর পর থেকে বিশ্বে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন বেড়েছে ৪৬ শতাংশের বেশি।
	প্রাণবৈচিত্রের ক্ষয়ক্ষতি কমানো, ২০১০-এর মধ্যে এই ক্ষতি যথেষ্ট হ্রাস করা।	চটজলদি লাভের হাতছানিতে নির্বিচারে মাছ ধরা। সামুদ্রিক মাছের এক-তৃতীয়াংশের অস্তিত্ব আজ সংকটে। সংরক্ষিত এলাকা বাড়লেও আরও অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির মুখে। বনজঙ্গল লোপাটের হার আশঙ্কাজনক বিশেষত দক্ষিণ-আমেরিকা ও অফ্রিকায়।
	শুদ্ধ পানীয় জল ও সাফাই ব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিতদের সংখ্যা ২০১৫-র মধ্যে অর্ধেক কমিয়ে ফেলা	১৯৯০-এর পর থেকে এ যাবৎ ২০১ কোটির বেশি মানুষের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রান্ত। ১৯৯০-এর তুলনায় এখন প্রায় ২০০ কোটি বেশি লোকের উপযুক্ত সাফাই ব্যবস্থার সুযোগ মিলছে। তবে ২৫০ কোটি মানুষের এখনও শৌচালয় নেই। মাঠেঘাটেই তার কাজ সারে।
	২০২০ সাল নাগাদ নিদেনপক্ষে ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার যথেষ্ট উন্নতি।	উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বস্তিতে দিন গুজরান করে প্রায় ৮৬ কোটি ৩০ লক্ষ লোক।
৮। আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব	কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই।	

অব দ্য ইউনাইডেট নেশনস (UN-REDD)।

হলফ করে বলা যায় বিশ্ব উষ্ণায়ন হালফিল বেড়েছে নজিরবিহীন। জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা নিয়ে হিসেবনিকেশের চুলোচুলির অবশ্য কমতি নেই। একুশ শতকে গোটা বিশ্বে তাপমাত্রা বেড়েছে কোনও হিসেবে ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আবার কোনও হিসেবে ৫.৮° সেন্টিগ্রেড। এই দুইয়ের মাঝে আছে আরও অনেক হিসাব কেতাব। আর ভারতের বেলায় এই হিসেব দাঁড়িয়েছে ০.৪ থেকে ২.০° সেন্টিগ্রেড। ভবিষ্যতে বৃষ্টিপাত বিশেষত খরা ও বানবন্যা নিয়েও থাকছে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা। হিসেবনিকেশে তারতম্যের পিছনে আছে নানাবিধ কারণ। তবে কিনা, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার এক রায়—জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছেই। আর এর মাত্রা কমানোর পাশাপাশি এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রয়োজন নিয়েও তাদের মধ্যে নেই কোনও মতভেদ। বস্তুত, প্রায় সব বৈজ্ঞানিক অনুমানের সঙ্গে জুড়ে থাকে কমবেশি অনিশ্চয়তা। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটা ঢের বেশি। স্থানীয় স্তরে জলবায়ু পরিবর্তনের বেলায় একথা খাটে বেজায়। আর এই স্থানীয় স্তরে জলবায়ু নিয়েই মানুষজনের যত মাথাব্যথা।

জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন সব জায়গায় একই রকম প্রভাব পড়ে না। এই পরিবর্তন কমানো এবং তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতারও স্থানবিশেষে রকমভেদ আছে। জলবায়ু পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে পাহাড়-পর্বতের মতো উঁচু এবং দ্বীপের মতো নাবাল জায়গায়। বনজঙ্গল এবং গাছপালা ঘেরা স্থানের পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন রুখবার ক্ষমতা বেশি। প্রাণবৈচিত্রে সমৃদ্ধ এলাকা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানানসই, নতুন জাতের শস্য উদ্ভাবনের জন্য জিন মেলার পক্ষে আদর্শ জায়গা। গবাদিপশুর ক্ষেত্রেও একথা খাটে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য তাই এহেন এলাকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য পাহাড়ি অঞ্চলের তুলনায় হিমালয়ের মতো এলাকার দিকে বিশ্বের নজর বেশি। কারণ, (১) জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা এখানে বেশি। এবং হিমালয় আঞ্চলিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। (২) বিশ্বের ৩৪টি প্রাণবৈচিত্রে সমৃদ্ধ এলাকার অন্যতম। শস্য বৈচিত্রের আটটি কেন্দ্রের মধ্যে এটি একটির অংশ। তাই প্রাণসম্পদে সমৃদ্ধ এই এলাকা বিশ্ববাসীর অনেক কল্যাণের ক্ষমতা ধরে। (৩) দুই মেরু অঞ্চলের পর এখানেই আছে সবচেয়ে বেশি বরফস্তূপ। এর বরফগলা জলে পুষ্ট হচ্ছে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেকং-এর মতো নদনদী। কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভর করছে এসব নদনদীর উপর। (৪) হিমালয়কে ঘিরে আছে আট-আটটি

সারণি-২

২০০০-২০১৫-এর জন্য নেওয়া আট সহস্রাব্দ উন্নয়ন সংকল্প এবং সতেরো সুস্থায়ী উন্নয়ন সংকল্প

সহস্রাব্দ উন্নয়ন সংকল্প (২০০০-২০১৫)	সুস্থায়ী উন্নয়ন সংকল্প (২০১৫-২০৩০)
১। ক্ষুধা ও গরিবি কমানো	১। গরিবি হঠানো ২। ক্ষুধা দূর
২। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা	৪। সবার জন্য উন্নত মানের শিক্ষা
৩। নারী-পুরুষ সমতার বিকাশ ও মেয়েদের ক্ষমতা বৃদ্ধি	৫। নারী-পুরুষ সমতা অর্জন
	১০। দেশের ভিতর ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে অসমতা হ্রাস
৪। শিশু মৃত্যু কমানো ৫। গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ৬। এইচআইভি/এডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ	৩। সুস্থ সবল জীবন নিশ্চিত করা এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিকাশ
৭। পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখা	৬। সকলের জন্য জল ও সাফাই ৭। সবাইকে নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি, দাম যেন সাধ্যে কুলোয় ৮। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এতে শামিল করতে হবে সব শ্রেণির মানুষকে, সকলের জন্য উপযুক্ত কাজ ৯। মজবুত পরিকাঠামো তৈরি, টেকসই শিল্পায়নের বিকাশ ও উদ্ভাবনে পৃষ্ঠপোষকতা ১১। নগর ও অন্যান্য জনবসতিকে নিরাপদ, প্রাণবন্ত, টেকসই করা ১২। টেকসই ভোগ ও উৎপাদন পদ্ধতি ১৩। জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাবের মোকাবিলায় জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া (ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ—UNFCCC-এর চুক্তির কথা মাথায় রেখে) ১৪। সুস্থায়ী উন্নয়নের স্বার্থে সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও বুঝেশুনে ব্যবহার ১৫। স্থলভূমির বাস্তু সংস্থান রক্ষা, পুনরুদ্ধার ও বুঝেশুনে কাজে লাগানো
৮। আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের বিকাশ	১৬। সুস্থায়ী উন্নয়নের খাতিরে সবাইকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজের বিকাশ, সকলের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ এবং সব স্তরে কার্যকর, দায়বদ্ধ, সবার জন্য অবারিত প্রতিষ্ঠান গড়া ১৭। সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ফের চাঙ্গা করার উপায়সুপায় জোরদার করা

উন্নয়নশীল দেশ—পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, চীন, ভুটান, মায়ানমার। এসব জায়গায় স্থানীয় মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন কমানো/মানিয়ে নেওয়া এবং প্রাণবৈচিত্র সংরক্ষণ জরুরি। এখানে সুস্থায়ী উন্নয়নের সুফল যাতে গোটা বিশ্ব পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় মানুষের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়গুলির সঙ্গে উন্নত বিশ্বের পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে সংগতি। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাণবৈচিত্র নিয়ে উদ্বেগ-আশঙ্কা হিমালয় লাগোয়া উন্নতশীল দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতায় উৎসাহ জোগাবে। একথা খাটে উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রেও। গোটা বিশ্বে হিমালয়ের গুরুত্ব ঠাহর করে ভারত জলবায়ু সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে 'হিমালয় বাস্তুসংস্থান বজায়' রাখার এক জাতীয় মিশন হাতে নিয়েছে।

ক্রমে ক্রমে বোঝা গেল যে "অস্থায়ী উন্নয়ন অর্জন" এক আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি বা কর্মকৌশল। একে বাস্তবায়িত করার জন্য সময় বেঁধে সংকল্প নির্দিষ্ট করা দরকার। এই উপলব্ধি থেকে রাষ্ট্রসংঘ ঠিক করল সহস্রাব্দ উন্নয়নের আটটি সংকল্প (এইট মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস)। পরিবেশ বজায় রাখা সংকল্পের আওতায় পড়ে জলবায়ু পরিবর্তন। সেইসঙ্গে প্রাণবৈচিত্র, জলসম্পদ ও জনবসতির মতো পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়। ২০০০-২০১৫ সাল সময়কালে গরিবি, ভুখ, মৃত্যু কমেছে। সমতাভিত্তিক উন্নয়ন বিকাশ লাভ করেছে। পরিবেশ উন্নয়নে ততটা সাফল্য আসেনি অবশ্য। জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস এবং প্রাণবৈচিত্র সংরক্ষণ প্রচেষ্টার সফলতা সীমিত (সারণি-১)। সব বাস্তুসংস্থান প্রণালী পরিষেবার ভিত্তি হচ্ছে প্রাণবৈচিত্র। আর এই দুটি একযোগে জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় আমাদের মস্ত বড় অবলম্বন। অন্যান্য বাস্তুসংস্থান বা অর্থনৈতিক ঝটকার ক্ষেত্রেও একথা খাটে।

আট সহস্রাব্দ উন্নয়ন সংকল্প এর কাজকর্ম খতিয়ে দেখার পর এর নতুন নাম হয়েছে সতেরো সুস্থায়ী উন্নয়ন সংকল্প। এসব সংকল্পসিদ্ধির কাজ চলবে ২০১৫-৩০ ইস্তক (সারণি-২)। পরিবেশ টিকিয়ে রাখার সহস্রাব্দ উন্নয়ন সংকল্পটিকে ৯টি সুস্থায়ী উন্নয়ন সংকল্পে ভাগ করা হয়েছে। এগুলিতে গুরুত্ব পেয়েছে পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখা এবং পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক। বিভিন্ন দিক যেমন, কার্বন নির্গমন হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার মোকাবিলা, গরিবদের ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে জলবায়ু রদবদলে সমস্যা সামলানোর চেষ্টা চলছে এখন। দেশের ভিতর এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন হচ্ছে স্থায়ী উন্নয়ন তত্ত্বের আর এক উপাদান। স্থায়ী উন্নয়ন সংকল্পে এ বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

সুস্থায়ী বা টেকসই উন্নয়নের বেশ কয়েকটি দিকের মধ্যে অন্যতম জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ুর রদবদল এড়ানো ও টেকসই উন্নয়ন চায় সকলেই। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব। সে নিয়ে আছে বিস্তর মতান্তর। আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হচ্ছে সবার উপকারের জন্য সহযোগিতার সুযোগকে কাজে লাগানো। দ্য রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিস প্রোগ্রাম অব দ্য ইউনাইটেড নেশনস (UN-REDD) এ ধরনের একটি প্রকল্প। বন সংরক্ষণ এবং জমিজমায় বেশি হারে কার্বন শোষণকারী গাছ লাগিয়ে উন্নয়নশীল দেশে মানুষের আয় বাড়ানোর এক নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে এই কর্মসূচি। বায়ুমণ্ডলে বেশি কার্বন ছড়ানোর জন্য দায়ী উন্নত দেশ। এ বাবদ (কার্বন ক্রেডিট) উন্নয়নশীল দেশকে টাকা দেবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে রেহাই নেই উন্নত ও উন্নয়নশীল কোনও দেশের। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সংকল্পের বিষয়ে তাই সব দেশের মিলেমিশে কাজ করার সুযোগ এসেছে। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংকল্পের মধ্যে ভেদ নয়, সম্মিলন। টেকসই উন্নয়ন সংকল্পের ব্যাপ্তি বিশাল। জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যাও খুব জটিল। তিলেক কালবিলম্ব নয়। এখনই মুশকিল আসানের সেরা উপায় বা উপায়গুলি আঁকড়ে ধরা দরকার। ফলাফল কী দাঁড়াচ্ছে সেদিকে নজর রাখতে হবে প্রতি নিয়ত। নয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিরিখে সমাধানের উপায়গুলিকে ঘষেমেজে নিতে হবে। করতে হবে আরও উন্নত। বাঁধাধরা গতে আটকে থাকা নৈব নৈব চ। সমস্যা সমাধানের স্ট্র্যাটেজি বা কর্মপন্থাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ধরতে হবে।❑

[লেখক জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান স্কুলের অধ্যাপক।
email : kgsaxena@mail.jnu.ac.in
kgsaxena@gmail.com]

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যয়সমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক বিকাশের উপর উষ্ণায়নের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন **পূর্ণমিতা দাশগুপ্ত।**

অর্থনৈতিক বিকাশের বিভিন্ন তত্ত্ব ও বর্ণনা (ম্যালথুসীও, ধ্রুপদি, মার্কসীও এবং আরও অন্যান্য যেমন স্টিগলিৎজ কমিশন) অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কী কী এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল্য নিরূপণের প্রধান মাত্রাগুলি কী কী সে সম্পর্কে একটা বোঝাপড়া সৃষ্টি বা ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা এবং এই সব প্রশ্নের উত্তর জোগানোর ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতাকে কোনও অর্থেই নতুন কিছু বলে মনে করা চলে না। জনসংখ্যা, মানব মূলধন, সামাজিক মূলধন, সম্পদগত সহজাত সমৃদ্ধি, প্রযুক্তি, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও রাজনৈতিক অর্থনীতি প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃতির ভূমিকা উপলব্ধি করার বিষয়ে জলবায়ু পরিবর্তন একটা অত্যন্ত জরুরি ও অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষত কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যেগুলি জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার প্রভাবের দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিজ্ঞান সম্পর্কে জানা ও জ্ঞান বৃদ্ধি এবং গত দশকে বিশ্বজোড়া উষ্ণায়নের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চমাত্রার সহমত অর্জিত হওয়ায় সকলের নজরটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে সরে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বজায় রাখার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। টেঁকসই বা সুস্থায়ী উন্নয়নের সংজ্ঞা যেভাবে উঠে এসেছে তার মধ্যেও এটার প্রতিফলন দেখা যায়। রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ইউএনডিপি-এর বিশেষভাবে ব্যবহৃত সুস্থায়ী উন্নয়নের ব্যাখ্যাটা (১৯৯৫) হল : এমন এক উন্নয়ন যেটা বর্তমানের সব চাহিদা মেটায়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর সামর্থ্যের ক্ষেত্রে কোনও রকম আপস না করে (পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব কমিশন ১৯৮৭) আর এটা ভবিষ্যৎ বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয়। অতি সম্প্রতি গৃহীত সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য এলটিজি (রাষ্ট্রসংঘ ২০১৫) জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে যে বিশদ ও স্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করে তা হল, জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাবগুলি মোকাবিলায় অবিলম্বে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এসডিজি-র জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভীষ্টের প্রথম যে লক্ষ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা সব দেশেই বাড়িয়ে তোলা। অন্যান্য বহু ঈপ্সিত লক্ষ্যেই পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এরা প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সুস্থায়ী ব্যবহারের কথা বলে। এটা সেই সঙ্গেই মানব সমাজের প্রগতির প্রকৃত মাপকাঠি হিসেবে ভালো থাকার ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের পর্যবেক্ষণমূলক এবং সম্ভাব্য প্রভাব যেমন কিনা আইপিসিসি-র সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদনে মূল্যায়ন করা হয়েছে, তার সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে এই প্রভাব বিশ্বের সর্বত্রই আশঙ্কা জাগায়। যেসব জনগোষ্ঠী ও ইকোসিস্টেম (বাস্তুতন্ত্র) ইতিমধ্যেই বিপন্ন তাদের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আগামীদিনে আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। এর মধ্যে রয়েছে যারা সাধারণভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল যেমন কিনা গ্রামাঞ্চলে এবং ভঙ্গুরপ্রায় বাস্তুতন্ত্র ও সেই সব প্রজাতির মধ্যে যারা ইতিমধ্যেই বিপন্ন। ঝুঁকির মাত্রাটা খুব কম থেকে বেশি পর্যন্ত হতে পারে এবং সেটা অঞ্চল ও ক্ষেত্র বিশেষে পালটে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রবাল প্রাচীরের ক্ষেত্রে মাত্র এক ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলেই ঝুঁকিটা অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অথচ সাধারণভাবে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা বেশিরভাগ অঞ্চল ও শস্যের ক্ষেত্রেই দু'ডিগ্রি বা তারও বেশি পর্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও উচ্চ পর্যায়ে যায় না।

এশিয়ার ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান ঝুঁকির জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পরিকাঠামো, জীবনযাত্রা ও জনবসতির ক্ষেত্রে বন্যার ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ক্ষতি, উত্তাপজনিত প্রাণহানি এবং খরাজনিত খাদ্য ও জল সংকটের ক্রমশ বৃদ্ধি। সংক্ষেপে বলতে গেলে জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলির বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাবের মধ্যে রয়েছে, ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশ ও উন্নয়নের ওপর এমন বিরূপ প্রভাব যেটা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও অঞ্চলের ওপর পড়ে। এর মধ্যে কিছু কিছু সম্ভাব্য প্রভাব অদূর ভবিষ্যতেই অনুভূত হবে (বলা যায় ২০৪০ সালের মধ্যে) আর অন্যগুলি ঘটার কথা আরও দীর্ঘ মেয়াদে (২১০০ সাল নাগাদ)। বন্যাজনিত ঝুঁকি এবং তার সঙ্গে জড়িত ক্ষয়ক্ষতির কথা ভাবলে ভারত হল সব থেকে ঝুঁকিপ্রবণ কুড়িটি শীর্ষস্থায়ীয় দেশের মধ্যে যারা চরম বিপর্যয়গুলির ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের বৃদ্ধির দরুন ২০৫০ সালের

মধ্যে এদেশের ৮০ শতাংশ মানুষেরই বিপদের মুখে পড়ার আশঙ্কা আছে—যেখানে কলকাতা ও মুম্বইয়ের মতো দুটি প্রধান মহানগরের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ও সম্পদের দিক থেকে ঝুঁকির আশঙ্কা বিদ্যমান। উত্তাপজনিত স্ট্রেস শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং ভারতে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটা বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিশেষ করে সেই সব মানুষের ক্ষেত্রে যাদের কাজের ধরনটা তাদের দীর্ঘ সময় বাইরে থাকতে বাধ্য করে। এটা দেখা যায় নির্মাণ ও কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। অন্যান্য আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিরূপ অর্থনৈতিক প্রভাব দেখা দিতে পারে। যেমন বীজ ও পার্বত্য পর্যটন। ম্যালেরিয়া ও ডায়েরিয়ার মতো রোগ বাড়তে থাকলে স্বাস্থ্যের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়বে।

ভারতে জলবায়ু পরিবর্তনের যথেষ্ট অর্থনৈতিক প্রভাব দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে এখানকার মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার স্বল্পতার দরুন, দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক জীবনযাত্রার ওপর বহু মানুষের নির্ভরশীলতা এবং কৃষির ওপর প্রভাব। অর্থনৈতিক প্রভাবের মাত্রা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ক্রমবর্ধমান বায়ুর উষ্ণতার খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর তাদের প্রভাব। সরঘুম শস্যের উৎপাদন ২০২০-এর মধ্যে ২-১৪ শতাংশের মতো কমে যাওয়ার কথা আর ২০৫০ সাল নাগাদ এর উৎপাদন হবে একেবারেই খারাপ। এর ইন্দো-গঙ্গা সমভূমি এলাকায় গমের উৎপাদন অনুকূল অঞ্চলে সব থেকে কমার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ধানচাষের ক্ষেত্রে বর্তমান তাপমাত্রার মান ইতিমধ্যেই সংকটজনক মাত্রার দিকে চলেছে। বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন উত্তর-ভারতে অক্টোবরে, দক্ষিণ ভারতে এপ্রিল ও আগস্টে আর পূর্ব ভারতে মার্চ থেকে জুনের মধ্যে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ২০৫০ সালের মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনে সার্বিক অবনতি ঘটবে প্রায় ১৮ শতাংশ হারে (দাশগুপ্ত ২০১৩)।

সার কথা হল এই প্রভাবগুলি ব্যাপক হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং এগুলির দরুন অর্থনৈতিক বোঝাও বাড়তে পারে পর্যাপ্ত হারে। ঝুঁকির মাত্রাটা যেসব শর্ত দ্বারা প্রভাবিত হয় সেগুলি বিপদ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এমন কিছু পদক্ষেপও থাকতে পারে যার ফলে এই সব ঘটনা ঘটার সময় তার প্রভাব কমতেও পারে। প্রথমটা সেই সব কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত যেটা গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির নিঃসরণ কমাতে পারে আর পরেরটা এমন সব কাজকর্মকে শামিল করতে পারে যেটা এই সব প্রভাবের দরুন ঘটা বিপন্নতাকে কমিয়ে আনতে অথবা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা (অভিযোজন) বাড়াতে পারে। উপভোগের ধরন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি ও জ্ঞানের সহজলভ্যতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য হল এমন কিছু প্রভাব যেগুলি মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ও প্রতিক্রিয়াগত মোকাবিলার সামর্থ্য বাড়ায়। সম্পদ বণ্টনের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আর্থিক নীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলির ব্যবহার জলবায়ুগত চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুমিত প্রভাবের খরচ এবং উপযুক্ত মোকাবিলার ব্যবস্থা ও মানিয়ে নেওয়ার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক গুরত্বপূর্ণ অঙ্গ।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক ব্যয়কে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যেতে পারে। একদিকে, ক্ষতিকারক প্রভাবটা হল অর্থনীতির ক্ষেত্রে সেই ধরনের ক্ষতি, অত্যন্ত সযত্নে যার মূল্যায়ন করতে হবে। অন্যদিকে, মোকাবিলার পদ্ধতি গ্রহণ এবং অভিযোজনগত কার্যকলাপের মাধ্যমে ক্ষতি কমানোর জন্যও খরচ আছে। আর মনে রাখতে হবে যে দুটো কিন্তু এক নয়। জলবায়ু বিজ্ঞান যে প্রমাণ জোগায় তাতে দেখা যায় যে, ইতিমধ্যেই অনুভূত হওয়া প্রভাবগুলির কিছু কিছু অপ্রতিবর্তী হতে পারে এবং কিছু পরিমাণ উষ্ণায়ন অনিবার্য হতে পারে। এমনকী যদি প্রভাব কমানোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ পুরোপুরি হাতে তাহলেও মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে পাওয়ার ক্ষেত্রেও একটা সীমা থেকেই যায়।

উদাহরণস্বরূপ উত্তাপজনিত মৃত্যুর ঝুঁকির হারটা সবসময়েই উঁচু। এমনকী যদিও কাল্পনিকভাবে ধরে নেওয়া উচ্চ অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন অবস্থা যদি বা অর্জন করা যায় দীর্ঘমেয়াদে যখন কিনা খরাজনিত জল ও খাদ্যাভাবের ফলে অপুষ্টির ঝুঁকিটা বাড়ন্ত থাকে, কিন্তু মানিয়ে নেওয়ার বড় ক্ষমতা ঝুঁকির মাত্রাটাকে অদূর ভবিষ্যতে (২০৩০-২০৪০ সাল) কম মাত্রায় নামিয়ে আনতে পারে এবং ২-৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এটা কমিয়ে রাখা যায় ২০৮০ থেকে ২১০০ সাল নাগাদ। উত্তাপজনিত স্ট্রেস-এর মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত অভিযোজন প্রক্রিয়ায় উত্তাপের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগ করতে হবে। উত্তাপের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলসমূহকে কমাতে নগর পর্যায়ে প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে এবং গড়ে তোলা পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এই শেষেরটির জন্য যে অভিযোজন প্রতিক্রিয়া দরকার তার ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের জন্য তৈরি থাকা, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং স্থানীয়ভাবে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করতে হবে।

অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর প্রভাব এবং মোকাবিলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিরোধমূলক ব্যয়ের আদলটা পেতে নানা ধরনের মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানা ধরনের মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং ওপর থেকে শুরু করে নীচে, নীচ থেকে ওপরে সব ধরনের মডেল ব্যবহার করে এবং পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নমূলক মডেলগুলিও কাজে লাগানো হয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের মডেল তৈরি করা যেটা কিনা উৎপাদনশীলতা সম্পদ সংক্রান্ত ব্যবস্থা উৎপাদন এবং ভোগের প্রকারভেদের দিক থেকে যে সমস্ত পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে সেগুলির একটি বিরাট অংশ মডেলের আকারে উপস্থাপিত করা। এই সব সমীক্ষা থেকে আগামীদিনের জন্য বিকল্প প্রেক্ষাপট তৈরি করা কোনও নতুন পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটবে না এমন চালচিত্র, প্রেক্ষাপট ও গ্রিনহাউস নিঃসরণের ক্ষেত্রে ধার্য লক্ষ্য অনুযায়ী হ্রাসমূলক বিকল্প ইত্যাদিকে

ধরে নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। খরচপত্র ধরা হয়েছে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য যে বিনিয়োগ দরকার সেটা আর যেটা প্রায়শই মোট দেশীয় উৎপাদনের শতাংশের হারে দেখানো হয় তার ভিত্তিতে। অর্থনৈতিক ব্যয়টাকে মোট দেশীয় উৎপাদনের ক্ষতি হিসেবে পরিমাপ করা হয়। উদ্দেশ্যটাকে এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়, যাতে অর্থনৈতিক বিকাশ সর্বোচ্চ হয় (অথবা সময়ান্তরে ভোগমূলক ব্যয়), মোকাবিলার খরচ কমানো এবং ম্যাক্রো অর্থনীতিমূলক নিয়ম যেমন কিনা সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় আয়মূলক হিসেব সংক্রান্ত পরিচিতি সর্বক্ষেত্রেই বজায় থাকে।

গণনা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের বাধা টপকাতে বেশিরভাগ মডেলেই অত্যন্ত সরলীকৃত ধ্যানধারণা ব্যবহার করেছে আর কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখায় বেশিরভাগ দিকই গেছে বাদ পড়ে। সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক এবং বাজার বহির্ভূত মূল্য ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে থাকে। ক্ষেত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষত যেগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্বেগের দিকটা নজর দেয় যেমন কিনা কোনও একটা বিশেষ শিল্পে পরিবেশ অনুকূল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে খরচ কতটা বাড়বে অথবা বিশ্ববাজারে শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতাটা কীভাবে ক্ষুণ্ণ হবে ইত্যাদি আরও বিশদ তথ্য জোগায়। এখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের সার্বিক অর্থনীতিমূলক খরচের বিভিন্ন ধরনের মোকাবিলামূলক চালচিত্র, কালচিত্র এবং অনুমানের বিভিন্নতার দরুন যেমন কিনা কারিগরি ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা এবং শক্তি দক্ষতার বিকাশ ইত্যাদি। পারিখ ২০১২-তে অনুমান করেছিলেন, ২০০৫ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে ১২.৫ শতাংশ জিডিপি-তে লোকসান হবে। এই ক্ষেত্রে শুক্লা ও ধর এই একই সময়ে ৬.৭ শতাংশ লোকসান দেখিয়েছেন। আর প্রধান ও ঘোষ ২০১২-তে ২০৩০ সাল পর্যন্ত মোট দেশীয় উৎপাদনের বিকাশ হারে ১.১ থেকে ১.৩ শতাংশের মতো ক্ষতির পূর্বাভাস দিয়েছেন।

ইউএনএফসিসিসি-তে ভারতের পক্ষ থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের যে সমস্ত কৌশলের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি ছাড়া অন্য শক্তির উৎস ব্যবহার করে ৪০ শতাংশ ক্রমপুঞ্জিত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সামর্থ্য অর্জন করার লক্ষ্য। এই সঙ্গেই ২৫০ থেকে ৩০০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতুল্য অতিরিক্ত কার্বন সিঙ্ক তৈরি করা অরণ্য ও বৃক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে। ১০০টি স্মার্ট সিটিতে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধী গড়া, উপযুক্ত জনপরিবহণ ব্যবস্থার বিকাশ এবং অন্যান্য সব প্রয়াসের কথাও বলা আছে।

অভিযোজনের প্রেক্ষাপট থেকে খরচের ব্যাপারটা নির্ধারণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন যেসব ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে তার দিক থেকে পরিমাপ করা এবং এই সবের মোকাবিলা করার জন্য যে খরচের দরকার হয়, তার হিসেব করাটা প্রয়োজন। প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি যেগুলিতে স্থাণু বিশ্লেষণের ওপর যা নির্ভর করে অথবা অর্থমূল্য নির্ধারণের জন্য কেবল আদর্শ কৌশল ব্যবহার করে থাকে খরচের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ, খরচের দরুন সুবিধার বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য খরচ সংক্রান্ত বক্রতা নিরূপণে দৃষ্টিভঙ্গি অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হতে পারে কেননা এগুলি এক্ষেত্রে থেকে যাওয়া ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার যে দিকটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকে সেটিকে হিসেবের মধ্যে আনতে পারে না। এই ধরনের খরচের বিশ্লেষণ করার জন্য বহুত্ব-সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহার করা দরকার, যেগুলি একদিকে খরচ ও তার সুফল বা কস্ট বেনিফিট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে এবং যার মধ্যে সময়ের মাত্রাও থাকবে আর সেই সঙ্গেই নতুনতর এবং অসমসত্ত্ব উপায়ও থাকবে। যেমন কিনা বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সিদ্ধান্ত সমর্থনকারী অন্যান্য সরঞ্জাম।

জলবায়ু পরিবর্তন যেহেতু বিশ্বের নানা জায়গার অর্থনীতি ও জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে, এক্ষেত্রে একটি মূল অর্থনৈতিক বিষয় হল জলবায়ুগত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়ার খরচের হিসেবটা করা এবং সেক্ষেত্রে যাদের মূল্যগুলি পরিহার করা বা কমিয়ে দেখানো চলে সেগুলিকে উপযুক্ত গুরত্ব দেওয়া সেইসব বাস্তুতন্ত্রের বিপরীতে যেখানে বাস্তুতন্ত্রগত দিক থেকে অনিশ্চয়তা রয়েছে। খরচ ও তার সুফলের মূল্যায়নের জন্য একে অপরের বিভিন্ন মূল্যগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে দেখার দরকার হয় (চামবোয়েরা, হিল ইত্যাদি ২০১৪)। এটা অবশ্যই একটা চ্যালেঞ্জ যেটা অর্থনীতিবিদরা খরচ ও সুফলের বিশ্লেষণের ব্যাপারটা বহু বছর ধরে করে চলেছেন। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়গুলিকে এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেয়, প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার সীমা এবং মানিয়ে নেওয়া ও মোকাবিলার প্রতিক্রিয়ার জন্য যে খরচ হয়ে থাকে সেগুলি প্রযুক্তিগত, ব্যবস্থাপনাগত, কর্মী ও প্রতিষ্ঠানগত থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক খরচ যেটা গবেষণা ও বিকাশের কাজে লাগে, সচেতনতা ও সামর্থ্য গড়ার কাজে লাগে।

অভিযোজন এবং মোকাবিলা পরিকল্পনা করার সময় যেসব অর্থনীতি সমস্যায় জর্জরিত তারা বিকল্প স্থির করে নেয়। সুযোগ সংক্রান্তকে খরচের হিসেব করার সময় বহু ধরনের উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রাখা দরকার যে সব উদ্দেশ্যগুলি থাকে দেশের জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশের জন্য একটা নির্দিষ্ট গুণমানের জীবনযাত্রা সুনিশ্চিত করার জন্য ন্যূনতম যে মাত্রাটায় পৌঁছানো দরকার সেদিকে খেয়াল রেখে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রসঙ্গটা হল সেইটা যেটা বহু ধরনের জলবায়ু-বহির্ভূত চাপের কথা স্বীকার করে অভিযোজন, প্রভাব মোকাবিলা এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের মধ্যের আদান-প্রদানকে মেনে নেয়। এটা একই সঙ্গে ট্রেড-অফ এবং অভিযোজন, প্রভাব মোকাবিলা ও সুস্থায়ী উন্নয়নের মধ্যেকার সুষম তালমিলের দরুন জলবায়ু সংক্রান্ত প্রভাবের সহ-সুফল ও সংশ্লিষ্ট খরচের মূল্যটা বুঝে নিতে গবেষকদের সাহায্য করে।

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা ও তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার যে খরচ তাতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কার্বন ডাই

অক্সাইড নিঃসরণের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রভাব (কার্বনের সামাজিক ব্যয়) প্রতি টন কার্বনে কয়েক ডলার থেকে শুরু করে কয়েক হাজার ডলার পর্যন্ত হতে পারে। এই হিসেবগুলিতে খুব বেশি রকম হেরফের হয় অনুমিত ক্ষয়ক্ষতি এবং ছাড়ের হারের তারতম্যে, কম ছাড়ের হারের পাল্লা যদি বড় হয় তাহলে ইত্যাদি। একইভাবে অভিযোজনগত খরচের হিসেব উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ২০১০ থেকে ২০৫০-এর মধ্যে প্রত্যেক বছরে ৪ ডলার থেকে শুরু করে ১০৯০০ কোটি ডলার পর্যন্ত হতে পারে। বিশ্বমানের নিরিখে অভিযোজনগত চাহিদা আর প্রাপ্য তহবিলের মধ্যে একটি বিরাট ঘাটতি থেকে যায়।

ভারতের আইএনডিসি প্রতিবেদনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের একটি সমীক্ষার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি ও লোকসানের পরিমাণটা দাঁড়াবে জিডিপি-র ১.৮ শতাংশের মতো। এটা নীতি আয়োগের দেওয়া হিসেবের উল্লেখ করে বলে যে মাঝারি থেকে নীচু পাল্লার কার্বন উন্নয়নের জন্য প্রশমনমূলক যে কার্যকলাপের প্রয়োজন হবে তার জন্য ২০১১ সালের মূল্যমানে প্রায় ৮৩৪০০ কোটি ডলার খরচ হবে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। আইএনডিসি অনুযায়ী প্রাথমিক হিসেব থেকে ইঙ্গিত মেলে ২০১৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে (২০১৪-১৫-র মূল্যমানে) কৃষি, বনায়ন, মৎস্য চাষ পরিকাঠামো, জল সম্পদ ও ইকো সিস্টেমের ক্ষেত্রে অভিযোজনগত কার্যকলাপের জন্য প্রায় ২০৬০০ কোটি ডলারের প্রয়োজন হবে আর প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগেরও প্রয়োজন হবে। ভারতে বেশিরভাগ অভিযোজন কৌশলই রচিত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনগত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে এবং জাতীয় স্তরের মিশনগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। সাম্প্রতিককালে জলবায়ুগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে খরচ মেটাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের তহবিল বাড়ানোর জন্য ইনসেনটিভ দেওয়া নিয়ন্ত্রণ করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে জীবনযাত্রার একটি ন্যূনতম মান নিশ্চিত করতে সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে তহবিলের ভূমিকাটা মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা বাড়ানো এবং ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত হস্তান্তর নলেজ বা জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বতশ্চালিত অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের তহবিলের বিশেষ প্রয়োজন।❑

[লেখক দিল্লির ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিক গ্রোথ-এ এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিক্স-এর প্রধান।
email : purnamita.dasgupta@gmail.com]

উল্লেখপঞ্জি :

Chambwera, M., G. Heal, C. Dubeux, S. Hallegatte, L. Leclerc, A. Markandya, B.A. McCarl. R. Mechler, and J.E. Neumann, (2014): Economics of adaptation. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach. M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 945-977.

Dasgupta, P., A. Kumari and D. Bhattacharya (2013) Socio-Economic Analysis of Climate Change Impacts on Foodgrain Production in Indian States, Environmental Development, Elsevier, vol 8, 2013. http://authors.elsevier.com/sd/article/S2211464513000900.

INDC (2015) India's Intended Nationally Determine Contribution: Working towards climate justice. Submission to the UNFCCC, Government of India.

(http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/India/1/INDIA%20INDC%20_TO%20UNFCCC.pdf) Accessed on 9 Nov 2015.

IPCC Synthesis Report (2014) "Interactions between adaptation, mitigation and sustainable development" (Section 4.5), Synthesis Report, AR5, IPCC, UNEP-WMO.

IPCC (2014): Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts,Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, KJ. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1-3.

Parikh, K. (2012) Sustainable development and low carbon growth strategy for India, Energy, 40: 31-38.

Parikh, K. Parikh, J. et al (2014). Low carbon development pathways for a sustainable India, IRADe, Mimeo February.

Pradhan, B. K. and Ghosh, J. (2012) The Impact of Carbon Taxes on Growth Emissions and Welfare in India: A CGE analysis. IEG Working Paper No. 315, 2012.

Shukla, P.R. and Dhar, S. (2011). Climate agreements and India: aligning options and opportunities on a new track. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 11, 229-243.

Stiglitz, J. E., A. Sen, J-P Fitoussi (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/stiglitz/doc-commission/RAPPORT_anglais.pdf

UN (2015) Sustainable Developmental Goals, United Nations (http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)

UNDP (1995) Glossary http://data.un.org/Glossary.aspx?q=undp+1995

World Commission on environment and development (WCED) (1987), Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development, WCED, Switzerland, (http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf)

জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তি এবং সুস্থায়ী শক্তিসম্পদ

প্রযুক্তির হাত ধরে পৃথিবীতে এসেছে শিল্পযুগ, এসেছে মোটরগাড়ি, দূষিত হয়েছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল—যার পরিণাম জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক অভিশাপ। আবার এই শাপমুক্তির চাবিকাঠিও রয়েছে প্রযুক্তির হাতেই। যে প্রযুক্তির দৌলতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিষবাষ্প বাতাসে মিশে পৃথিবীকে উষ্ণ করে তুলছে সে প্রযুক্তিই আবার বাতাস থেকে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নিয়ে মানবসভ্যতার বিভিন্ন কল্যাণে কাজে লাগাতে পারে—কীভাবে? আলোচনা করেছেন **মালতী গোয়েল।**

'১৮৯০-এর দশকে নিউইয়র্ক শহরের রাস্তাঘাট ডুবে গিয়েছিল কোনও ঝড়জলে নয়; পূতিগন্ধময় ঘোড়ার বিষ্ঠায়।'

—ইউএসএ টুডে, ডিসেম্বর ৩০, ২০১৩

এটাই ছিল তখনকার দিনের একেবারে বাস্তব চিত্র। কারণ ঘোড়াই ছিল তখন যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। ফলে ঘোড়ার বিষ্ঠায় ভরে যেত রাস্তাঘাট। সমস্যার সমাধানের পথ দেখাল প্রযুক্তি। মোটরচালিত গাড়ি আসার পর পাট চুকল ছ্যাকরাগাড়ির। কিন্তু এক শতাব্দী বাদে এই মোটর গাড়ির ধোঁয়ায় বিষাক্ত হয়ে উঠল বাতাস। 'জলবায়ু পরিবর্তন'-এর নাম ধরে ১৯৯০-এর দশক থেকেই তা বিশ্বজুড়ে সবার মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠল। পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ল, বাড়ল সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা, আবহাওয়া হল চরম, দেখা দিল জলের আকাল—সব মিলে মানব সভ্যতার ওপর আজ এক বিরাট সংকট। অটোমোবাইল থেকে শিল্পযুগ পর্যন্ত বাতাসে বিষ ছড়ানোর ফলে পৃথিবী আজ যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে তা ঠেকানোর পথ না খুঁজলে আর পরিত্রাণ নেই।

১. প্রবর্তন

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড-সহ ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি নির্গমনের ফলেই পৃথিবীর উষ্ণায়নের আশঙ্কা বাড়ছে। আর বিশ্বজুড়ে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির নির্গমনের পরিমাণ বাড়ার জন্য মানুষের নানান কাজকর্ম ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বহরবৃদ্ধিই যে মূলত দায়ী সেকথা আজ প্রমাণিত। বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই কয়লা এখন ভবিষ্যতের প্রধান জ্বালানি (দ্য ইকোনমিস্ট, ১৯ এপ্রিল, ২০১৪) এবং শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রধান কাঁচামাল। চিত্র-১-এ ২০০৫ সালে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাসের অনুপাতের একটি বিশ্বজনীন চিত্র তুলে ধরা হল। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ২৮ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয় শক্তি সরবরাহ ক্ষেত্র থেকে। তারপরেই রয়েছে যথাক্রমে কৃষি, পরিবহণ এবং শিল্পক্ষেত্র।

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশের বাস ভারতে। কয়লা উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ভারত গ্রিনহাউস গ্যাসের অন্যতম উৎস হলেও, ভারতের মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ কিন্তু বিশ্বের মোট নিঃসরণের মাত্র ৫ শতাংশ। চিত্র-২-তে এ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাসের অনুপাতের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ৩৭ শতাংশ গ্রিন-

চিত্র-১
২০০৫ সালে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাসের বিশ্বজনীন চিত্র
(সূত্র : ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট, ২০১০)

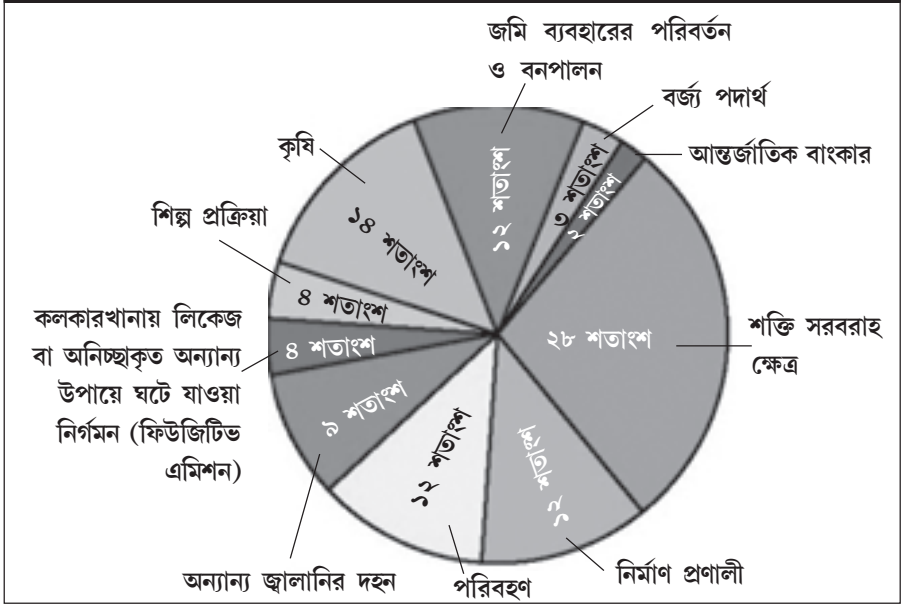

চিত্র-২
ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাসের অনুপাত

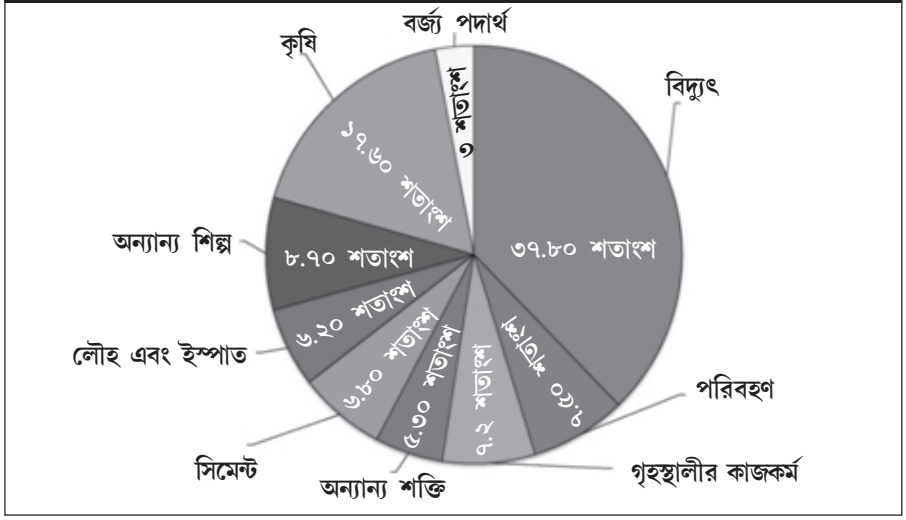

হাউস গ্যাস নির্গত হয় শক্তি সরবরাহ ক্ষেত্র থেকে। এছাড়া কৃষি, পরিবহণ, নির্মাণ ও শিল্পক্ষেত্র গ্রিনহাউস গ্যাসের অন্যতম উৎস।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উদ্যোগ

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রোটোকল এবং জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক নানান চুক্তি যেমন, 'জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের কাঠামো চুক্তি' (ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা UNFCCC) ও কিয়োটো প্রোটোকলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণকে একটা স্থিতিশীল মাত্রায় আনার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে গ্রিনহাউস

সারণি-১
বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ হ্রাসের অঙ্গীকার

দেশ	মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (মার্কিন ডলারের হিসাবে) [২০১১]	নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্য এবং অঙ্গীকার				অনুমোদনের তারিখ	
		২০২০ সালের মধ্যে (নিঃশর্ত)	২০২০ সালের মধ্যে (শর্তাধীন)	২০৫০ সালের মধ্যে (শর্তাধীন)	অন্যান্য	UNFCCC	কিয়োটো প্রোটোকল
অস্ট্রেলিয়া	৬৭,০৩৯	২০০০ সালের তুলনায় –৫ শতাংশ	২০০০ সালের তুলনায় –১৫ বা –২৫ শতাংশ	২০০০ সালের তুলনায় –৮০ শতাংশ		৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯২	১২ ডিসেম্বর, ২০০৭
আমেরিকা	৪৯,৯২২	২০২০ সালের মধ্যে ২০০৫ সালের তুলনায় –১৭ শতাংশ		২০০৫ সালের তুলনায় –৮৩ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্যে এগোনো	২০২৫ সালে ২০০৫ সালের তুলনায় –৩০ শতাংশ এবং ২০৩০ সালে ২০০৫ সালের তুলনায় –৪২ শতাংশ	১৫ অক্টোবর ১৯৯২	এখনও অনুমোদন করেনি
দক্ষিণ আফ্রিকা	৮,০৯০	কিছু নেই	BAU-এর তুলনায় –৩৪ শতাংশ	পাওয়া যায়নি	২০১৫ সালের মধ্যে ২০০৫ সালের তুলনায় –৪২ শতাংশ এবং ২০২০ ও ২০২৫ সালের মধ্যে নিঃসরণ সবচেয়ে কমানোর লক্ষ্য	২৯ আগস্ট ১৯৯৭	৩১ জুলাই, ২০০২
গণপ্রজাতন্ত্রী চীন	৫,৪৩৯	কিছু নেই	২০০৫ সালের তুলনায় জিডিপি-র ইউনিটপিছু –৪০ থেকে –৪৫ শতাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ হ্রাস	পাওয়া যায়নি	২০১৫ সালের মধ্যে ২০০৫ সালের তুলনায় প্রতি ইউনিট জিডিপি-তে ১৭ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাস	৫ জানুয়ারি, ১৯৯৩	৩০ আগস্ট, ২০০২
ভারত	১,৫২৮	কিছু নেই	২০০৫ সালের তুলনায় কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের ওপর জিডিপি-র নির্ভরতা –২০ থেকে –৫ শতাংশ হ্রাস	পাওয়া যায়নি		১ নভেম্বর, ১৯৯৩	২৬ আগস্ট, ২০০২

সূত্র : http://unstats.un.org-সহ বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংকলিত।

গ্যাস নিঃসরণের অনুপাতের তালিকা তৈরির বিষয়টিকে স্বাক্ষরকারী প্রতিটি দেশের কাছে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভারত-সহ প্রধান প্রধান কয়লা ব্যবহারকারী দেশের কাছে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ কমানোর যে প্রতিশ্রুতি/লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া হয়েছে তা সারণি-১-এ তুলে ধরা হল।

ভারতের মতো উদীয়মান কয়লা-নির্ভর অর্থনীতিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মতো করে সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হবে। কিয়োটো প্রোটোকল স্বাক্ষরের সময় গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের ব্যাপারে ভারতকে তখন কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে হয়নি। কিন্তু কোপেনহেগেন শীর্ষ সম্মেলনে ভারত স্বেচ্ছায় ২০২০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ওপর জিডিপি-র (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) নির্ভরতা (জিডিপি ইনটেনসিটি) ২০০৫ সালের তুলনায় ২০-২৫ শতাংশ কমানোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। কিয়োটো প্রোটোকলপরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ের পক্ষ থেকে সমস্ত দেশকে তাদের 'জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমন' বা 'ইনটেন্ডেড ন্যাশনলি ডিটারমাইন্ড কনট্রিবিউশনস' (INDC)-এর কথা জানাতে বলা হয়েছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্যারিসের শীর্ষ সম্মেলনে এগুলির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

INDC-তে ভারতের ঘোষিত লক্ষ্যগুলি হল—

(ক) ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ওপর জিডিপি-র নির্ভরতা ২০০৫ সালের তুলনায় ৩৩-৩৫ শতাংশ কমানো।

(খ) দেশের ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে উৎপাদন।

(গ) ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫০-৩০০ কোটি টন অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের ব্যবস্থা।

২০১৫ সালের ৩১ জুলাই-এর তথ্যানুযায়ী দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২,৭২,৪৩২ মেগাওয়াট। এর মধ্যে কয়লা, গ্যাস ও ডিজেল থেকে যথাক্রমে ১,৬৫,০০০ মেগাওয়াট, ২৩,০০০ মেগাওয়াট এবং ৯৯৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ দেশের মোট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১,৮৯,৩১৩ মেগাওয়াট। এছাড়া, পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসগুলি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৩৫,৭৭৬ মেগাওয়াট। জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ৪১,৬৩২ মেগাওয়াট এবং দেশের পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫,৭১৭ মেগাওয়াট। শক্তির বিভিন্ন উৎসের ভালোমন্দ দিকগুলি বিচার করে এবং এই সমস্ত উৎসের যাবতীয় সম্ভাবনাগুলিকে খতিয়ে দেখার পরই পরিবেশবান্ধব উপায়ে দীর্ঘমেয়াদভিত্তিক শক্তি উৎপাদনের বিকল্প পথগুলি আমরা বেছে নিতে পারব। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির তরফে গৃহীত নীতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট দূরদর্শিতার ছাপ রয়েছে এবং নতুন নতুন গবেষণা ও সহায়সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে এই লক্ষ্যগুলি পূরণে একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে প্রযুক্তি। INDC-তে ভারত যে তিনটি লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করছে তা কীভাবে পূরণ করা যেতে পারে এবার সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

২.১ শক্তিসম্পদ সদ্ব্যবহারের কুশলতা বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় (ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) আওতায় গৃহীত শক্তিসম্পদ সদ্ব্যবহারের কুশলতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত জাতীয় মিশনে (ন্যাশনাল মিশন অন এনহ্যান্সড এনার্জি এফিশিয়েন্সি) সমস্ত ক্ষেত্রে যাবতীয় অপচয় রোধ করে শক্তিসম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মিশনের প্রথম পর্যায়ে 'পারফর্ম, অ্যাচিভ অ্যান্ড ট্রেড বা PAT' ব্যবস্থাপনা এই ২০১৫ সালেই সম্পন্ন করা হয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট, ক্লোর-অ্যালকালি, সার, পাল্প ও কাগজ, বিদ্যুৎ, লৌহ ও ইস্পাত, স্পঞ্জআয়রন ও বস্ত্রের মতো যে নয়টি ক্ষেত্রে শক্তিসম্পদের সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে সেগুলিতে এই ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া সুপার ক্রিটিক্যাল এবং আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল বয়লারের মতো জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রেও শক্তিসম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারেও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ, রেল ও তেল পরিশোধন কেন্দ্র এই তিনটি ক্ষেত্রকে নিয়ে PAT-এর দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হচ্ছে। এই পর্বে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো যেতে পারে। এর মধ্যে চালু প্রযুক্তিগুলিকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন করে কাজে লাগানোও যেতে পারে।

চাহিদামূলক অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ধরনের প্রযুক্তি গ্রহণের উদ্যোগ জোরদার করতে হবে। পরিবহণ ক্ষেত্রে জ্বালানিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য নতুন মাপকাঠি স্থির করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ সালের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে জ্বালানির ব্যবহার ১৫ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৭ সালে গাড়ির জ্বালানিতে ২০ শতাংশ ইথানল ও জৈব ডিজেল মিশ্রণের লক্ষ্যও গ্রহণ করা হয়েছে। বিকল্প জ্বালানির সন্ধান এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উপায়ে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারের জন্য চালু প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের জোরদার উদ্যোগ চাই। কারণ এই উদ্যোগই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে।

নির্মাণ ক্ষেত্রের জন্য রয়েছে 'দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশবান্ধব বসতিসম্পর্কিত জাতীয় মিশন' (ন্যাশনাল মিশন অন সাসটেনেবল হ্যাবিট্যাট)। এই মিশনে পরিবেশবান্ধব ঘরবাড়ি ও স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার প্রযুক্তি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। সরকারের তরফে যে ১০০টি 'স্মার্ট সিটি' গড়ে তোলার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিসম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের পক্ষে

উপযোগী পরিবহণ ও বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক, জল সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলি এখন নগর পরিকল্পনাকারদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া কার্বনের দূষণ থেকে মুক্ত শহর গড়ে তোলার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণও আজ অত্যন্ত জরুরি। কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের ওপর জিডিপি-র নির্ভরতা ৩৩-৩৫ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যপূরণের জন্য গৃহস্থালির কাজে শক্তিসম্পদ সদ্ব্যবহারে কুশল সাজসরঞ্জামের ব্যবহার তথা অফিস-কাছারি গরম ও ঠান্ডা করার কাজে উন্নত যন্ত্রপাতির প্রচলন, এলইডি (লাইট এমিটিং ডায়োড) বাতির ব্যবহার, পরিবেশের উপযোগী স্থাপত্যের নকশার প্রচলন তথা পরিবেশবান্ধব ইমারতি দ্রব্যের ব্যবহার, তথা অন্যান্য বিকল্প পথগুলি খতিয়ে দেখা আজ অত্যন্ত আবশ্যক।

২.২ জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়া শক্তি উৎপাদনের অন্যান্য প্রযুক্তি

জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়া শক্তি উৎপাদনের অন্যান্য প্রযুক্তিগুলির ক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদনের সময় কোনও গ্রিনহাউস গ্যাস বাতাসে মেশে না। এই প্রযুক্তি যদি বিরাট মাত্রায় কাজে লাগানো যায় একমাত্র তবেই তা ব্যয়সাশ্রয়ী হবে। আর এই প্রযুক্তির শরণ একদিন আমাদের নিতেই হবে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলার চাবিকাঠি রয়েছে একমাত্র এই প্রযুক্তির হাতেই। ২০০৬ সালের সুসংহত শক্তিনীতি-তে ২০৩১-২০৩২ সালের মধ্যে ৮০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৩২০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ আসার কথা জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে। বর্তমানে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পাশাপাশি জলবিদ্যুৎ ও পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে আসে মোট ৮৩ গিগাওয়াট। বর্তমানে দেশে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তার ১৩ শতাংশ আসে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিভিন্ন উৎস থেকে। সংশোধিত জাতীয় সৌরবিদ্যুৎ মিশনে ২০২২ সালের মধ্যে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ১০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা পৌঁছেছে ৩.৫ গিগাওয়াটে। যা ২০১০ সালের তুলনায় প্রায় আট গুণ বেশি। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে দেশের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ৪৭ মেগাওয়াট। ২০২২ সালের মধ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য সমস্ত উৎস থেকে মোট ১৭৫ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনই এখন লক্ষ্য। সৌর ফোটোভোল্টেইক প্রযুক্তি যেমন, ছাদে সৌর প্যানেল বসানো বা সৌর পার্কের মতো প্রযুক্তিগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বড় আকারে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ২৫টি সৌর পার্ক এবং ৪টি বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দ্রুত গড়ে তোলা হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে গ্যালিয়াম আর্সেনাইট, কার্বন ন্যানোটিউবের মতো উপাদান সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দক্ষতা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে। সোলার থার্মাল ও সোলার কনসেনট্রেটরের মূল প্রযুক্তিগুলিকে নিয়ে আরও বেশি কাজ করতে হবে। সৌর ফোটোভোল্টেইক শক্তির ক্ষেত্রে সৌর সেলগুলি বসানোর জন্য যে বিরাট আয়তনের জমির প্রয়োজন সে বিষয়টিকে মাথায় রেখে জমিসংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে সবার আগে। তা না হলে ১০-১৫ বছর বাদে এই সেলগুলি ব্যবহারের অনুপযোগী বা অকেজো হয়ে যাওয়ার পর সেগুলি অপসারণ নিয়ে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বায়ুশক্তির ক্ষেত্রে ২০২২ সালের মধ্যে এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ৫০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সমুদ্রতট থেকে দূরবর্তী স্থানে গভীর সমুদ্রে আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। বায়ুস্তম্ভ বা উইন্ড টাওয়ারের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার ঘটাতে হবে। একইসঙ্গে জৈবশক্তি, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ভূ-গর্ভের তাপশক্তি এবং সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার শক্তি যাবতীয় সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখতে হবে। বাকি ঘাটতি তো জলবিদ্যুৎ ও পরমাণুবিদ্যুৎ পূরণ করে দেবেই। কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের জন্য এই সমস্ত ক্ষেত্রেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং সুপরিকল্পিত বিনিয়োগের প্রয়োজন।

২.৩ কার্বন আবদ্ধকরণ (কার্বন ক্যাপচার), সঞ্চয় এবং প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার

আগামী দশকগুলিকে শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়লার ওপরই মূলত নির্ভর করতে হবে বলেই অনুমান। ২০২০ সালের মধ্যে ১০০ কোটি টন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০ কোটি টন কয়লার মধ্যে দেশের প্রয়োজনীয়তাটা সীমিত রাখার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। INDC-তে ভারত আগামী ১৫ বছরে ২৫০ থেকে ৩০০ কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের ব্যবস্থা বা কার্বন সিঙ্ক তৈরির কথা ঘোষণা করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধকরণ বা সংগ্রহ (ক্যাপচার) এবং সঞ্চয় অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথকীকরণের (সিকোয়েস্ট্রেশন) মতো প্রযুক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথকীকরণ বা সিকোয়েস্ট্রেশন হল এমন এক প্রযুক্তি যার মাধ্যমে উৎস স্থল থেকে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শুষে নেওয়া হয় এবং স্থায়ীভাবে সঞ্চয় করে বা অন্য কোনওভাবে কাজে লাগিয়ে বায়ুমণ্ডলকে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভার থেকে মুক্ত করা হয়। অতিরিক্ত যে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শুষে নেওয়া হচ্ছে বা আবদ্ধ করা হচ্ছে তাকে ভূপৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা ভূগর্ভে সঞ্চয়ের মাধ্যমে অথবা জ্বালানি তেল বা খনিজ দ্রব্য উদ্ধারের কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা হচ্ছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করার উৎসস্থল এবং ভূগর্ভস্থ সঞ্চয়কেন্দ্র যদি পাশাপাশি না হয় তাহলে দূরবর্তী স্থানে তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথকীকরণের এই

প্রযুক্তির সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন শাখার ওতপ্রোত যোগ রয়েছে। এই বিষয়টি যেহেতু একেবারে নতুন তাই এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন প্রযুক্তি নিয়ে আমরা একটু সংক্ষেপে আলোচনা করব—

(ক) **দূষণহীন কয়লা প্রযুক্তি :** কয়লার দহন থেকে হওয়া দূষণ হ্রাস করতে পারে এমন সব প্রযুক্তিকেই দূষণহীন কয়লা প্রযুক্তি বলা যেতে পারে। কয়লাভিত্তিক যেকোনও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লার দহনের আগে, দহনের সময় এবং দহনের পরবর্তী পর্যায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করা যেতে পারে। এই তিনটি প্রক্রিয়াতেই পৃথকীকরণের বস্তুগত, রাসায়নিক এবং জৈব পদ্ধতি রয়েছে। দহন-পূর্ববর্তী কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের আগেই কয়লাকে আগে সিন গ্যাসে অথবা তরল জ্বালানিতে রূপান্তরিত করা হয়। কয়লার সিন গ্যাসে মূলত থাকে কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন। দূষণহীনভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় হাইড্রোজেনকে। কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করার জন্য 'হাইড্রোজেন মেমব্রেন রিফর্মিং', ইন্টিগ্রেটেড গ্যাসিফিকেশন কমবাইন্ড সাইকেল'-সহ শিফ্‌ট গ্যাস রিয়্যাকশন এবং 'ফিশার ট্রপক'-এর মতো পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। দহন-পরবর্তী স্তরে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করার চেয়ে দহন-পূর্ববর্তী স্তরে উচ্চ তাপ ও উচ্চ চাপে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করার প্রক্রিয়াই বেশি গ্রহণযোগ্য। দহন-পরবর্তী স্তরে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় ধোঁয়া নির্গমনের নল থেকে বিভিন্ন গ্যাসের মধ্য থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে পৃথক করা হয় এবং এটি একেবারেই শেষ বিকল্প। অ্যামাইন যৌগ ব্যবহার করে রাসায়নিকভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথকীকরণের প্রযুক্তিও উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রযুক্তি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় বড় আকারে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। এই কারণেই কার্বন আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে পলিমেরিক মেমব্রেন বা অন্যান্য বস্তুগত শোষকের ব্যবহার এবং ন্যানোটিউবকে কাজে লাগানোর মতো বিকল্প প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

দহনকালে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে দু-রকমের প্রযুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে, যথা—(ক) সুপার ক্রিটিক্যাল ও আলট্রা ক্রিটিক্যাল বয়লারে যেখানে কয়লার দহন অনেক কার্যকরীভাবে হয় সেখানে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমন হ্রাস করা যায়। (খ) অক্সি জ্বালানি দহন এবং রাসায়নিক লুপিং-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেখানে ধোঁয়া নির্গমনের নলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বেশি তৈরি হয় সেখানেও কার্বন আবদ্ধ করার প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যায়। এই কারণেই আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল বয়লারের জন্য বিশেষ উপাদান তৈরি এবং অক্সি জ্বালানি দহন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাতাস থেকে অক্সিজেন পৃথকীকরণের ব্যয় হ্রাসে জন্য বিশেষ গবেষণা চালানো হচ্ছে।

(খ) **কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথকীকরণ ও শিল্পক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার :** বিশ্বের মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ৩৭ শতাংশ আসে শিল্পক্ষেত্র থেকে। আবার বিশ্বজুড়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, তার প্রায় ৪০ শতাংশই চলে যায় এই শিল্পক্ষেত্রে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করা ও সদ্ব্যবহারের যে প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হল ঠিক একই মডেল শিল্পক্ষেত্রও অনুসরণ করতে পারে। শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ ও গাদ (স্ল্যাগ) কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভালো শোষক হিসাবে কাজ করতে পারে। কিয়োটো প্রোটোকল-পরবর্তী পর্যায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা সীমিত রাখতে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন।

(গ) **ভূমিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথকীকরণ :** ভূমিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথকীকরণের প্রক্রিয়াটি মূলত জৈব। অরণ্যে গাছগাছড়ার শস্যে কার্বনের আত্তীকরণ ঘটে এবং মাটি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষক হিসাবে কাজ করে। গাছগাছড়ার মধ্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সময়কাল স্থায়ীভাবে বাড়ানো বা বিভিন্ন শৈবাল ও কার্বোনিক অ্যানহাইড্রেট উৎসেচককে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করে মাইক্রো মেডিয়েটেড কার্বন পৃথকীকরণের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে নানান গবেষণার কাজ চলছে। জিনোমিক বিজ্ঞানেও নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে এবং তার ফলে কার্বন আবদ্ধ করার নতুন নতুন পন্থাও বিজ্ঞানীদের সামনে আসছে। বনসৃজনের মাধ্যমে সমস্ত পতিত জমিকে পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করে তোলা গেলে ভূপৃষ্ঠে এবং ভূগর্ভে কার্বন পৃথকীকরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

(ঘ) **ভূগর্ভে কার্বন ডাইঅক্সাইড ধরে রাখা :** সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয়ভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ভূগর্ভে আবদ্ধ করে রাখা বা ধরে রাখার ব্যাপারে গবেষণা চলছে। মাটির গভীরে নোনা জলস্তর, পাথরে চাঁই এবং বিবিধ খনিজ পদার্থের মধ্যে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করে রাখা যেতে পারে। ভূগর্ভে কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চয় করে রাখার বিষয়টি এখনও আলাপ-আলোচনা ও ব্যাখ্যার স্তরেই রয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে এ নিয়ে কিছু বড় মাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। সমুদ্রতলের নীচে গভীর জলস্তরে কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সাফল্য পেয়েছে নরওয়ের স্লিপনার প্রকল্প। এই প্রকল্পে সেই ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতি বছর ভূগর্ভের নোনা জলস্তরে ১ মিলিয়ন টন করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢোকানো হয়েছে। ভূগর্ভে ব্যাসল্ট শিলা ছড়িয়ে থাকায় ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম সিলিকেটের বিভিন্ন কার্বোনেট খনিজে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে। ভূগর্ভে ৩০৪.১

কেলভিন তাপে ও ৭৩.৮ বার চাপের সুপার ক্রিটিক্যাল পর্যায়ে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চয় করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠ তথা ভূগর্ভের গঠনগত চরিত্র যেহেতু সর্বত্র সমান নয়, তাই কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চয় সংক্রান্ত যে কোনও প্রকল্প হাতে নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট স্থানের ভূগঠনগত বিদ্যা বা জিওমরফোলজির সম্বন্ধে বিশদে গবেষণা সেরে নিতে হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চয়ের যেসমস্ত পদ্ধতি নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে তার মধ্যে রয়েছে বস্তুগত বা স্ট্র্যাটিগ্রাফিক সঞ্চয়, খনিজ পদার্থের মধ্যে সঞ্চয়, ভূরাসায়নিক সংমিশ্রণ এবং অবশিষ্ট গ্যাস সংমিশ্রণ। ভূগর্ভে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢোকানো হচ্ছে তার অবস্থা কী দাঁড়াচ্ছে দীর্ঘমেয়াদিভিত্তিতে তা শনাক্তকরণের উপযুক্ত পদ্ধতি থাকা চাই এবং নিরাপদ সঞ্চয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানে ভূকম্পন সংক্রান্ত ত্রৈমাত্রিক তথ্যও (থ্রিডি সিমসিক স্টাডি) হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন।

(ঙ) **কার্বন পৃথকীকরণের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের জন্য জ্বালানি :** প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসা তৈলক্ষেত্রগুলি থেকে আরও বেশি তেল উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনামাফিক কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢোকানো হলে কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার অর্থকরী দিকটিও সামনে আসবে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে উপযুক্ত লাভের সম্ভাবনা রেখে যদি একটি CO_2-EOR প্রকল্প হাতে নেওয়া যায় তবে তা আদতে দেশের শক্তি নিরাপত্তাকে আরও জোরদার করবে। ভূগর্ভে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঞ্চয় এবং তার ফলে নিঃশেষ হয়ে আসা তেল ভাণ্ডারের তরলের ঘনত্বের বা সান্দ্রতার যে পরিবর্তন ঘটবে তাতে শক্তি উৎপাদনের জন্য বাড়তি জ্বালানি মিশবে। তৈল ক্ষেত্রের মতো, খননের অযোগ্য কয়লা স্তরে কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চয় করা যেতে পারে। সাধারণভাবে কয়লা কার্বন ডাইঅক্সাইডের তিনটে অণু শোষণ করে নেয় এবং তার পরিবর্তে মিথেনের একটি অণু (CH_4) স্থানচ্যুত হয়। এই প্রক্রিয়া জারি থাকলে কয়লা স্তর থেকে মিথেন (কোলবেড মিথেন) উদ্ধারের সম্ভাবনা অনেক বাড়বে। আমেরিকা, জাপান ও চীনের পাশাপাশি এ বিষয়ে ভারতেও গবেষণা চলছে।

চিত্র-৩
কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎস, আবদ্ধ করা, ভূমিতে ও ভূগর্ভে সঞ্চয় করার বিভিন্ন বিকল্প

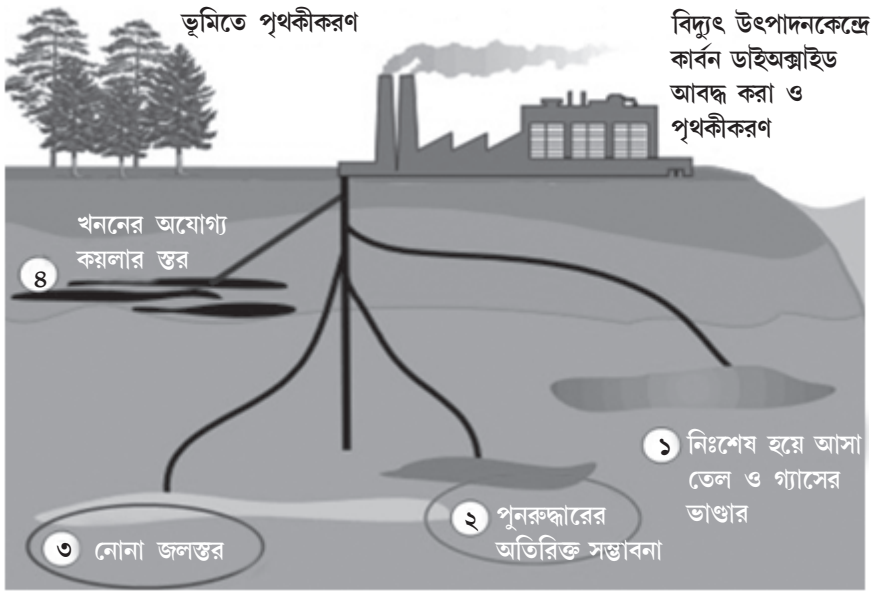

(চ) **কার্বন ডাইঅক্সাইড সদ্ব্যবহারের বিভিন্ন প্রযুক্তি :** সুষ্ঠু কার্বন ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে সঞ্চিত কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কাজে লাগানোর কথাও এখন ভাবা হচ্ছে। এই কাজ একদম ঝুঁকিবিহীন এবং এ কাজে লাভ বই ক্ষতি নেই। জৈব পদ্ধতির কথা বলতে গেলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন শোষণের ব্যবস্থা করে এবং বনসৃজনে সাহায্য করে। রাসায়নিক বিচারে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়া সহজে না হলেও উপযুক্ত তাপ ও চাপ প্রয়োগ করে অথবা উপযুক্ত অনুঘটক ব্যবহারের মাধ্যমে এর দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো যেতে পারে। এভাবেই ইথানল বা মিথানলের মতো জ্বালানি অথবা সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এছাড়া খাদ্য প্রক্রিয়াকরণক্ষেত্রে বা কার্বোনেটেড পানীয় তৈরির কাজেও কাঁচামাল হিসাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড কাজে লাগে। বর্জ্য জল বা সমুদ্রের আণবিক শৈবালের (মাইক্রো অ্যালগি) বায়ো রিঅ্যাক্টিং মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে জ্বালানি, ওষুধপত্র ও আরও নানান ধরনের মূল্যযুক্ত সামগ্রী তৈরি করা যেতে পারে।

(ছ) **সমুদ্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চয় এবং লোহার মাধ্যমে উর্বরতা বৃদ্ধি :** সমুদ্রই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সবচেয়ে বড় সঞ্চয় ভাণ্ডার। কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথকীকরণের জন্য তাই সবার আগে সমুদ্রকেই বেছে নেওয়া হয়। সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢোকানো যেতে পারে। গভীরতা ৩০০ মিটারের কম হলে ভূপৃষ্ঠের নানান ফাঁকফোকর দিয়ে এই ক্ষতিকর গ্যাস আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসতে পারে। ১০০০ মিটার গভীরতায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢোকালে তার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসার প্রক্রিয়া হয়তো বিলম্বিত হয় কিন্তু তাতে সামুদ্রিক প্রাণীজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। ৩ হাজার মিটার গভীরতায় তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢোকানোর পদ্ধতিই সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ এই তরল জলের চেয়ে ঘন হওয়ায় জলের তলদেশে তা স্থায়ী সরোবরের আকারে আবদ্ধ থাকে। সমুদ্রে

কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চয়ের অন্যান্য বিকল্পের মধ্যে রয়েছে—থার্মোহাইলিন অঞ্চলগুলিতে হিমায়িত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঞ্চয়, সামুদ্রিক সাইনোব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করা এবং ফাইটোপ্ল্যাংকটন তথা সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে সমুদ্রের উপরিতলে লোহার গুঁড়োর ব্যবহার। বিভিন্ন সামুদ্রিক অঞ্চলে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করে সমুদ্রের উর্বরতা বৃদ্ধির যে বড় মাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাতে নেওয়া হয়েছে তার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। তবে এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলা উচিত।

সরকার তথা শিল্পমহলের সহযোগিতায় কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথকীকরণ সংক্রান্ত গবেষণার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে ভারত। কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করা ও পৃথকীকরণের কিছু কিছু ক্ষেত্র বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তো বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও কাজ চলছে। এ সংক্রান্ত প্রতিটি প্রযুক্তির পরিসরও বৃহৎ এবং প্রতিটি প্রযুক্তি নিয়েই আলাদা আলাদাভাবে কাজ করতে হবে। শক্তিক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধকরণ এবং তার পৃথকীকরণ ও সদ্ব্যবহারের বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দিল্লিতে আমরা একটি কর্মশিবিরের আয়োজন করেছিলাম। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পমহলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন এই কর্মশিবিরে। কর্মশিবিরের শেষে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি পেশ করা হল—

- কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধ বা সঞ্চয় করার জন্য একটি পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা যাতে এই পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যয়সাশ্রয়ী হয়।
- অ্যামোনিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চয়ের জন্য সার ও রাসায়নিক মন্ত্রক, কৃষি মন্ত্রক, ইস্পাত মন্ত্রক, বিদ্যুৎ মন্ত্রক তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মিলিত উদ্যোগে একটি বহুক্ষেত্রীয় গবেষণা কর্মসূচি শুরু করা।

দেশে এই কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদারের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় রাখতে এক্ষেত্রে একটি সমন্বয়রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানও প্রয়োজন।

৩. পরিশেষে

একুশ শতকের শক্তিক্ষেত্র নানান রূপান্তর পর্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। চাহিদা ক্ষেত্রগুলির চেয়ে শক্তি সরবরাহ ক্ষেত্রগুলি এখন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। জলবায়ু বা দীর্ঘমেয়াদে শক্তিসম্পদ ব্যবহার নিয়ে যে নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে তার প্রভাব পড়বে কয়লা ব্যবহারকারী ক্ষেত্রগুলির ওপর এবং মূল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলি এর প্রভাব থেকে বাদ পড়বে না। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি রোধের লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকারও গবেষকদের এবার তাদের কর্মসূচিগুলিকে নতুন করে সাজাতে হবে। অপচয় রোধ করে শক্তিসম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের জন্য নতুন নতুন সরঞ্জাম তৈরি করতে হবে। তৈরি করতে হবে সোলার থার্মাল জেনারেটর এবং কনসেনট্রেটর। একইসঙ্গে কার্বন পৃথকীকরণ প্রযুক্তির জন্য চালিয়ে যেতে হবে আন্তঃবিভাগীয় (মাল্টি ডিসিপ্লিনারি) গবেষণা। কারণ এই প্রযুক্তিগুলি এখনও পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে লাভবান বলে প্রমাণিত হয়নি। শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত শিল্পমহল বর্তমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সম্বন্ধে কতটা ওয়াকিবহাল তা জানতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের সুপরিকল্পিত বিকাশ, উন্নত কৃষি পরিচালন ব্যবস্থা তথা কৃষি ও বনপালন বিদ্যাও জরুরি হয়ে পড়েছে। শক্তি উৎপাদন শিল্পে ভারত এখন বিশ্বের প্রথম সারিতে উঠে আসার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় স্তরে গবেষণা ও উন্নয়নখাতে বিনিয়োগ বাড়াতেই হবে। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদারের নিয়মিত তথ্য ও জ্ঞানের আদান-প্রদানও সমান জরুরি।❑

[লেখক নতুন দিল্লির ক্লাইমেট চেঞ্জ রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর বিজ্ঞানী (CSIR এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট) এবং ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রাক্তন উপদেষ্টা।
email : maltigoel2008@gmail.com]

বিশদে জানতে পড়ুন :

1. Integrated Energy Policy, 2008, Report of the Expert Committee, Planning Commission 2006, Government of India and Ministry of Coal, Govt. of India, Annual Report.
2. Goel Malti, S.N. Charan, A.K. Bhandari, 2008, CO2 Sequestration : Recent Indian Research, IUGS in Indian report of INSA 2004-2008, Eds. A.K. Singhvi, A Bhattacharya and S. Guha, INSA Platinum Jublee publication, pp. 56-60.
3. Bachu, S., W.D. Gunter and E.H. Perkins. 1994. Aquifer disposal of CO_2 : Hydrodynamic and mineral trapping. *Energy Conversion Management* 35 : 269-279.
4. Accelerating the uptake of CCS : Industrial use of captured carbon dioxide. 2011. Parsons Brinckerhoff in collaboration with the Global CCS Institute, Report No., March.
5. Malti Goel, Perspectives in CO_2 Sequestration technology and an Awareness Programme, in CO_2 Sequestration Technologies for Clean Energy, Eds. S.Z. Qasim & Malti Goel, Daya Publishing house, p. 22-39, 2010.
6. Wisniewski, Joc, R.K. Dixon, J.D. Kinswan, R.N. Sampson and A.E. Lugo, 1993. Carbon dioxide sequestration in terrestrial ecosystem. *Climate Research* 3 : 1-5.

জলবায়ু সুস্থিত কৃষি

*পৃথিবীর বর্ধিষ্ণু উষ্ণতার ঋণাত্মক প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতের কৃষি ক্ষেত্র কীভাবে এই মস্ত বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবে বিস্তারে জানাচ্ছেন—***ড. সগর মৈত্র।**

বর্তমানে ভারতের কৃষির ওপরে এক মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে হাজির হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন। দীর্ঘ সময় ধরে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির বদলের ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে জলবায়ু। কম ও বেশি তাপমাত্রা, বৃষ্টির মেয়াদকাল ও পরিমাণের পরিবর্তন, সমুদ্রের জলতল বেড়ে যাওয়া—এসবের কুপ্রভাব পড়ছে চাষের ওপরে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং গ্রিনহাউস এফেক্টের দরুন বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে এর মধ্যে কৃষি হল সবচেয়ে ভঙ্গুর একটি ক্ষেত্র। কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে ফসলের ওপরে। বিভিন্ন ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস (যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোফ্লুওরোকার্বন, পারফ্লুওরোকার্বন, সালফার হেক্সাক্লোরাইড) বাড়িয়ে চলেছে পৃথিবীর উষ্ণতা। ১৯ শতকের শেষদিক থেকে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৭৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং অনুমান করা হয় যে, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের তাপমাত্রা ১.৪-৫.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে বেশিরভাগ ফসলেরই ফলন কমে যায়, রোগ-পোকা-আগাছার বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। গুটিকয় ফসলের ফলন বাড়ে বেশি তাপমাত্রার কারণে বা তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে শীতপ্রধান এলাকায় ফসল বৈচিত্রায়নের সুযোগ বেড়েছে। তবে মোটের ওপরে বলা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাবই বেশি প্রকট। যেকোনও কৃষি জলবায়ু অঞ্চলই হোক না কেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সেচসেবিত এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলের অভাবের কারণে শস্যের ফলন কমে। আবার বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলে শস্যের ফলন প্রভাবিত হয় বৃষ্টির পরিমাণ ও মেয়াদকালের তারতম্যের কারণে। কোনও এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়লে ফসলে রোগ ও পোকার উপদ্রব বাড়ে, বৃষ্টিসেবিত উঁচু জমিতে দেখা যায় আগাছার বাড়বাড়ন্ত। তখন শস্যসুরক্ষার কাজটি দুরূহ হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র ফসল চাষই নয়, কৃষির সহযোগী বিভিন্ন বিষয়েও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেখা যায়। কৃষি ও তার সহযোগী ক্ষেত্রগুলোর উৎপাদন কমে যাওয়া মানেই সার্বিকভাবে বাজারে কৃষিপণ্যের জোগান কমা, দাম বেড়ে যাওয়া, ব্যাপক অর্থে কৃষি-অর্থনীতির সুস্থিতিতে ধাক্কা লাগা।

বিশ্ব উষ্ণায়ন

যেভাবে পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে চলেছে, তার পরিণাম আগামীদিনে ভয়াবহ হয়ে উঠবে এবং কৃষির ওপরে তার সুস্পষ্ট ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে। ২০৮০ সালে সারা বিশ্বের কৃষি উৎপাদন ৩-১৬ শতাংশ পর্যন্ত কমবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় তাপমাত্রা এখনই সহনশীল মাত্রার কাছাকাছি বা তার চেয়ে সামান্য বেশি আছে, ২০৮০ সালে তা বেড়ে যাওয়ার কারণে ১০-২৫ শতাংশ ফলনহানি ঘটবে। উন্নত ও ধনী দেশগুলো তুলনায় একটু সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। কারণ এই সব দেশের জনসংখ্যা বেশি নয় এবং সেই জনসংখ্যার খাদ্য জোগানো দুরূহ নয়, কৃষি ব্যবস্থা উন্নত ও নিয়ন্ত্রিত। ফলে এই সব দেশে ওই সময়ে কৃষি উৎপাদন ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। ভারতের মতো জনবহুল দেশে পরিবেশবান্ধব চিরায়ত খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রাখার চেয়ে দেশবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তি মেটানো বেশি জরুরি হয়ে দেখা দেয়। তাছাড়া এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা প্রধানত ছোট ও প্রান্তিক এবং গরিব চাষিদের দ্বারা পরিচালিত। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ চাষজমি বৃষ্টি সেবিত। এইরকম পরিস্থিতিতে অনুমান করা হয় যে, ২০৮০ সাল নাগাদ বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে আমাদের দেশের ফলন ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কেন এই উষ্ণায়ন? প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে তথাকথিত উন্নয়নের অন্তরালে। শক্তি, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে আমরা বাড়িয়েছি বিভিন্ন গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বন-সংহার এবং জমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন। এগুলোই বাড়িয়েছে গ্রিনহাউস গ্যাস, যেগুলো ইনফ্রা-রেড বিকিরণ শোষণ করে বাড়িয়েছে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা। যত দোষের মূলে এই গ্যাসগুলোই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদনে শক্তি ও শিল্পের পাশাপাশি কৃষিরও অবদান রয়েছে। প্রধান তিনটি গ্রিনহাউস গ্যাস—কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড উৎপাদনে কৃষিও যথেষ্ট দায়ী। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাতাসে এই তিনটি গ্যাসের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০, ১৪৫ এবং ১৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। কৃষিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রধান উৎস হল জৈব পদার্থের পচন, দাবানল, খামারের বর্জ্য জ্বালানো, বন সংহার, জমি ব্যবহারের বদল প্রভৃতি। অকর্ষিত (no tilled) জমির চেয়ে কর্ষিত (tilled)

জমি থেকে বেশি পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। জমি থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনে তাপমাত্রাও প্রভাব রয়েছে। কারণ তাপমাত্রা বাড়লে শিকড়ের শ্বসন বাড়ে, তখন বেশি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়।

তবে কার্বন ডাইঅক্সাইডের চেয়ে মিথেন ২৫ গুণ বেশি তাপ ধরে রাখে। জমিতে মিথেনের উৎস হল : জলাজমি, ধানখেত, জৈববস্তুর পচন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল নিষ্কাশন, জৈববর্জ্য পোড়ানো, জল দাঁড়িয়ে থাকা ধান জমি, গো-সম্পদ প্রভৃতি। গোরু-মহিষ প্রভৃতি প্রাণীর পাকস্থলীর একটা অংশ হল রুমেন। বায়ুনিরুদ্ধ অবস্থায় রুমেনের মধ্যে খাদ্যের পাচন হয়। তখন মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। মাটিতে বসবাসকারী methanogens গ্রুপের ব্যাকটেরিয়ার বিপাকীয় ক্রিয়ায় মিথেন উৎপাদিত হয়। জলমগ্ন জমি, ধানখেত প্রভৃতিতে মাটিতে বাতাস থাকে। বাতাস তথা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এই সব ব্যাকটেরিয়ার জৈবিক ক্রিয়ায় মিথেন উৎপন্ন হয়।

আরেকটি ক্ষতিকারক গ্রিনহাউস গ্যাস হল নাইট্রাস অক্সাইড। এটি কার্বন ডাইঅক্সাইডের চেয়ে ২৯৮ গুণ সক্রিয়। মোট যে পরিমাণ নাইট্রাস অক্সাইড বাতাসে মেশে, তার বেশিরভাগটা আসে মাটি থেকেই। এর প্রধান উৎস হল মাটি কর্ষণ, নাইট্রোজেনঘটিত সার এবং জৈবসার প্রয়োগ, ফসলের বর্জ্য এবং ফসিল জ্বালানির জ্বলন প্রভৃতি। চাষের দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে, মাটি থেকে নাইট্রাস অক্সাইড বেরিয়ে যাওয়ার মানে হল ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান নাইট্রোজেনের অপচয় এবং নাইট্রোজেনের ব্যবহারিক দক্ষতার হ্রাস।

কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভঙ্গুর দশা বাংলাদেশের, যেখানে সমুদ্রের জলতল দেড় মিটার উঁচু হওয়ার কারণে কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার ফলে এক-পঞ্চমাংশ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবেন। তার পরেই অবস্থান ভারতের। সমুদ্রতল এক মিটার উঁচু হলে আমাদের দেশের ৫৭৬৪ বর্গ কিলোমিটার জমি এবং ৪২০০ কিলোমিটার রাস্তা হারিয়ে যাবে, স্থানচ্যুত হবেন ৭.১ মিলিয়ন মানুষ। ভারতের কৃষি ও কৃষকেরা এখনই যথেষ্ট সমস্যাগ্রস্ত। ১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের যে আড়াই লাখ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন তাঁদের ফসলের ক্ষতি হওয়ার জন্য, সেখানে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা তথা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও কম নয়।

আমাদের দেশে প্রায় প্রতিবছরই দেখা যায়, দেশের কোনও না কোনও প্রান্তে খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোনের মতো ঘটনা। বিশ্বের প্রায় ১৭.৫ শতাংশ জনসমষ্টিকে খাদ্যের জোগান দিতে হচ্ছে মাত্র ২.৪ শতাংশ কৃষিজমি ও ৪ শতাংশ জলসম্পদের ওপরে ভিত্তি করে। বিশ্ব উষ্ণায়ন বা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সারা বিশ্বেই দেখা যায়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রভাব বেশ প্রকট। কারণ আমাদের দেশ জনবহুল এবং কৃষির ওপরে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। ভারতের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল ক্রমশ বাড়তে থাকা জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করা। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদের ভাঁড়ার কমছে, বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা। আর এরকম পরিস্থিতিতে জলবায়ু পরিবর্তন যদি বাড়তি বিড়ম্বনার কারণ হয়, তাহলে সমস্যাটা আরও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিশাল জনসমষ্টির খাদ্যচাহিদা মেটাতে জলবায়ু সুস্থিত কৃষি (Climate Resilient Agriculture, বা সংক্ষেপে CRA) পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণ করা জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চিরায়ত উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে হবে, কমতে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার করতে হবে এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

জলবায়ু সুস্থিত কৃষি মানে হল জলবায়ুর বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতি (যেমন—অনাবৃষ্টি, খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, গরম বা ঠান্ডা বায়ুপ্রবাহ, রোগ-পোকার তীব্র আক্রমণ ও তার জন্য ফলনহানি বা

NICRA প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের একটি প্রকল্প হল National Initiative on Climate Resilient Agriculture, যেটি সংক্ষেপে NICRA নামে পরিচিত। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে এটি চালু হয়। কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাবের মোকাবিলাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের অধীনে গবেষণা ও সম্ভাব্য কৃষি প্রযুক্তির প্রদর্শন ক্ষেত্র গড়ে তোলা হয়। প্রতিকূল জলবায়ুতে ও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ফসলের ও কৃষিকর্মের জাত ও প্রজাতিগত পরিবর্তন এবং সেই পরিস্থিতির উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন নির্ধারণ করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। কৃষি জলবায়ুর নিরিখে দেশের বিভিন্ন ভঙ্গুর এলাকাগুলোর মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। ভারতের ১০০টি সবচেয়ে ভঙ্গুর জেলা এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। এই সব এলাকায় ফসলের খরা ও বন্যা সহনশীল জাতের ফসল চাষ, জল চয়ন, জল ও মাটি সংরক্ষণ, সংরক্ষণ কৃষি ব্যবস্থা অবলম্বন, কৃষি যন্ত্রায়ন, এলাকা উপযোগী বিভিন্ন ফসল চাষ ও শস্যরীতি, আপৎকালীন কৃষিব্যবস্থা প্রভৃতির ওপরে গবেষণা এবং প্রদর্শন ক্ষেত্র গড়ে তোলা হয়। প্রাণীপালন এবং মাছ চাষের ক্ষেত্রেও উন্নত ও এলাকা উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও প্রয়োগের ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এলাকার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আবহাওয়া নিরীক্ষণের ওপরে ভিত্তি করে আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি পরামর্শের ব্যবস্থা করা হয় এবং চাষিদের মধ্যে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা তথা চাষিদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয় Village Climate Risk Management Committee (VCRMC)। এইভাবে প্রতিকূলতার কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জলবায়ু সুস্থিত কৃষি পরিকল্পনা রচনার লক্ষ্যে পথচলা শুরু হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পের বয়স চার বছর পেরিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন এলাকার সাপেক্ষে প্রযুক্তি নির্ধারণের কাজও খানিকটা এগিয়েছে। তবে এ এক নিরন্তর প্রয়াস, তাই চালিয়ে যেতে হবে NICRA প্রকল্পের কাজ।

শস্যের মড়ক প্রভৃতি দুর্যোগ)-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত সামাল দেওয়ার জন্য অভিযোজন, প্রশমন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি অবলম্বনের দ্বারা রচনা করা এক সুস্থিত কৃষিব্যবস্থা। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এ হল এক এমন কৃষিব্যবস্থা যা বিরূপ জলবায়ুতে ফসলকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। এ হল জমি, মাটি, জল ও প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে জলবায়ুর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কৃষি প্রযুক্তি। লক্ষ্য চিরায়ত (sustainable) উৎপাদনের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখা।

কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব দেখা যায় মোট ফসল উৎপাদনে এবং ফসলের গুণমানে। প্রভাব দেখা যায় বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি অবলম্বনে (যেমন— সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়, জলসেচ বা জলনিকাশ, কৃষিবিষ প্রয়োগের সময়, পদ্ধতি/প্রকার ও পরিমাণ)। তাছাড়া আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কৃষিজমি থেকে জলনিকাশের ফলে জমিতে প্রয়োগ করা সারের অপচয় হয় এবং জলের সঙ্গে মাটিও ধুয়ে যায়, যার প্রভাব পড়ে কৃষি পরিবেশে তথা কৃষি বাস্তুতন্ত্রে। বিভিন্ন ফসলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় কোনও একটা বড়সড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার পরে সেখানকার জলবায়ুতেও অনেকসময় পরিবর্তন আসে, বদলে যায় কৃষি-বাস্তুতন্ত্রের আদল। উদাহরণ হিসাবে ২০০৯ সালের আইলার কথা বলা যেতে পারে। এই ঝড়ের পরে সুন্দরবন এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে দু-তিন সপ্তাহ বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে নোনা জল দাঁড়িয়েছিল, যা এখানকার জমির চরিত্র পালটে দিয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে স্বাভাবিক চাষবাসের ওপরেও। যেমন, জমির নোনাভাব বেড়ে যাওয়ার পরে এই সব জমিগুলোতে যে জাতের ধানগুলো আগে চাষ করা হত, সেগুলো আর করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নোনাভাব সহনশীল জাতের বীজ। কিন্তু সেই প্রস্তুতি তো ছিল না। তাই আইলা উত্তর পর্বে নোনা সহনশীল ধানের বীজের খোঁজ পড়ে যায় এবং সেই

চিত্র-১
খামারে পুকুর খুঁড়ে জল চয়ন

চিত্র-২
ভূমি রূপায়ণ (www.nimpithrkashram.org)

জাতগুলোর বীজের জোগান নিশ্চিত করতে বীজ পরিবর্ধনের ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে মরশুমি ও বর্ষজীবী ফসলগুলো কমপক্ষে ১০ দিন থেকে শুরু করে দুই-তিন সপ্তাহ আগেই পরিণতি পায়। এর মানে হল কম ফলন। এছাড়া ধান, গম, সূর্যমুখী প্রভৃতি ফসলের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। এই ফসলগুলোর ফুল আসা, ফুলের নিষেক বা পরাগমিলন প্রভৃতি প্রভাবিত হয়, যার প্রতিফলন দেখা যায় ফলনে। বেশিরভাগ গবেষণাতেই দেখা গিয়েছে, তাপমাত্রা ২-৩.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃষ্টির ফলে বৃষ্টিনির্ভর ধান ও গম চাষের অর্থনীতি ৯-২৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ধান ও গমের ফলন ১৫-১৭ শতাংশ কম হয়। আবার বেশি বৃষ্টি বা বন্যা এবং কম বৃষ্টি বা খরার কারণে স্বাভাবিক ফলনের ক্ষতি তো হয়ই, সেই সঙ্গে দেখা যায় বাড়তি সমস্যা হিসাবে রোগ, পোকা, আগাছার বাড়বৃদ্ধি। বিভিন্ন শস্য-মডেল সংক্রান্ত গবেষণা থেকে জানা যায় যে, জলবায়ু

পরিবর্তনের ফলে ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের ফলন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার চীনাবাদাম, সয়াবিন প্রভৃতি ফসলে তেমন একটা কুপ্রভাব পড়ে না। বিভিন্ন ফসলে ও কৃষিকর্মে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কেমন হতে পারে বা অতীতে হয়েছে, তার দিকে এবারে তাকানো যাক।

খরা বা বন্যার মতো বড়সড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা না হয় বাদই দিলাম, মৌসুমি বৃষ্টি এখন যথেষ্ট খামখেয়ালি হয়ে উঠেছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঠিকমতো মিলে যাচ্ছে না। যখন বৃষ্টি পড়ছে, তখন টানা কয়েকদিন ভারী বর্ষণ হচ্ছে। তারপরেই দেখা যাচ্ছে লম্বা বিরতি। এর ফলে মোট বৃষ্টিপাতের খুব একটা হেরফের না হলেও বৃষ্টির দিন কমছে। বৃষ্টির বিন্যাস কাঙ্ক্ষিত না হওয়ায় শস্যের ফলনের ওপরে পড়ছে তার প্রভাব। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বৃষ্টিসেবিত এলাকায় ধানের ফলন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কম বা বেশি বৃষ্টির কারণে। তবে বেশি বৃষ্টির তুলনায় কম বৃষ্টির কুপ্রভাবই বেশি। শস্য মডেলিং সংক্রান্ত গবেষণা থেকে জানা যায় যে, এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বাড়ার কারণে আমাদের দেশে গমের উৎপাদন চার থেকে পাঁচ মিলিয়ন টন কমে যেতে পারে। সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি ও দক্ষিণের মালভূমি এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে রবিখন্দের ভুট্টার ফলন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মোকাবিলায় প্রয়োজন হয়ে পড়বে বেশি তাপমাত্রা সহনশীল, স্বল্পমেয়াদি জাতের উদ্ভাবন। বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ৫০০ পিপিএম-এর চেয়ে বেশি হয়ে গেলে ধান, গম, ডালশস্য ও তৈলবীজের ফলন ১০-২০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের যা গতিপ্রকৃতি, তাতে ২০৩০ সালে পঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্য ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে আলুর ফলন ৩-৭ শতাংশ কমে যাবে। দেশের বাকি অংশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, এই ফলনহ্রাসের মাত্রা দাঁড়াতে পারে ৪-১৬ শতাংশ। আসলে মাটির নীচে থাকা আলুর কন্দের (যেটি এই উদ্ভিদের অর্থনৈতিক অংশ) বৃদ্ধির সময়ে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার

চিত্র-৩
হাপা পদ্ধতিতে পুরুলিয়ায় জল চয়ন

চিত্র-৪
স্ট্রবেরির জমিতে খড় সহযোগে মালচিং

কারণেই এই ফলনহানি হবে। গরম বাতাস ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে আলু ও অন্যান্য সবজির মেয়াদকাল ও ফলন কমে যাবে। ১৯৮২-৮৩ এবং ২০০৩-০৪ সালে দেখা যায়, খরিফে খরার কারণে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে নারকেল, কোকো, কফি, চা, এলাচ, গোলমরিচ প্রভৃতি বাগিচা ও মশলা ফসলের ফলন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আবার ২০১০ সালে শীতকালে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কুপ্রভাব পড়েছিল দেশের বিভিন্ন এলাকায় আমের মুকুল আসায়। অন্যান্য উদ্যানজাত ফসলের মধ্যে আঙুর ও কাজুবাদামের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফলন কমে যাওয়া এবং বিভিন্ন রোগ-পোকার উপদ্রবের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা দেখা যায়। এই দুটি ফসল আবার রপ্তানি বাণিজ্যের দিক থেকেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এগুলির ফলনহ্রাস বা গুণমানে খারাপ হওয়া মানে বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনীতির ওপরেও ঋণাত্মক প্রভাব।

মাঠের ফসল বা উদ্যানজাত ফসলই নয়, কৃষির সহযোগী বিভিন্ন ক্ষেত্রেও দেখা যায়

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। যেমন ধরা যাক প্রাণীপালন তথা গোপালনের কথা। প্রাণীখাদ্যের অন্যতম উপাদান হল বিভিন্ন ফসল বা তার উপজাত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যখন ফসল উৎপাদনে পড়বে, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রাণীখাদ্যের জোগানেও তা দেখা দেবে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি দেখা দেবে দুধ দেওয়া প্রাণীর ক্ষেত্রে। খরা, বন্যা, বেশি বা কম বৃষ্টি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের দ্বারা প্রাণীসম্পদের উৎপাদন কমতে পারে। তাছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে প্রাণীদেহে নানারকম পরিবর্তন হয়—শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে, শ্বাসক্রিয়ার গতি বাড়ে, শরীর রক্ষায় বেশি শক্তি খরচ হয়। দেখা গেছে, তীব্র দাবদাহের সময় শরীরের স্বাভাবিক জৈবিক ক্রিয়া বজায় রাখতে প্রাণীদের ২০-৩০ শতাংশ বেশি শক্তি দরকার হয়, তার ফলে দুধ উৎপাদনের জন্য শক্তিতে টান পড়ে। গরম বাড়লে প্রাণী দানাভুসি খাওয়ায় অনীহা দেখায়, আর তার ফলেও দুধের উৎপাদন কমে। তীব্র গরমের মেয়াদকাল যদি বেশিদিন স্থায়ী হয়, তাহলে একটি বিয়ানে একটা দুধ দেওয়া প্রাণীর কাছ থেকে যতটা দুধ পাওয়া যেত, তার পরিমাণ কমে যায়। স্বাভাবিকের চেয়ে যদি তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে বা কমে যায়, তাহলে দুধ দেওয়া প্রাণীর দুধের ফলন অনেকটাই যায় কমে। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, বর্তমান সময়ে তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে আমাদের দেশে বার্ষিক ২ মিলিয়ন টন দুধের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা দেশের মোট দুধ উৎপাদনের শতকরা দুই ভাগ। এই হারে যদি চলতে থাকে বিশ্ব উষ্ণায়নের কুপ্রভাব, তাহলে ২০৫০ সালে কেবলমাত্র তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার কারণেই ১৫ মিলিয়ন টন দুধের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, প্রথম বিয়ানের প্রাণীদের ক্ষেত্রে তাপমাত্রার কুপ্রভাবে ১০-৩০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বিয়ানের প্রাণীদের ক্ষেত্রে ৫-২০ শতাংশ দুধ কমে। আমাদের দেশে উত্তর ভারতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব প্রাণীপালনে সবচেয়ে বেশি দেখা দেবে। আগামীদিনে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন রোগসৃষ্টিকারী বিভিন্ন পোকামাকড় ও জীবাণুর সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং প্রাণীদেহে রোগ বাড়বে। প্রকৃতির রুক্ষতার কারণে ধকলজনিত সমস্যায় দুধ দেওয়া প্রাণীর পালানপ্রদাহ (বা ম্যাসটাইটিস) রোগের উপদ্রব বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেবলমাত্র খাদ্যগ্রহণ বা দুধের উৎপাদনই নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গোরু বা মহিষের প্রজননের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। অন্যান্য গবাদি প্রাণীর মধ্যে শূকরের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন প্রাণীর দৈহিক বৃদ্ধি ও প্রজননের ওপরে কুপ্রভাব দেখা যায়। তাপমাত্রা বাড়লে ব্রয়লার মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি অর্থাৎ মাংসের উৎপাদন কমে এবং ডিমপাড়া মুরগির ডিমের উৎপাদন কমে।

মাছ চাষের ক্ষেত্রেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেখা যায়। উঁচু ও ঠান্ডাপ্রবণ এলাকায় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ধনাত্মক প্রভাব দেখা যায়। কারণ কম ঠান্ডার জন্য মাছের মৃত্যু কমে যাওয়া এবং ফলন বেড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা লক্ষ করা যায়। সমুদ্র উপকূলের তাপমাত্রা গত ৪৫ বছরে ০.২-০.৩ ডিগ্রি

চিত্র-৫
স্ট্রবেরির জমিতে পলিমালচিং

চিত্র-৬
আইলার গতিপথ

সেন্টিগ্রেড বেড়ে গিয়েছে এবং ২০৯৯ সালের মধ্যে ২.০-৩.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাবে। এর ফলে সমুদ্রের জলতল আগামী ৫০ বছরে ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়ার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে চাষবাসের এলাকা সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে পড়ায় কমে যাবে বটে, কিন্তু নোনা জলে মাছ চাষের এলাকা বাড়বে। এলাকা বাড়ার কারণে নোনা জলে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ এবং তাপমাত্রা বাড়ার কারণে প্রজাতিগত বৈচিত্র ঘটতে পারে। কিন্তু মিষ্টি বা স্বাদু জলে অর্থাৎ ছোট ছোট পুকুর, খাল, বিল, বাওড়ে যেসব মাছ চাষ হয়, সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব দেখা দিচ্ছে। খরা বা বন্যার ফলে স্বাভাবিক মাছ চাষে বিঘ্ন ঘটে। চাষের মেয়াদকাল কমে যায়। ছোট চাষিরা তখন বড় মাছ উৎপাদনের দিকে যেতে পারেন না। স্বল্প সময়ে চারা মাছ উৎপাদন করতে থাকেন এবং সেগুলোই বাজারে আসে টেবল-ফিস হিসাবে। তাছাড়া প্রথাগত মাছের প্রজাতিতেও বদল আসে, সেক্ষেত্রে ছোট মাছ চাষিরা বেছে নেন মাছের সেই সব প্রজাতিগুলোকে যেগুলো অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়ে বেশি বা বেশি ফলন দেয়।

মাটির উর্বরতার ক্ষেত্রেও জলবায়ু পরিবর্তন তথা উষ্ণায়নের প্রভাব রয়েছে। তাপমাত্রা বাড়লে জৈববস্তুর পচন দ্রুত হয় এবং গাছের খাদ্যমৌল গ্রহণযোগ্য অবস্থায় দ্রুত চলে আসে। কিন্তু এই সুফল স্বল্পমেয়াদি। দীর্ঘ সময়ের সাপেক্ষে দেখা যায়, মাটিতে রয়ে যাওয়া জৈব পদার্থের ভাণ্ডার খুব তাড়াতাড়ি নিঃষেশিত হয়ে পড়ে, যা আখেরে মাটিকে অনুর্বর করে তোলে। আরেকটি ক্ষতির কথা বলতে হয় যার তাৎক্ষণিক প্রভাব তেমন একটা চোখে পড়ে না, কিন্তু টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ। পুরনো সময়ের নথির দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় যে, আগে কোনও একটি জায়গার কৃষি বাস্তুতন্ত্রে যত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তার পরিমাণ কমছে, বাড়ছে বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রজাতির জীবের সংখ্যা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, রোজকার কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় এ আর এমন কী গুরুত্বপূর্ণ! কিন্তু একথা সত্যি যে, কৃষিতে এবং কৃষি বাস্তুতন্ত্রে বৈচিত্র থাকলেই সেই কৃষিব্যবস্থা টেকসই হয়, তখন যে কোনওরকম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মোকাবিলা করা সহজ হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যে কৃষিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিকারক, এমনটা নয়। এর উপকারী দিকও আছে, তবে তা বিশেষ কয়েকটি ফসলে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে। সাধারণভাবে বাতাসে ০.০৩ শতাংশ বা ৩০০ পিপিএম কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। কিন্তু গাছ এর চেয়ে বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড কাজে লাগাতে পারে। বিশেষ করে পলিহাউসের মধ্যে যেসব ফসল চাষ করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘাটতি দেখা যায়। তখন কৃত্রিমভাবে এই গ্যাস ইঞ্জেক্ট করার দরকার হয়। যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে পলিহাউসে চাষ করা ফসলের ক্ষেত্রে তা সুফলদায়ী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, ভুট্টা, জোয়ার, বিভিন্ন মিলেট, (যেগুলো C4 শ্রেণিভুক্ত,) প্রভৃতি ফসলগুলোকে যদি জল ও খাদ্য উপাদানের জোগান ভালো দেওয়া যায়, তাহলে এদের বাড়বৃদ্ধি ও ফলন বেশি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বাড়লে। আবার কয়েকটি উদ্যানজাত ফসলের ক্ষেত্রে সদর্থক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তাপমাত্রা বাড়ার কারণে গরমপ্রধান এলাকায় এতদিন যেসব ফসলগুলো চাষ করা হত, সেগুলোর চাষ শীতপ্রধান এলাকায় দেখা যাচ্ছে। এর ফলে নতুন বাজার তৈরি হচ্ছে। যেমন আপেল চাষ এখন হিমাচলপ্রদেশের প্রথাগত এলাকা থেকে আরও উঁচুতে বা বেশি ঠান্ডা এলাকার দিকে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে সেই সব এলাকায় কিউয়ি-র মতো ফল বা বিভিন্ন ধরনের শীতের সবজি বছরের দীর্ঘ সময় ধরে (অর্থাৎ মূল মরশুমের আগে ও পরে) চাষ করা হচ্ছে, যা নতুন সম্ভাবনার একটি ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। একইরকমভাবে, যেসব ঠান্ডাপ্রধান এলাকা এতদিন আম চাষের পক্ষে উপযোগী নয় বলে চিহ্নিত ছিল, এখন তাপমাত্রা বাড়ার কারণে সেই সব এলাকায় আম চাষের প্রসার ঘটছে। এর ফলে এই ফলটির এলাকা ও উৎপাদন এবং লভ্যতার পরিধি বাড়ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব প্রশমন

কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যে কারণগুলো দায়ী, সেগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে কুপ্রভাব প্রশমন করা সম্ভব। যেমন ধরা যাক মিথেন গ্যাস নির্গমনের কথা। এশিয়া তথা ভারতের প্রধান ফসল হল ধান। আর প্রথাগত উপায়ে ধান চাষে ফসলটির জীবনকালের একটা বড় সময় পর্যন্ত জমিতে পাঁচ থেকে দশ সেন্টিমিটার বা তার চেয়েও বেশি জল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। যদি ধান চাষে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনা হয় এবং জল দাঁড় না করিয়ে পর্যায়ক্রমে জমি ভেজানো ও শুকানো হয়, তাহলে ধানের জমি থেকে মিথেন গ্যাসের নির্গমন ঠেকানো সম্ভব। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে System of Rice Intensification (যেটি সংক্ষেপে SRI প্রযুক্তি নামে বেশি পরিচিত) এবং Aerobic Rice চাষের কথা, যে প্রযুক্তিগুলোয় কখনওই ধানের জমিতে জল দাঁড় করিয়ে রাখা হয় না।

বিভিন্ন ধরনের জৈব বর্জ্যের পচন প্রধানত অবাত ও সবাত প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। অবাত প্রক্রিয়ায় জৈব বর্জ্য পচালে মিথেন উৎপন্ন হয়। জৈব পদার্থ পচিয়ে কম্পোস্টে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াটি যদি সবাত উপায়ে (অর্থাৎ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে করা হয়), তাহলে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয় না। চাষের জমিতে জৈব বর্জ্য মেশানোর কাজটি যদি গ্রীষ্মকালে করা হয়, তাহলে মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু অর্থাৎ অক্সিজেন থাকে, সেক্ষেত্রে মিথেন গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা কম থাকে। তাছাড়া গোরু-মহিষ প্রভৃতি ruminants শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর খাদ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনে এই সব প্রাণী পাচনক্রিয়ায় যে মিথেন উৎপন্ন হয়, তার পরিমাণ কমানো যায় এবং তা করা গেলে প্রাণীর অর্থনৈতিক উৎপাদনে (অর্থাৎ দুধ বা মাংসে) তার প্রতিফলন ঘটবে।

উন্নত কৃষি প্রযুক্তি অবলম্বনের দ্বারা চাষের জমি থেকে নাইট্রাস অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ কমানো যেতে পারে। নাইট্রাপাইরিন, ডাইসায়ানডিমাইড প্রভৃতি

নাইট্রিফিকেশান ইনহিবিটর প্রয়োগের দ্বারা এই গ্যাসের নির্গমন কমানো যেতে পারে। বিভিন্ন ভেষজ পদার্থ রয়েছে (যেমন, নিম তেল, নিম খোল, করঞ্জ বীজের নির্যাস), যেগুলো নাইট্রিফিকেশান কমায় এবং এর ফলে নাইট্রাস অক্সাইড কম বের হয়।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা প্রশমনের জন্য পরিবেশবান্ধব কৃষিপ্রযুক্তি অবলম্বন করতে হবে। জমি কর্ষণের পরিমাণ কমানো তথা শূন্য কর্ষণ প্রযুক্তি এক্ষেত্রে অবলম্বন করা যেতে পারে। জৈববর্জ্য না পুড়িয়ে মাটিতে মেশানো, মাটিতে অপরিহার্য অণুজীবের (Essential micro-organisms) সংখ্যা বাড়ানো, মাটির ওপরে আচ্ছাদন দেওয়া (মালচিং) প্রভৃতি কৃষি প্রযুক্তি অবলম্বনের দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ প্রশমন করা যেতে পারে।

২০১৫-র খরিফে পশ্চিমবঙ্গে চাষের ক্ষতি ও তার মোকাবিলায় সরকারি পদক্ষেপ

২০১৫ সালের খরিফখন্দে এ রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জুলাই-এর শেষ দিক থেকে আগস্টের প্রথমার্ধে তীব্র বর্ষণে রাজ্যে ২৪৩টি ব্লকের প্রায় ১২ লাখ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখের মতো। এইরকম পরিস্থিতিতে চাষিদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে চাষিদের হেক্টরপ্রতি ১৩,৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়। চাষিরা আবার নতুন উদ্যমে ধান চাষে নামেন। পরবর্তীকালে আবার সেপ্টেম্বর মাস থেকে বৃষ্টি উধাও। রাঢ়বঙ্গের জেলাগুলোয় দেখা যায় জলসংকট। বর্ধমান জেলাতেই প্রায় ৩৯ হাজার হেক্টর ধানের জমিতে জলের অভাব দেখা যায়। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ক্যানেলের মাধ্যমে যে সব জমি সেচের জল পায়, সেখানেও দেখা যায় জলাভাব। তখন আবার দ্রুততার সঙ্গে নেওয়া হয় আপৎকালীন ব্যবস্থা। রাজ্য সরকারের কৃষি, জলসম্পদ উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বিকল্প জলের উৎস যা ছিল, সেগুলো থেকে জল পাম্প করে এনে ধানের জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তার ফলে এই জেলার প্রায় ১৭ হাজার হেক্টর ধানজমিকে ফলনহানির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়। অন্যান্য জেলাতেও একই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় চটজলদি কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর এই পদক্ষেপ সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক।

সূত্র :

(১) মিথুন দাশগুপ্ত, দ্য ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস, ১৯ আগস্ট, ২০১৫ (www.financialexpress.com)

(২) ইকোনমিক টাইমস, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ (articles.economictimes.indiatimes.com)

(৩) অন্যান্য।

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় কৃষিপ্রযুক্তি

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় সবার আগে দরকার প্রশমনের উপযোগী কয়েকটি কৃষিপ্রযুক্তি গ্রহণ, যাতে সমস্যা আরও তীব্র না হয়ে ওঠে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কৃষির যে ক্ষেত্রগুলো দায়ী, তার ব্যাপকতার কথা চিন্তা করে সহজেই বলা যায় যে, প্রশমনের উপযোগী প্রযুক্তিগুলো হঠাৎ করে বা স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এগুলো দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াস, যেগুলো চলতেই থাকবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলোকে প্রশমিত করবে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তো কেবলমাত্র কৃষি নয়, রয়েছে শিল্প এবং শক্তির মতো ক্ষেত্র। সেই সব ক্ষেত্রগুলোয় রাশ টানতে না পরালে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়তেই থাকবে এবং অবধারিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ঘটনা ঘটতে থাকবে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় অবলম্বন করতে হবে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি। নীচে এরকম কয়েকটি প্রযুক্তির উল্লেখ করা হল।

ফসল নির্বাচন ও জাত উদ্ভাবন : পরিস্থিতি অনুযায়ী ফসল নির্বাচন ও জাত উদ্ভাবনের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি আইলাপরবর্তী পরিস্থিতির কথা। এই দুর্যোগটি হওয়ার পরে হঠাৎ করেই টনক নড়ে যে, আইলা অধ্যুষিত এলাকার জমির চরিত্র বদলে গিয়েছে, জমির নোনাভাব বেড়ে গিয়েছে, দরকার লবণ সহনশীল জাতের ধান। কিন্তু বিগত তিন-চার দশক ধরে উচ্চফলনশীল ধান চাষের প্রসারের কারণে স্থানীয় নোনা সহনশীল জাতের যে ধানগুলো আগে এখানে চাষ হত, সেগুলো প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে। কোনও কোনও এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে অল্পবিস্তর চাষ হলেও ব্যাপক এলাকায় চাষের উপযোগী বীজ পাওয়া যাবে কোথায়? স্বাভাবিকভাবেই তখন তা পাওয়া যায়নি। তবে অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায় যে, প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলায় আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ভঙ্গুর এলাকায় যে ক্ষতি হয়, তার পরিমাণকে অনেকটাই লাঘব করা যায় আপৎকালীন প্রযুক্তি অবলম্বনের দ্বারা।

বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় সক্ষম (প্রচলিত ফসলের) এরকম জাত উদ্ভাবন করতে হবে। প্রয়োজনে প্রচলিত ফসলের বদলে ধকল নিতে পারে এরকম ফসল নির্বাচন করতে হবে। এইসব ফসলের বা জাতের পর্যাপ্ত বীজের জোগান নিশ্চিত করতে হবে। কখনও আবার বর্ষাকালে খরা, বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায়। তখন প্রধান খরিফ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে মরশুমের বাকি সময়ের মধ্যে বিকল্প কোনও স্বল্পমেয়াদি ফসল চাষের কথা ভাবতে হবে এবং সেই ফসলের বীজের জোগান নিশ্চিত করতে হবে। এইভাবে প্রকৃতি-বিঘ্নিত পরিস্থিতিতে যতটা সম্ভব আয়ের সংস্থান করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিকল্প ফসলের বীজের ব্যবস্থা করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তথা তাপমাত্রা বাড়ার জন্য বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বাড়ার সুফল প্রথমদিকে কিছুটা পাওয়া যাবে। গাছের বৃদ্ধি বেশি হবে। একইসঙ্গে বাড়বে নাইট্রোজেনের চাহিদা। সেক্ষেত্রে ফসলের জল ও নাইট্রোজেন ব্যবহারের দক্ষতা (Water use efficiency and nitrogen use efficiency) বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেই মতো কৃষিপ্রযুক্তি অবলম্বন করতে হবে। গবেষণা ও উদ্ভাবনের দ্বারা চাষিদের হাতে তুলে দিতে হবে বিকল্প

ফসল, প্রচলিত ফসলের সেই সব জাতগুলো যেগুলো একইসঙ্গে জলাভাব, জল জমে যাওয়া, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্নরকম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুঝতে সক্ষম। সব মিলে চাষির সামনে এই জলবায়ু পরিবর্তনের আবহে একের বেশি সুযোগ ও সমাধানের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে, যাতে ছোট ও প্রান্তিক চাষিরা মেরুদণ্ড সোজা করে প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেন, ফেলতে পারেন স্বস্তির নিঃশ্বাস।

ফসল বৈচিত্রায়ন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি : পরিবর্তিত জলবায়ুতে ফসল, প্রাণীসম্পদ ও মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্রায়ন ঘটাতে হবে। বেছে নিতে হবে সেই সব ফসল ও প্রজাতিগুলো যেগুলো প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বা জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব সইতে পারে এবং কৃষককে হতাশ না করে একটা সন্তোষজনক ফলন দেয়। একক এলাকায় কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাপেক্ষে যত বেশি সম্ভব ফসল উৎপাদন করা যায়, সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এইভাবে কৃষির নিবিড়তা বাড়াতে হবে। তার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোনও একটি ফসল আংশিক বা পুরোটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বছর বা নির্দিষ্ট সময়ের সাপেক্ষে সেই জমি থেকে পাওয়া অন্যান্য ফসলের ফলন কিছুটা হলেও কৃষকের অর্থনীতিতে সচল রাখবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ : মাটি আর জল, এই দুটি হল প্রকৃতির দুই অমূল্য সম্পদ, যার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রযুক্তিগুলোকে (Resource Conserving Technologies) প্রয়োগ করার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এগুলো ফসল উৎপাদনের খরচ কমায়, জল, জ্বালানি ও শ্রমশক্তির সাশ্রয় করে, সঠিক সময়ে ফসল চাষে সহায়তা করে এবং ফলন বাড়ায়। উদাহরণ হিসাবে আমরা শূন্য কর্ষণ (Zero tillage) প্রযুক্তির কথা বলতে পারি, যার সুফল সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে প্রতিষ্ঠিত গম চাষের ক্ষেত্রে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খরিফ ধান, ভুট্টা, পাট, ডালশস্য ও তৈলবীজ চাষেও এই প্রযুক্তি অবলম্বন করা হচ্ছে। এইভাবে চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন তথা শূন্য কর্ষণ প্রযুক্তি প্রয়োগের দ্বারা মাটির মতো মূল্যবান সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ কিছুটা হলেও করা সম্ভব, হ্রাস করা যায় প্রকৃতিতে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন।

জল সংরক্ষণের বিষয়টি এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ। তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টির গতিপ্রকৃতির পরিবর্তনই জলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণকে দুরূহ করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ভূমি রূপায়ণ (Land shaping) প্রযুক্তির কথা। পশ্চিমবঙ্গের একটি ভঙ্গুর কৃষি জলবায়ু অঞ্চল সুন্দরবনের প্রেক্ষিতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রযুক্তিতে চাষের জমির এক-চতুর্থাংশ বা পঞ্চমাংশ জমিতে পুকুর খুঁড়ে সেই মাটি দিয়ে বাকি জমিকে উঁচু করা হয়। তারপরে পুকুরে সঞ্চিত বৃষ্টির জলকে মাছ চাষ এবং খরিফ-পরবর্তী মরশুমে দ্বিতীয় এবং/অথবা তৃতীয় ফসল চাষে জীবনদায়ী সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়। এই প্রযুক্তি কৃষক মহলে পরীক্ষিত সত্য এবং কৃষকরা এর সুফল পেয়েছেন। বলাবাহুল্য, ভূমি রূপায়ণের আগে যে নীচু জমিতে কেবলমাত্র দেশি ধান চাষ করা হত এবং তা অনেক বেশি মিথেন গ্যাস নির্গমন করত, সেই জমিতে প্রযুক্তি প্রয়োগের পরে একের বেশি ফসল চাষ করা সম্ভব, জলমগ্ন জাতের ধানের বদলে বেশি ফলনদায়ী ধানও চাষ করা সম্ভব। আর তা সম্ভব কেবলমাত্র ভূমি রূপায়ণ প্রযুক্তির দ্বারাই। কেবলমাত্র এই প্রযুক্তিটিই নয়, বিভিন্ন কৃষি জলবায়ু অঞ্চলের উপযোগী এরকম অনেক প্রযুক্তি আছে। পুরুলিয়ার রুক্ষ এলাকায় যেমন হাপা করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ বেশ সুফলদায়ী। আসলে কৃষি জলবায়ু অঞ্চলের প্রেক্ষিতে এই সব পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত মডেলগুলোকে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে। সেই সঙ্গে বেছে নিতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের উপযোগী ফসল ও ফসলচক্র। তখনই ঘটবে উপযোগিতাভিত্তিক শস্য বৈচিত্রায়ন।

বিকল্প এলাকার সন্ধান : যে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই লেখায় বারে বারে এসেছে, তা হল বিকল্প ফসলের সন্ধান। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যথারীতি আমরা কৃষি পরিমণ্ডলে দেখতে পাচ্ছি। আর তা প্রশমনের জন্য যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক না কেন, অভিযোজনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে পরিস্থিতির উপযোগী ফসল ও ফসলের জাত নির্বাচনের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবে কিছু কিছু ফসল আছে, যেগুলো নির্দিষ্ট আবহাওয়ার পরিমণ্ডলেই তাদের সর্বোচ্চ গুণ প্রকাশ করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে বাসমতী ধান, চা-এর কথা। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যদি এই সব ফসলের স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষেত্র আর চাষের উপযোগী না থাকে, তখন বিকল্প এলাকার কথা ভাবতে হবে যেখানে এই সব ফসলের অনুকূল আবহাওয়া তথা জলবায়ু বিরাজমান। কারণ এই সব ফসলগুলো যথেষ্টই বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন।

দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োগ : ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখা যায় ছোট ও প্রান্তিক চাষিরা স্বল্প জমিকে নিজেদের জীবনধারণের হাতিয়ার বলে মনে করেন। যুগে যুগে দেখা যায় ভঙ্গুর কৃষি জলবায়ু এলাকার চাষিরা বিভিন্ন দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে (Indigenous Technological Knowledge) অবলম্বন করে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এই সব জ্ঞান কিন্তু ফেলনা নয়। দরকার এগুলোয় সামান্য অদল-বদল, দিতে হবে বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়া। আর তাহলেই এগুলো হয়ে উঠতে পারে নির্দিষ্ট এলাকার উপযোগী আদর্শ প্রযুক্তি। এই লেখায় সুন্দরবন অঞ্চলে ভূমি রূপায়ণের কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গ, এটি দেশজ প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ওপরে আধারিত। পরবর্তীকালে কৃষি প্রযুক্তিবিদেরা প্রযুক্তির পরশ, আর তা হয়ে উঠেছে বাদাবনের পটভূমিতে এক অপরিহার্য প্রযুক্তি। দেশের

বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত যেসব দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান রয়েছে, তা আরও বিকাশের দাবি রাখে।

উন্নত শস্য সুরক্ষা : দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণা করে নানারকম শস্যশত্রুর নিয়ন্ত্রণে সুসংহত ব্যবস্থা আগেই উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন রোগ-পোকা-আগাছার আবির্ভাব, বাড়বাড়ন্ত, ক্ষতির প্রকৃতি ও তীব্রতার ধরন পালটে গিয়েছে। আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রেখে দরকার আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া। সেই সঙ্গে বিভিন্ন উপকারী পোকামাকড় ও অণুজীবের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে, কৃষি বাস্তুতন্ত্রে বৈচিত্র আনতে হবে। তাহলে শস্যশত্রু কখনওই ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারবে না।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস : ভঙ্গুর কৃষি জলবায়ু এলাকা তো বটেই, সর্বত্র আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার এবং সেই সঙ্গে আবহাওয়াভিত্তিক কৃষি পরামর্শ। কৃষকদেরও উচিত আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির দিকে নজর দেওয়া এবং সুপারিশ অনুযায়ী কৃষিপ্রযুক্তি মেনে চলা। এখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কৃষি পরামর্শ দেওয়া হয়। কৃষকেরা ইন্টারনেটের দৌলতে তা হাতের মুঠোয় পেতে পারেন। তাছাড়া অনেক সংস্থা/সংগঠন/কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র মোবাইল ফোনে মেসেজ মারফত আবহাওয়াভিত্তিক কৃষি পরামর্শ পাঠিয়ে থাকে। কৃষকদের উচিত প্রযুক্তিবিদদের পরামর্শ মেনে ব্যবস্থা নেওয়া।

শস্যবিমা ও কৃষি ঋণ : সারা দেশে চালু হয়েছে শস্যবিমা, তবে এখনও তা নির্দিষ্ট এলাকার প্রধান ফসলগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু যখন কৃষি বৈচিত্রায়নের কথা বলা হচ্ছে, তখন অপ্রধান ফসলগুলোকেও শস্যবিমার আওতায় আনা দরকার। সহজ কৃষিঋণের সুযোগ এবং মহাজনি শোষণ থেকে চাষিদের বাঁচানোর একটি উৎকৃষ্ট পন্থা হল কিষাণ ক্রেডিট কার্ড। জলবায়ু পরিবর্তন বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা কৃষকদের ক্ষেত্রে দেখাতে হবে সহানুভূতির মানসিকতা এবং আবার পরের ফসল চাষে নামার জন্য রসদ জোগাতে হবে সহজ শর্তে বা সুদে ঋণ দিয়ে। পথ চলা শুরু হয়েছে, তবে চলতে হবে আরও অনেক পথ। পরিকল্পনাবিদ ও প্রশাসকদের বাস্তব পরিস্থিতির উপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে জাতির মেরুদণ্ড কৃষক কোমরে আরেকটু জোর পান।

শেষ অথবা শুরুর কথা

বাস্তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি প্রসঙ্গে লেখার ক্ষেত্রে শেষ কথা বলে কিছু হয় না। কৃষিতে কয়েকটি সাবেকি পন্থার জন্য আবহাওয়া তথা জলবায়ুর ওপরে যে কুপ্রভাবগুলো পড়ে সেগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সঠিক কৃষিপ্রযুক্তি প্রয়োগের দ্বারা প্রশমন করতে হবে। এটা হল একটা দিক। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তো কেবলমাত্র কৃষি একা দায়ী নয়, শক্তি এবং শিল্পক্ষেত্রের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমনও জরুরি। হঠাৎ করেই সবকিছু অনুকূলে আনা যাবে না। সদর্থক উদ্যোগ নিলে কারণগুলোকে নিঃসন্দেহে কিছুটা প্রশমিত করা যাবে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ঘটনা বন্ধ করা যাবে না। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনের আবহে এর মোকাবিলায় উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং চাষিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই হল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সেরা উপায়। ভারতের মতো উন্নয়নশীল, জনবহুল ও বৈচিত্রময় দেশে এই লক্ষ্যে পথচলা শুরু হয়েছে, চলতে হবে আরও অনেক পথ। এত বড় জনসমষ্টিকে খাদ্যের জোগান দিতে কৃষিকে তো অবশ্যই হতে হবে টেকসই। পরিকল্পনাবিদ, কৃষিবিদ, কৃষক ও কৃষি-বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই পৌঁছানো যাবে সেই লক্ষ্যে।❑

[লেখক শস্য-বিজ্ঞানে ডক্টরেট, কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত লেখেন। পেশাগতভাবে দেড় দশকেরও বেশি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত আছেন।]

উল্লেখপঞ্জি :

FAO 2015. Climate change and food systems : Global assessments and implications for food security and trade. Edited by : Aziz Elbehri. Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2007. Climate Change 2007 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group-I to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Eds : S Solomon, D Qin, M Manning, Z Chen, M Marquis, KB Averyt, M Tignor, HL Miller. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 996 p. available at :

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_wg1_report_the_physical_science_basis.htm

National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi. 2013. Climate Resilient Agriculture in India. Policy paper : 65, p. 20.

Pathak H, Saharawat YS, Gathala M and Ladha JK. 2011. Impact of resource-conserving technologies on productivity and greenhouse gas emission in rice-wheat system. Greenhouse Gas Sci. technol. **1** : 261-277.

Pathak H, Aggarwal PK and Singh SD (Editors). 2012. Climate Change Impact, Adaptation and Mitigation in Agriculture : Methodology for Assessment and Applications. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. pp xix + 302.

Singh, B.P., Dua, V.K., Govindakrishnan, P.M. and Sharma, S. 2013. Impact of climate change on potato, pp. 125-135. In Climate-Resilient Horticulture : Adaptation and Mitigation Strategie. Springer India.

প্রকাশিত হল WBCS SCANNER

WBCS পরীক্ষাটিকে আরো সোজা এবং সহজসাধ্য করে দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতি শুধু আমাদের নিজস্ব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি নয় বরং আমরা সমগ্র অ্যাসপিরেন্টদের প্রতিও দায়বদ্ধ। বিগত ১৭ বছরের প্রিলিমের প্রশ্নপত্রের ওপর গবেষণার ফসল এই বইটি। যারা ১৩০+ উত্তর করেও মেনস্ পরীক্ষার ছাড়পত্র পায় না তাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হল নির্ভুল তথ্যপূর্ণ বইয়ের অভাব এবং নেগেটিভের বোঝা। এইসব সমস্যার কথা বিবেচনা করে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশ করছে 'WBCS SCANNER'। বইটি সম্পাদনা করেছেন **সামিম সরকার**। এতে রয়েছে—

- ☑ ৪০০০+ প্রশ্ন-উত্তর।
- ☑ বিগত ১৭ বছরের প্রিলির প্রশ্নের নির্ভুল সমাধান।
- ☑ বিগত বছরের প্রশ্নের সমস্ত অপশনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এসেছে।
- ☑ প্রতিটি বছরের প্রশ্নের বিষয়ভিত্তিক এবং টপিকভিত্তিক বিশ্লেষণ।
- ☑ কি চাইছে প্রিলিম?
- ☑ নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণের উপায়।
- ☑ মডেল মকটেস্টের সেট।
- ☑ মেনস্-এর প্রশ্নপত্রের সমাধান বাংলা এবং ইংরাজি পত্র সহ ।

For trade enquiry contact: 9830770440

'WBCS SCANNER' বইটির প্রাপ্তিস্থান : কলেজস্ট্রীট- ৯৮৩০৮৩৯১৭২ ● বারাসাত- ৯৮০০৯৪৬৪৯৮ ● উলুবেড়িয়া- ৯০৫১৩৯২২৪০ ● বহরমপুর-৯৪৭৪৫৮২৫৬৯ ● শিলিগুড়ি- ৯৪৭৪৭৬৪৬৩৫ ● আলিপুরদুয়ার-৯৪৩৪৪১২৯২৪ (শ্যামলী বুক ডিপো) ● দার্জিলিং- ৯৮৩২০৪১১২৩

ডিস্ট্রিবিউটরঃ কথা ও কাহিনী; সরস্বতী বুক স্টল ও স্বস্তিক বুক স্টল, কলেজস্ট্রীট

? আপনি কি বার বার মেনস দিয়েও ইন্টারভিউয়ে ডাক পাচ্ছেন না?
আপনি কি বার বার ইন্টারভিউ দিয়েও একটি চাকরিও পাচ্ছেন না?
আপনি কি বার বার ইন্টারভিউ দিয়েও A/B গ্রুপে চাকরি পাচ্ছেন না?

এ সকল সমস্যার সমাধানের জন্য আপনাকে মেনস পরীক্ষাটিকে খুব ভালোভাবে দিতে হবে, তুলে নিতে হবে সর্বোচ্চ নম্বর। কিন্তু ২০১৫ মেনস কম্পালসরিতে যে ধরনের প্রশ্ন এসেছে তাতে খুব ভালো স্কোর তো দূর-অস্ত, ভদ্রস্থ স্কোর করাই দুঃসাধ্য। এমতাবস্থায় নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য সঠিক গেমপ্ল্যান সবার আগে নির্ণয় করতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রশ্ন যতই কঠিন হোক না কেন, কোথাও না কোথাও সেই সব প্রশ্নের যোগসূত্র থাকবেই। সেই যোগসূত্রটিকে খুঁজে বার করতে পারলেই করা যাবে বাজিমাত। কিন্তু এটি খুব একটা সহজ কাজ নয়। যারা নোটসের ওপর নির্ভর করে প্রস্তুতি চালায় বা যাদের বুকসেল্ফে কোয়ালিটি বইয়ের অভাব তাদের বছরের পর বছর ব্যর্থতা তাড়া করে বেড়াবে। মেনসে ভালো পারফর্ম করার জন্য ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের ক্লাশ করা নিতান্তই জরুরি, দরকার ভালো ভালো বই পড়ার আর প্রয়োজন ভালো বন্ধু বান্ধবদের সহচর্য। সেই সঙ্গে দেওয়া চাই উন্নত গুণমানের প্রচুর মকটেস্ট। বিগত দু বছরের মেনসের প্রশ্নগুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রশ্নের ধরনকে বুঝে নিতে হবে। উন্নতমানের বইকে নিয়ে চালাতে হবে মেনসে আগত প্রশ্নের অনুসন্ধান। এরূপ পন্থায় নিষ্ঠা সহকারে গবেষণা চালাতে পারলে বোঝা যাবে প্রশ্নগুলি কোথা থেকে আসছে। এই ভঙ্গীতে মেনসকে অবলোকন করতে পারলে প্রস্তুতিটি পাবে অন্য এক মাত্রা, আসবে সাফল্য। এহেন কঠিন এবং শ্রমসাধ্য কাজটির দায়িত্ব অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। আমরা প্রতিটি মেনস পরীক্ষার্থীকেই ২০১৬-তে চূড়ান্ত লক্ষ্যপূরণের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ।

WBCS-2016 ব্যাচের ক্লাশরুম এবং পোস্টাল কোর্সে ভর্তি চলছে

প্রিলিম-২০১৬ মক টেস্ট

প্রিলি দেওয়ার আগে জেনে নিন আপনার প্রস্তুতিটি ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে। বার বার মকটেস্ট দিয়ে নিশ্চিত করুন সাফল্য।

ADVANCED MAINS BATCH

যারা প্রিলি পাশের ব্যাপারে নিশ্চিত, তাদের জন্য শুরু হচ্ছে 'অ্যাডভান্সড্ মেনস ব্যাচ'। WBCS-2016তেই আপনার প্রথম পছন্দের চাকরিটি পেতে সত্বর যোগদান করুন আমাদের এই বিশেষ ব্যাচে।

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

9830770440
9674478644

Website: www.academicassociation.in . Centre: Uluberia-9051392240 . Barasat-9800946498 . Birati-9674447451 . Berharampur-9775333007

অথ জলবায়ু কথা

জলবায়ু পরিবর্তন—সারা দুনিয়ার কাছে এখন এক মস্ত বড় মাথাব্যথার কারণ। কত মাতামাতি হচ্ছে দেশে-বিদেশে এই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে। আর হবেই বা না কেন? এর সঙ্গে শুধুমাত্র উষ্ণায়নই নয়, জড়িয়ে আছে আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নও। তার ওপর আবার জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে যে সব পন্থা অনুসরণ করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থনীতির উপর তার প্রভাব পড়বে ব্যাপকভাবে। এর তাৎপর্য প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করা গেছে কি? অন্য দিকে, এত হইচইয়ের ফলে আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বজুড়ে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কাজের কাজ বলতে বিশেষ কিছুই হয় নি বলে আক্ষেপ করছেন **অনিন্দ্য ভুক্ত।**

নয় নয় করে হতে চলেছে এই নিয়ে একুশবার।

শিবঠাকুরের আপন দেশে এবার কী হতে চলেছে কে জানে! হয়তো শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না। একুশ পাক ঘুরিয়ে শেষে একুশ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা হবে সমস্যাটিকে, ঠিক যেমন হয়েছে আগের বিশ বার।

তবু, কথায় বলে, আশায় মরে চাষা। সেই আশা নিয়েই আপামর বিশ্ব নভেম্বরের ৩০ তারিখ থেকে ডিসেম্বরের ১১ তারিখ পর্যন্ত তাকিয়ে থাকবে প্যারিসের দিকে। একুশতম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের দিকে।

আদত ঘটনাটি ১৯৯২ সালের। ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো শহরে বসেছিল বসুন্ধরা সম্মেলন। পৃথিবীর পরিবেশকে ক্রমবর্ধমান দূষণের হাত থেকে কীভাবে বাঁচানো যায়, এই ছিল সম্মেলনের বিবেচ্য বিষয়। তবে পরিবেশ নিয়ে মানুষের মাথাব্যথার সূত্রপাত হয়েছিল পৃথিবীর ক্রমাগত উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে, যে বৃদ্ধি লক্ষণীয় হয়ে উঠতে শুরু করে উনিশশো আশির দশক থেকে। লক্ষণীয় হয়ে উঠতে শুরু করে মানে মানুষ পরিষ্কার বুঝতে শুরু করে যে উষ্ণতা বাড়ছে আর তা ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। উষ্ণতার এই বৃদ্ধি কোথায় গিয়ে পৌঁছোতে পারে আর মানুষের জীবনযাত্রার উপর তার ফল কী পড়তে পারে তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণারও সূত্রপাত হয় এই সূত্রে, এই সময় থেকে।

১৯৯২ সালের বসুন্ধরা সম্মেলনে তাই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ঘোরাফেরা করেছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। ফল হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত ১৫৩টি দেশ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি কাঠামোগত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। চুক্তিটি ইউনাইটেড নেশানস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ইউএনএফসিসিসি নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে স্বীকার করে নেওয়া হয় মানুষের নানাবিধ কার্যকলাপের ফল হিসেবে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির সঞ্চয় বাড়ছে, যার ফলে ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ হয়ে উঠছে, জলবায়ুর নানারকম পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে; স্বীকার করে নেওয়া হয় বাতাসে অতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের দায়টি ঐতিহাসিকভাবে বেশি উন্নত দেশগুলির, বলা হয় পরিস্থিতি এই মুহূর্তে যা তাতে সব দেশকে সাধ্যমতো একযোগে কাজ করতে হবে জলবায়ুর সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি সামাল দিতে।

তবে বিশ্ব উষ্ণায়নের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া বা এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মোটামুটিভাবে কী কী করণীয় তা উল্লেখ করা হলেও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ কী হবে সে ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত রিওর সম্মেলন থেকে উঠে আসেনি। পরিবর্তে ঠিক হয় সম্মেলনে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি (চুক্তিতে যাদের পার্টি বা সদস্য বলে উল্লেখ করা হয়) এরপর নিয়মিত আলোচনায় বসে সুনির্দিষ্ট চুক্তি করবে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজনীয় সংশোধনও করবে। তবে সে অর্থে কোনও চুক্তি না হলেও এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয় পরবর্তী সদস্য সম্মেলন (কনফারেন্স অব্ পার্টিস) গুলিতে যেগুলি বিতর্কের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। যেমন, বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের প্রধান দায়টি উন্নত দেশগুলির, একথা বলার পাশাপাশি বলা হয়েছিল বিকাশশীল দেশগুলির মাথাপিছু নিঃসরণের পরিমাণ এখনও বেশ কম এবং আগামী দিনে এই দেশগুলির সামাজিক প্রয়োজন এবং আর্থনীতিক বিকাশের প্রয়োজনে মোট বিশ্ব নিঃসরণে এই দেশগুলির অংশ বাড়বে। এছাড়া বিকাশশীল দেশগুলিকে নিঃসরণ কমানোর জন্য প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দেবার কথাও বলা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামোগত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় জুন মাসে (৫ জুন), আর ডিসেম্বর মাস থেকেই শুরু হয়ে যায় পরবর্তী মিটিংয়ের আলোচ্যসূচি তৈরির কাজ। ইন্টারগভর্নমেন্টাল নেগোসিয়েশন কমিটির সাতটি বৈঠকের পর ১৯৯৫ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামোগত চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি প্রথম সদস্য সম্মেলনে বসে। প্রথম সম্মেলন হয় বার্লিনে। সম্মেলনে দ্বীপরাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত গোষ্ঠী, অ্যালায়েন্স অব স্মল আইল্যান্ড স্টেটস, দাবি তোলে শিল্পোন্নত দেশগুলিকে ২০০০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ ২০ শতাংশ কমাতে হবে। নিঃসরণ কমানোর ব্যাপারে

বিশ্ব উষ্ণায়ন সংক্রান্ত সম্মেলন	
বসুন্ধরা সম্মেলন	রিও দ্য জেনেইরো, ব্রাজিল, ১৯৯২
সদস্য সম্মেলন ১	বার্লিন, জার্মানি, ১৯৯৫
সদস্য সম্মেলন ২	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড, ১৯৯৬
সদস্য সম্মেলন ৩	কিয়োটো, জাপান, ১৯৯৭
সদস্য সম্মেলন ৪	বুয়েনস আর্জেন্টিনা, আয়ার্স, ১৯৯৮
সদস্য সম্মেলন ৫	বন, জার্মানি, ১৯৯৯
সদস্য সম্মেলন ৬	দ্য হেগ, নেদারল্যান্ড, ২০০০
সদস্য সম্মেলন ৬	বন, জার্মানি, ২০০১
সদস্য সম্মেলন ৭	মারাকেশ, মরক্কো, ২০০১
সদস্য সম্মেলন ৮	নিউ দিল্লি, ভারত, ২০০২
সদস্য সম্মেলন ৯	মিলান, ইতালি, ২০০৩
সদস্য সম্মেলন ১০	বুয়েনস আয়ার্স, আর্জেন্টিনা, ২০০৪
সদস্য সম্মেলন ১১	মন্ট্রিল, কানাডা, ২০০৫
সদস্য সম্মেলন ১২	নাইরোবি, কেনিয়া, ২০০৬
সদস্য সম্মেলন ১৩	বালি, ইন্দোনেশিয়া, ২০০৭
সদস্য সম্মেলন ১৪	পোৎসনান, পোল্যান্ড, ২০০৮
সদস্য সম্মেলন ১৫	কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক, ২০০৯
সদস্য সম্মেলন ১৬	কানকুন, মেক্সিকো, ২০১০
সদস্য সম্মেলন ১৭	ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০১১
সদস্য সম্মেলন ১৮	দোহা, কাতার, ২০১২
সদস্য সম্মেলন ১৯	ওয়ারশ, পোল্যান্ড, ২০১৩
সদস্য সম্মেলন ২০	লিমা, পেরু, ২০১৪
সদস্য সম্মেলন ২১	প্যারিস, ফ্রান্স, ২০১৫

শিল্পোন্নত দেশগুলির সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিই ছিল সম্মেলনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। সম্মেলন শুরুও হয়েছিল অত্যন্ত সদর্থক ভঙ্গিতে। কিন্তু এই দাবি শুনেই বেঁকে বসে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া। বলতে শুরু করে, নিঃসরণ কমানোর দায় কেবলমাত্র শিল্পোন্নত দেশগুলিরই নয়, চীন বা ভারতের মতো বৃহৎ বিকাশশীল দেশগুলিও এই কাজে এগিয়ে না এলে পুরো প্রক্রিয়াটিই অর্থহীন হয়ে পড়বে। বলাবাহুল্য বিকাশশীল দেশগুলির তরফে প্রবল প্রতিরোধ নেমে আসে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার এই বক্তব্যে। আলোচনা যখন প্রায় ব্যর্থ হবার উপক্রম তখন ভারত এক বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে। বিকল্প এই প্রস্তাবটিকে বলা হচ্ছিল গ্রিন পেপার।

ভারতের উপস্থাপিত এই গ্রিন পেপার ছিল আসলে অ্যালায়েন্স অব্ স্মল আইল্যান্ড স্টেটস-এর প্রস্তাবটিরই একটি সংশোধিত খসড়া। এই গ্রিন পেপারে ভারত ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলির এই দাবিকে সমর্থন করে যে, নিঃসরণ কমাতে এগিয়ে আসতে হবে শিল্পোন্নত দেশগুলিকেই। তবে ২০০০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ নিঃসরণ কমানোর দাবির পরিবর্তে ভারত প্রস্তাব দেয় শিল্পোন্নত দেশগুলিকে জানাতে হবে ২০০০ সালের পর ঠিক কতটা পরিমাণ নিঃসরণ তারা কমাবে। নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেবার পাশাপাশি সেটিকে আইনগত বাধ্যতা দেওয়ার কথাও বলে ভারত।

ভারতের এই গ্রিন পেপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে জি-৭৭ ভুক্ত দেশগুলি, চীন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নও। কিন্তু এই সংশোধিত খসড়াতেও আপত্তি ছিল আমেরিকার। সঙ্গী ছিল ওইসিডি ভুক্ত দেশগুলি। পুনরায় সম্মেলন ভেস্তে যাবার উপক্রম হলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সবাইকে মনে করিয়ে দেয় যে এরপরে চুক্তি স্বাক্ষরে খুব বেশি দেরি করলে সেই চুক্তি চূড়ান্ত করতে করতেই ২০০০ সাল পেরিয়ে যাবে। এই সতর্কতাবাণীর পরিপ্রেক্ষিতেই সম্মেলন শেষে যে সনদটি প্রকাশ করা হয়, সেটি বার্লিন ম্যানডেট হিসেবে পরিচিত, সেখানে ১৯৯৭ সালের মধ্যে নিঃসরণ হ্রাস সংক্রান্ত একটি সময়সূচি চূড়ান্ত করার কথা বলা হয়। বার্লিন ম্যানডেট আরও দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছিল। এক, কাঠামোগত চুক্তিতে শিল্পোন্নত দেশগুলির জন্য নিঃসরণ হ্রাসের যে কোটা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা যথেষ্ট নয়। ফলে নতুন করে কোটা নির্ধারণ করতে হবে। দুই, বিকাশশীল দেশগুলির নতুন করে কোনও প্রতিশ্রুতি তৈরি করার প্রয়োজন নেই। এই বার্লিন ম্যানডেটকে কেন্দ্র করে আরেক দফা আলোচনা বসে ১৯৯৬ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। অতঃপর ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটা শহরে বসে তৃতীয় সদস্য সম্মেলন।

কিয়োটো চুক্তি

বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক স্তরে যে সমস্ত সম্মেলন হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সফল ও কার্যকর হিসেবে কিয়োটো শহরের তৃতীয় সদস্য সম্মেলনটির উল্লেখ করতে হয়। সম্মেলন শেষে যে চুক্তিটি স্বাক্ষর করে উপস্থিত ১৮৫টি দেশ, সেই চুক্তিটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবার পর তার একটি আইনগত বৈধতা থাকবে বলে ঠিক করা হয়।

কিয়োটো সম্মেলনের শুরুতে আমেরিকা জানিয়ে দেয় ২০১০ সালের মধ্যে তারা নিঃসরণের পরিমাণ ১৯৯০ সালের স্তরে নামিয়ে নিয়ে আসবে। আমেরিকার এই প্রস্তাবে আপত্তি জানায় জি-৭৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং চীন। এদের বক্তব্য ছিল নিঃসরণ কমিয়ে কেবলমাত্র ১৯৯০ সালের স্তরে নিয়ে আসা নয়, কমাতে হবে ১৯৯০ সালের নিঃসরণ স্তরের চেয়েও ১৫ শতাংশ কম। এমন আপত্তি যে আসবে তা সম্ভবত আমেরিকার জানাই ছিল। তাই সে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। কার্বন ব্যবসার প্রস্তাবটি আমেরিকার পক্ষ থেকে আসে এরপরই।

কার্বন ব্যবসার মোদ্দা কথাটি হল, কোনও দেশের ঘাড়ে যে পরিমাণ নিঃসরণ কমানোর

দায় চাপানো হবে সে যদি তার চেয়ে বেশি নিঃসরণ কমাতে পারে তাহলে সে একটি ছাড়পত্র পাবে, যে ছাড়পত্র অনুযায়ী সে বাড়তি যতটুকু নিঃসরণ কমিয়েছে ততটুকু নিঃসরণ করার অধিকার তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এই অধিকারকে বলা হচ্ছে কার্বন অধিকার। এই কার্বন অধিকারকে অতঃপর সংশ্লিষ্ট দেশ নিজেও ব্যবহার করতে পারে অথবা অর্থের বিনিময়ে অন্য কোনও দেশকে বিক্রিও করে দিতে পারে। কার্বন অধিকারের লেনদেনকেই কার্বন ব্যবসা বলা হয়।

আমেরিকা যে কার্বন ব্যবসার কথা তুলেছিল তার কারণ আমেরিকা চাইছিল অর্থের বিনিময়ে নিঃসরণ হ্রাসের দায়ভার নিজের কাঁধ থেকে নামাতে। শেষ পর্যন্ত কার্বন ব্যবসার সুযোগটিকে ১৯৯৭ সালে যখন কিয়োটো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখন কার্বন ব্যবসার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও পরে আমেরিকার দাবি মেনে নেওয়া হয়।

১৯৯২ সালের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামোগত চুক্তিতে সদস্য দেশগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একদিকে রাখা হয়েছিল শিল্পোন্নত দেশগুলিকে, অন্যদিকে বিকাশশীল ও অনুন্নত দেশগুলিকে। এই দেশগুলির তালিকা রাখা হয়েছিল চুক্তির পরিশিষ্ট অংশে। পরিশিষ্ট-১-এ রাখা হয়েছিল ৩৮টি শিল্পোন্নত দেশের একটি তালিকা, যাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল নিঃসরণ হ্রাসের দায়ভার। কিয়োটো চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় তাই এই দেশগুলিকে পরিশিষ্ট-১ দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী এই দেশগুলি ২০০৮-১২ সালের মধ্যে তাদের নির্গমন এমনভাবে কমাবে যাতে কমানোর পর তাদের নির্গমনের মোট পরিমাণ ১৯৯০ সালে তারা যে পরিমাণ নির্গমন করেছিল তার চেয়েও ৫.২ শতাংশ কম হয়। তবে এই সবকটি দেশকে সম-পরিমাণে নিঃসরণ কমানোর কথা চুক্তিতে বলা হয়নি। ৫.২ শতাংশের হিসাবটি একটি গড় হিসাব। বাস্তবে কারও ঘাড়ে বেশি, কারও ঘাড়ে কম বোঝা চাপানো হয়। কোনও কোনও পরিশিষ্ট ১ দেশকে আবার নিঃসরণ কমানোর দায় থেকে পুরোপুরি নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, অধিকাংশ ইউরোপিয়ান দেশগুলির জন্য ধার্য হারটি ছিল ৮ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ৭ শতাংশ। আবার নিউজিল্যান্ডকে যেমন নিঃসরণ কমানোর দায় থেকে পুরোপুরি নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছিল তেমনি অস্ট্রেলিয়াকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত নিঃসরণ বাড়ানোর অধিকার দেওয়া হয়েছিল। পরিশিষ্ট-১-তালিকাভুক্ত ব্যতিরেকে অন্যান্য বিকাশশীল ও অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়মটি ছিল, এরা যেহেতু উন্নতির চেষ্টা করছে সেহেতু এদের এখনই নিঃসরণ কমানোর কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে হবে না, বরং উন্নতির প্রয়োজনে এরা নির্গমন কিছুটা বাড়ালেও বাড়াতে পারে।

কিয়োটো চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ই ঠিক করা হয়েছিল এই চুক্তিকে আইনগত বৈধতা দেওয়া হবে। এ কারণেই একই সঙ্গে এটাও ঠিক করা হয়েছিল সম্মেলন শেষে যাঁরা চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন তাঁদের পরবর্তীকালে নিজেদের আইনসভায় সেটিকে অনুমোদন করাতে হবে। প্রাথমিকভাবে আরও ঠিক হয়েছিল স্বাক্ষরকারী দেশের অন্তত ৫৫ শতাংশ দেশের আইনসভা অনুমোদন দেবার ৯০ দিন পর থেকে চুক্তিটি আইনগত বৈধতা অর্জন করবে। তবে চুক্তিটি কার্যকর ঘোষণা করার প্রশ্নে দ্বিতীয় আরেকটি শর্তও রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় এই শর্তানুযায়ী, প্রাথমিক স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে যে কোনও ৫৫ শতাংশ দেশের অনুমোদন পেলেই চুক্তিটি কার্যকর করা যাবে না। চুক্তি কার্যকর করে তোলার জন্য এমন ৫৫ শতাংশ দেশের অনুমোদন চাই যাদের সম্মিলিত নিঃসরণের

নিঃসরণের আরোপিত পরিমাণ : কার কতটা

দেশ	১৯৯০ সালের তুলনায় কত শতাংশ নিঃসরণ করা যাবে	দেশ	১৯৯০ সালের তুলনায় কত শতাংশ নিঃসরণ করা যাবে
অস্ট্রেলিয়া	১০৮	ইতালি	৯২
অস্ট্রিয়া	৯২	জাপান	৯৪
বেলারুশ	৯৫	লাতাভিয়া	৯২
বেলজিয়াম	৯২	লিচটেনস্টাইন	৯২
বুলগেরিয়া	৯২	লিথুয়ানিয়া	৯২
কানাডা	৯৪	লুক্সেমবার্গ	৯২
ক্রোয়েশিয়া	৯৫	মোনাকো	৯২
চেক প্রজাতন্ত্র	৯২	নেদারল্যান্ড	৯২
ডেনমার্ক	৯২	নিউজিল্যান্ড	১০০
ইস্তোনিয়া	৯২	নরওয়ে	১০১
		পোল্যান্ড	৯৪
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	৯২	পর্তুগাল	৯২
ফিনল্যান্ড	৯২	রোমানিয়া	৯২
ফ্রান্স	৯২	রাশিয়ান	
জার্মানি	৯২	ফেডারেশন	১০০
গ্রিস	৯২	স্লোভাকিয়া	৯২
হাঙ্গেরি	৯৪	স্লোভানিয়া	৯২
আইসল্যান্ড	১১০	স্পেন	৯২
আয়ারল্যান্ড	৯২	সুইডেন	৯২
সুইজারল্যান্ড	৯২	গ্রেট ব্রিটেন	৯২
ইউক্রেন	১০০	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৯৩

কিয়োটো চুক্তিতে এই নিঃসরণ কোটা নির্ধারণ করা হয়েছিল ছয়টি গ্যাসের জন্য। এই ছয়টি গ্যাস হল—কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, সালফার হেক্সাফ্লোরাইড, পারফ্লুরোকার্বন, হাইড্রোফ্লুরোকার্বন ও নাইট্রাস অক্সাইড।

কার্বন ব্যবসা

বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা সমতুল্য কোনও *গ্রিনহাউস গ্যাস* নিঃসরণ করতে পারার অধিকার সংবলিত ছাড়পত্র নিয়ে বাণিজ্য। এই ধারণাটির আবির্ভাব *কিয়োটো চুক্তি*-তে। কিয়োটো চুক্তিতে নির্বাচিত (পরিশিষ্ট ১ তালিকাভুক্ত) কিছু দেশকে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের প্রধান আসামি হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ঘাড়ে নিঃসরণ কমানোর দায়টি চাপানো হয়েছিল এবং কাকে কতটা নিঃসরণ কমাতে হবে তার কোটাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে কোনও দেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজের দেশে নিঃসরণ কমিয়ে তার কোটা পূরণ করতে না পারলে কার্বন ব্যবসার মাধ্যমেও তা করতে পারে বলে ঠিক করা হয়েছিল। যেহেতু এমন একটি ধারণার মাধ্যমে চুক্তিকে কিছুটা নমনীয় করে তোলা হয়েছিল সেহেতু কার্বন ব্যবসা সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলিকে নমনীয়তার কৌশল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এই চুক্তিতে। নমনীয়তার কৌশল সংক্রান্ত তিনটি ধারা চুক্তিতে রয়েছে যেখানে কার্বন ব্যবসার তিনটি প্রকরণের উল্লেখ আছে।

কার্বন ব্যবসার পিছনে মূল ধারণাটি এই রকম। পরিশিষ্ট ১ তালিকাভুক্ত কোনও দেশ তার কোটামাফিক নিঃসরণ কমাতে না পারলে অন্য কোনও দেশ যদি তার হয়ে সেই ঘাটতিটুকু মিটিয়ে দেয় তাহলেও চলবে। এখন দু'ভাবে এই ঘটনা ঘটতে পারে। প্রথমত, পরিশিষ্ট ১ তালিকাভুক্ত কোনও দেশ তার কোটার অতিরিক্ত নিঃসরণ কমিয়ে কিছু কার্বন অধিকার রোজগার করতে পারে এবং সেই অর্জিত কার্বন অধিকার ঘাটতি আছে যে দেশের তার কাছে বিক্রি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, নিজের দেশে নিঃসরণ যে কমাতে পারল না সে দ্বিতীয় কোনও দেশে কার্বন সাশ্রয়কারী কোনও প্রকল্পে লগ্নি করে সে দেশের নিঃসরণের পরিমাণ কমাতে পারে।

কার্বন ব্যবসার প্রথম যে পদ্ধতি সেখানে নিঃসরণ কমাতে ব্যর্থ দেশটি কিন্তু কোনওভাবেই নিঃসরণ কমানোর দায় নিচ্ছে না। সে যেটা করছে, অর্থের বিনিময়ে কোটার অতিরিক্ত নিঃসরণের অধিকারটুকু কিনে নিচ্ছে। কার্বন ব্যবসার এই প্রকরণটি পরিচিত *নিঃসরণ বাণিজ্য* হিসেবে। অন্যদিকে কার্বন ব্যবসার দ্বিতীয় প্রকরণ অনুযায়ী ব্যর্থ দেশটি নিজের দেশে না পারলেও অন্য দেশে নিঃসরণ কমানোর চেষ্টা করছে। এই প্রকরণটি পরিচিত *ক্ষতিপূরণার্থ বাণিজ্য* হিসেবে। এই ক্ষতিপূরণার্থ বাণিজ্য আবার দু'ধরনের হতে পারে। দেশটি যদি পরিশিষ্ট ১ তালিকাভুক্ত দ্বিতীয় আরেকটি দেশে ক্ষতিপূরণের জন্য বিনিয়োগ করে তবে তাকে বলা হবে *যৌথ রূপায়ণ কৌশল,* আর বিনিয়োগ যদি কোনও বিকাশশীল দেশের প্রকল্পে করা হয় তাকে বলা হবে *পরিচ্ছন্ন বিকাশ কৌশল*।

পরিমাণ, ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী মোট নিঃসরণের অন্তত ৫৫ শতাংশ ছিল। দ্বিতীয় এই শর্তের কারণেই ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরের পরও কিয়োটো চুক্তি কার্যকর হতে সময় লেগে যায় দীর্ঘ সাত বছর। এর কারণ ১৯৯০ সালে মোট নিঃসরণের ৩৬ শতাংশের জন্য দায়ী ছিল যে দেশটি, সেই আমেরিকা ২০০১ সালে চুক্তি থেকে সই প্রত্যাহার করে নেয়। আমেরিকা চুক্তি থেকে সরে যাবার পর চুক্তির ভবিষ্যৎ পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল রাশিয়ার ওপর, কারণ ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী রাশিয়াই ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম নিঃসরণকারী দেশ। ২০০৪ সালের শেষের দিকে রাশিয়া চুক্তি অনুমোদন করলে ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কিয়োটো চুক্তি আইনগত বৈধতা অর্জন করে।

কিয়োটো চুক্তিতে আমেরিকা প্রাথমিকভাবে সই করলেও তার ভাবগতিক সুবিধের ছিল না। ইতিমধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বিদায় নিয়েছেন বিল ক্লিন্টন। নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন জর্জ বুশ, যিনি নিজে বিশ্ব উষ্ণায়নের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না শুধু নয়, যার ওপর নিরন্তর চাপ আসছে সই প্রত্যাহারের। ফলে ১৯৯৭ সালের তৃতীয় সদস্য সম্মেলনের পরও উদ্যোগ অব্যাহত ছিল আমেরিকাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানোর। ২০০০ সালের ষষ্ঠ সদস্য সম্মেলনেও দেখা গিয়েছিল সেই একই স্থিতাবস্থার ছবি। আমেরিকার একটিই মাত্র বক্তব্য। নিঃসরণ হ্রাসের দায় যদি তাদের ঘাড়ে চাপানো হয় তাহলে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না ভারত বা চীনের মতো বিকাশশীল দেশগুলিকে। এমনতরো বক্তব্যের পিছনে যে যুক্তি তা হল নিঃসরণ কমানোর যে খরচ তা যদি শুধু আমেরিকান শিল্পগুলিকে বইতে হয় তাহলে তারা বিশ্ববাজারে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে এই বক্তব্য খুব গ্রহণযোগ্য মনে হলেও যে কথাটি আমেরিকা অস্বীকার করতে চাইছিল তা হল চীন বা ভারতের নিঃসরণের পরিমাণ আমেরিকার তুলনায় অনেকটাই কম, নগণ্য বলা চলে। তবে যুক্তি, পালটা যুক্তি যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত নিজের বক্তব্যকে আঁকড়ে রেখে ২০০১ সালে আমেরিকা চুক্তি থেকে সরে যায়।

এবং তারপর...

আমেরিকা সরে গেলেও ২০০৫ সালে কিয়োটো চুক্তি কার্যকর করা গিয়েছিল রাশিয়ার সহযোগিতায়। কিন্তু কিয়োটো চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০১২ সাল পর্যন্ত। মেয়াদ শেষের পরও কেটে গেছে তিনটে বছর। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঠিক করে ওঠা যায়নি, কী হবে পরবর্তী পদক্ষেপ। অথচ ২০০৭ সালে বালিতে যে ত্রয়োদশ সদস্য সম্মেলন বসেছিল সেখান থেকেই এই বিষয়টিই মূল আলোচ্য হয়ে ওঠে, কী হবে পরবর্তী কর্মসূচি।

বালি সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘ লক্ষ্য স্থির করেছিল তিনটি। এক, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কীভাবে আরও কমানো যায় তা নিয়ে নতুন আরেক দফা আলোচনার সূত্রপাত করা। দুই, সেই আলোচনার একটি নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি ঠিক করা। তিন, নতুন আলোচনা পরিসমাপ্তির একটি সময়সীমা ঠিক করা।

বালি সম্মেলনকে কার্যত ভেস্তেই দিচ্ছিল আমেরিকা, যেমন দিতে চেয়েছিল কিয়োটো প্রোটোকলকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমেরিকার সেই উদ্যোগ বানচাল হয়ে যায় ছোট্ট একটি

দেশ পাপুয়া নিউ গিনির প্রতিরোধে। নিজের বক্তব্য রাখতে উঠে সেই ছোট্ট দেশের প্রতিনিধি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, হয় আমেরিকা সবার মতে মত মেলাক অথবা সম্মেলন ছেড়ে চলে যাক। শেষপর্যন্ত এই অপ্রত্যাশিত, চরম অপমানজনক আঘাতেই আমেরিকা তার মত বদল করে।

অতঃপর বালি সম্মেলন শেষে যে দলিল প্রকাশ করা হয় সেখানে মূলত তিনটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়। এক, কিয়োটো চুক্তির মেয়াদপূর্তির পর কী হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হবে ২০০৮ সালের চতুর্দশ সম্মেলন থেকে। সেখানেই তৈরি হবে চূড়ান্ত চুক্তির একটি খসড়া। দুই, ২০০৮ সালে যে খসড়া তৈরি করা হবে তাতে থাকবে চারটি বিষয়—নির্গমন হ্রাস, অভিযোজন, প্রযুক্তি এবং লগ্নি। নির্গমন হ্রাস বলতে বর্তমানে যে পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হচ্ছে তাকে কীভাবে কমানো যাবে, অভিযোজন বলতে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির অতিরিক্ত নিঃসরণের ফলে জলবায়ুর যে সমস্ত পরিবর্তন হচ্ছে সেগুলির সঙ্গে কীভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া যাবে, প্রযুক্তি বলতে কীভাবে বিকল্প প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে নির্গমনের মাত্রাকে কমানো যাবে এবং লগ্নি বলতে কীভাবে ব্যয়সাপেক্ষ বিকল্প প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় লগ্নি জোগাড় করা যাবে। বালি সম্মেলনের তৃতীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া এই চুক্তিকে চূড়ান্ত করা হবে ২০০৯ সালের কোপেনহেগেন সম্মেলনে।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধে যে আশার বাণী শুনিয়েছিল বালি সম্মেলনের দলিল, বালি রোডম্যাপ, সে আশার গুড়ে বালি ঢেলে দেয় পরবর্তী সম্মেলনে। আলোচনার গিঁট আটকে যায় সেই পুরোনো গেরোতেই—নিঃসরণ কমানোর প্রধান দায়ভাগটি কার, কে বহন করবে সেটি, উন্নত বিশ্ব নাকি অনুন্নত বিশ্ব? বিকাশশীল দেশগুলির বক্তব্য, এতদিন ধরে উন্নত দেশগুলি বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস জমা করে এসেছে; সুতরাং বর্তমান উষ্ণায়নের দায়টি ঐতিহাসিকভাবে উন্নত বিশ্বের। উন্নত বিশ্বকেই অতএব নিঃসরণ কমানোর বোঝাটি বইতে হবে। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বের ধুয়োও সেই একই। অতীতে তারা বেশি নিঃসরণ করেছে একথা সত্যি হলেও পাশাপাশি একথাও সত্যি যে বর্তমানে সেই একই পাপ করে চলেছে বিকাশশীল দুনিয়া। সুতরাং নিঃসরণ কমানোর দায়ভাগ সমানভাবে নিতে হবে তাদের। পালটা যুক্তিতে বিকাশশীল দেশগুলি বলে, একদিন উন্নত বিশ্ব যন্ত্রনির্ভর উন্নতি করতে গিয়ে বায়ুমণ্ডল দূষিত করেছে। আজ যদি দূষণের অজুহাতে সেই উন্নতির রাস্তায় তাদের হাঁটতে না দেওয়া হয় তাহলে বিশ্ব অর্থনীতি অসম বিকাশের শিকার হয়ে পড়বে।

এই পারস্পরিক চাপান-উতোরে ২০০৮ সালের পোৎসনান সম্মেলন ভেস্তে দেবার পর কৌশলী দানটি ফেলে আমেরিকা ২০০৯ সালের কোপেনহেগেন সম্মেলনের অব্যবহিত আগে। সম্মেলন শুরুর আগেই আমেরিকা তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে জানিয়ে দিতে শুরু করে তারা কে, কীভাবে, কতটা নিঃসরণ কমাতে প্রস্তুত।

১৯৯২ সালে ইউ এন এফ সি সি-র প্রথম বৈঠক থেকেই একটা বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছোনোর চেষ্টা চলছিল যে কার্বন-নিঃসরণ কমানোর প্রশ্নে বিভিন্ন দেশের দায়িত্ব মোটামুটিভাবে একইরকম হলেও দায়িত্বের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবে। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের দায়টি ঐতিহাসিকভাবে যাদের বেশি তাদের ঘাড়ে দায়িত্ব থাকবে বেশি, অন্যদের ঘাড়ে কম।

এই যে নীতি, এটিকে বলা হচ্ছিল 'সাধারণ, কিন্তু পার্থক্যমূলক দায়িত্বশীলতা'-র নীতি। এই নীতির বিষয়ে প্রায় সব দেশই মোটামুটিভাবে সহমত পোষণ করলেও আমেরিকা ও তার কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গের এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল। প্রথম থেকেই ছিল। তাই ১৯৯৭ সালের কিয়োটো চুক্তিতে এই নীতিকেই আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হলে আমেরিকা শেষ পর্যন্ত চুক্তি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়।

সেই আমেরিকা যখন কোপেনহেগেন বৈঠকের আগে স্বেচ্ছায় নিঃসরণ কমানোর

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলিকে প্রতিরোধ করতে এবং ইতিমধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য যে বাড়তি খরচের প্রয়োজন সেই ব্যয়ভার মেটানোর জন্য গঠিত একটি তহবিল। জলবায়ুর যে বর্তমান পরিবর্তনগুলি ঘটছে তার মূল কারণ বিশ্ব উষ্ণায়ন, যা কিনা আবার বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস সঞ্চয়ের ফসল। জলবায়ু পরিবর্তনের এইসব কারণ প্রতিরোধ করার জন্য তাই দুটি জিনিস দরকার। এক, বর্তমান উৎপাদন প্রযুক্তিকেই এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ যথাসম্ভব কমানো যায়। দুই, বিকল্প কোনও প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের কোনও সম্ভাবনাই না থাকে। কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্রেই দরকার উন্নততর প্রযুক্তি, যা ব্যয়সাপেক্ষ এবং সাধারণভাবে যা উন্নত কিছু দেশেরই করায়ত্ত। বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাই উন্নত দেশগুলির দাবি ছিল প্রয়োজনীয় অর্থের। এই দাবিকে মান্যতা দিতেই ইউএনএফসিসিসি-র ২০০৯ সালের সম্মেলনে এমন একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাব ওঠে, ২০১০ সালে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় এবং ২০১১ সালে তহবিল গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত খসড়া তৈরি করা হয়। ২০১১ সালের ডারবানের সম্মেলনে এই ফান্ডের একটি ২৪ সদস্যের পরিচালন পর্ষদও গঠন করা হয়। ফান্ডের সদর দফতর হিসাবে নির্বাচন করা হয় দক্ষিণ কোরিয়ার সংডো জেলার ইনচিওন-এ। ফান্ডের লক্ষ্য ২০২০ সালে পৌঁছে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির জন্য প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার লগ্নির বন্দোবস্ত করা। ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী এই তহবিলের আয়তন মাত্র ১০ বিলিয়ন ডলার।

প্রতিশ্রুতি দিল তখনই কেউ কেউ তার মধ্যে সিঁদুরে মেঘ দেখেছিলেন। কেউ কেউ আবার এটিকে শুভ ইঙ্গিত ভেবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলন শেষে যখন প্রকাশ করা হল ক্ষীণতনু কোপেনহেগেন অ্যাকর্ডটি তখন আশা নয়, সত্যি হয়ে উঠল আশঙ্কাটিই। অবস্থান বদলে ফেলেছে আমেরিকা। মেনে নিয়েছে 'সাধারণ, কিন্তু পার্থক্যমূলক দায়িত্বশীলতার নীতি'টি, কিন্তু এমন সুকৌশলে যাতে আখেরে তাদের কোনও অসুবিধা না হয়। কোপেনহেগেন অ্যাকর্ড অনুযায়ী কোনও দেশের ঘাড়ে আগে থেকে কোনও নিঃসরণ কোটা চাপিয়ে দেওয়া হবে না, বরং সংশ্লিষ্ট দেশটি নিজের দেশে আইন প্রণয়ন করে জানিয়ে দেবে বাৎসরিক ভিত্তিতে কতটা নিঃসরণ তারা কমাবে। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটিই আর বাধ্যতামূলক থাকছে না, হয়ে যাচ্ছে স্বেচ্ছামূলক।

কোপেনহেগেনের পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। ২০১১ সালের ডারবান সম্মেলনে বা ২০১৩ সালের ওয়ারশ সম্মেলনে কী করতে হবে, কবের মধ্যে করতে হবে—এই সবের লম্বা ফর্দও তৈরি হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ যেটা, একটা চুক্তি স্বাক্ষর, যে চুক্তির আইনগত বৈধতা থাকবে, সেটা হয়নি। ব্যর্থতার এই বারমাস্যাকে সঙ্গী করেই শিয়রে এসে হাজির প্যারিস সম্মেলন।

এবং তারপর...

প্যারিস সম্মেলন পাখির চোখ করেছে তাই সেই অধরা লক্ষ্যটিকেই—এমন একটি চুক্তি স্বাক্ষর, যে চুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে আন্তর্জাতিক আইনগত বাধ্যবাধকতা। বলা হচ্ছে তাই, এই বারের সম্মেলন আগেরগুলির থেকে আলাদা, অনন্য। কিন্তু লক্ষ্য অনন্য বললেই তো আর চিঁড়ে ভিজবে না, সেই লক্ষ্য সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজন আনুষঙ্গিক প্রস্তুতিগুলিকে সুসম্পন্ন করা। যেমন বিকাশশীল দেশগুলি এই আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে যেতে রাজি হবে একমাত্র তখনই, যখন নিঃসরণ হ্রাসের জন্য বিকল্প প্রযুক্তির বন্দোবস্ত তাদের জন্য করা হবে, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটি বন্দোবস্ত করা হবে। বাস্তব এই পরিস্থিতি অনুধাবন করেই প্যারিস সম্মেলনের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষ্যটিকে স্থির করা হয়েছে। প্যারিস সম্মেলনের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষ্য হল বিকাশশীল দেশগুলির এই কাজে সহায়তা দেবার জন্য ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর, সরকারি এবং বেসরকারি সূত্র থেকে, ১০০ বিলিয়ন ডলারের বন্দোবস্ত করা। এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকাটি পালন করবে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড। যে ফান্ডটি ২০০৯ সালের কোপেনহেগেন সম্মেলনে গঠনই করা হয়েছিল বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিকাশশীল দেশগুলিকে সাহায্য করার জন্য। ২০০৯ সালের সম্মেলনে এইরকম একটি ফান্ড গঠনের প্রাথমিক মূলধন হিসেবে ৩০ বিলিয়ন ডলার দিতে সম্মত হয়েছিল উন্নত দেশগুলি, যদিও এখনও পর্যন্ত এই তহবিলের মূলধনের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন ডলারের মতো।

উদ্দেশ্য তো হল, লাখ টাকার প্রশ্নটি এইবার—এই সম্মেলন সফল হবার সম্ভাবনা কতটা মনে হয়? উত্তর হল, ঠিক ততটা যতটা প্রতিটি এপিসোড শেষে মনে হয় একটি মেগা সিরিয়ালের সমাপ্তি সম্বন্ধে। কেন মনে হচ্ছে তার একটা আভাস দেওয়া যেতে পারে। আভাস এক, এই সম্মেলনে কোনও বড় মাপের রাষ্ট্রনেতার হাজির থাকার কোনও কর্মসূচি এখনও পর্যন্ত নেই। এত বড় একটা চুক্তি নাকি হতে যাচ্ছে, যে চুক্তির জন্য সারা দুনিয়া পঁচিশ বছর অপেক্ষা করে আছে, যে চুক্তি স্বাক্ষরে প্রধান ভূমিকা নিতে পারলে বিশ্ব রাজনীতির সর্বকালীন সেরাদের তালিকায় হেঁটে হেঁটে ঢুকে পড়া যাবে, সেই চুক্তি স্বাক্ষরের মেগা ইভেন্টে কোনও বড় মাপের নেতা নেই?

আভাস দুই, সেই যে কোপেনহেগেন সম্মেলনে আমেরিকা বায়না ধরেছিল নিঃসরণ হ্রাসের দায় কে কতটা নেবে তার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট দেশকেই ঠিক করতে দিতে হবে, শেষ পর্যন্ত সেই বায়নাই সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে এখনও পর্যন্ত যা ঠিক আছে তাতে সম্মেলন শুরুর আগেই বিভিন্ন দেশ জানিয়ে দেবে নিজেদের জন্য তারা কী লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। সম্মেলনের সাফল্য প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এই স্বেচ্ছামূলক নিঃসরণ কোটা ঘোষণার পদ্ধতিটিকে ঘিরেই। এক তো এই যে এখনও পর্যন্ত সব দেশ তাদের লক্ষ্যমাত্রা জানায়নি। দ্বিতীয়ত, কিয়োটো প্রোটোকলে নিঃসরণ কোটা ধার্য করে দেবার পর সেটিকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে সেসব কেউ বিশেষ পাত্তা দেয়নি। এবারে নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্য ঠিক করার পর সেটা কতটা মানার চেষ্টা করবে? ❑

[লেখক অর্থনীতির অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক।]

তথ্যসূত্র :

- ☐ গ্লোবাল ওয়ার্মিং (পারুল প্রকাশনী)।
- ☐ পরিবেশ অভিধান (প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স)।

উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্ব এবং উষ্ণায়ন

পরিবেশ রক্ষায় চাই যৌথ প্রয়াস

একদিকে উন্নত দেশগুলোকে উন্নয়নশীল দেশগুলো ভূমণ্ডলীয় উষ্ণায়নের জন্য দায়ী করছে আর অন্যদিকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও ক্ষতিকারক অভিমুখের দায় উন্নত দেশগুলো চাপাচ্ছে বিকাশশীল অর্থনীতিগুলোর ওপর। এই ধনী বনাম দরিদ্রের লড়াই যতদিন চলবে, ততদিন জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ সংক্রান্ত সদর্থক পদক্ষেপগুলো থমকে থাকবে। আলোচনা করছেন **দেবজ্যোতি চন্দ** ও **অমর্ত্য সাহা**।

সারা বিশ্বের মানুষ এখন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে চলা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন—যার পোশাকি নাম 'কনফারেন্স অব পার্টিস (COP) টু দ্য ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC)'-এর দিকে তাকিয়ে। ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেরিওতে বসুন্ধরা সম্মেলন হয় তাতে এই অস্থায়ী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হল বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাপ এক গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ধরে রাখা।

২০১১ সালে ডারবানে ১৭তম জলবায়ু সম্মেলনে ডিসেম্বর ২০১৫-র সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় যার মধ্যে বিশ্বের সব দেশ এক অবশ্য মান্য (লিগালি বাইন্ডিং) চুক্তিতে আবদ্ধ হবে যার দ্বারা বাতাসে কার্বন নির্গমনের পরিমাপ স্থির হবে যাতে বিশ্বের উষ্ণায়নের পরিমাপ শিল্পায়ন পূর্ববর্তী সময়ের থেকে ১.৫°C-২°C বেশি না বাড়ে।

২০৫০ পরবর্তী সময়ে সমগ্র মানব জাতি এবং বিশ্বের ভবিষ্যৎ ও জলবায়ু সংক্রান্ত উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে চলা নিরন্তর বিবাদ আর তামাম বিশ্বের সুশীল সমাজ ও অসরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত জলবায়ু সংক্রান্ত আন্দোলন কোন পথে চলবে তা স্থির করবে এই প্যারিস সম্মেলন।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বিবাদ

প্যারিস সম্মেলনে চুক্তি যা-ই হোক নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা (ইক্যুইটি) হতে হবে তার মূল ভিত্তি। আবহমানকাল ধরে উন্নত বিশ্ব সৃষ্টির যাবতীয় সম্পদের ব্যবহার ও অতিব্যবহার করে জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের দূষণ ঘটিয়ে বর্তমানের আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। অথচ তারাই বহুজাতিক মঞ্চে বারবার জোটবদ্ধভাবে অনুন্নত দেশগুলিকে টেঁকসই বা 'সহনমাত্রাবদ্ধ উন্নয়ন' (সাস্টেনেবেল ডেভেলপমেন্ট)-এর পাঠ দিচ্ছে। তার ফলেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বাড়ছে দ্বৈরথ।

সমাধানসূত্র হিসাবে তাই UNFCCC-র ধারা ৩.১-এ বলা হয়েছে 'কমন বাট ডিফারেনশিয়াল রেসপনসিবিলিটি' (CBDR) ও 'রেসপেক্টিভ কেপেবিলিটিজ'-এর কথা। অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলির ঐতিহাসিক কর্মধারা ও বর্তমান ক্ষমতা তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাপ স্থির করার সূত্র হিসেবে সাহায্য করবে।

বিগত ২২ বছর ধরে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যে আলোচনা চলছে সেই বিপদ থেকে বাঁচতে কিয়োটো প্রোটোকল ২০০৫-এ পথ দেখানো হয়েছিল। প্রোটোকল অনুযায়ী বিশ্বের দেশগুলিকে পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-১ বহির্ভূত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট-১-এ আছে উন্নত দেশগুলি যাদের ১৯৯০-এর পরিমাপ অনুযায়ী কার্বন নির্গমনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে। এটিকে বলা হয়েছে 'পলিউটার পেস প্রিন্সিপাল'। যে দেশগুলি মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দী—অর্থাৎ শিল্পায়ন শুরুর সময় থেকে

প্রত্যক্ষ পরিমাপ : ২০০৫ থেকে বর্তমান
তথ্যের সূত্র : মাসিক পরিমাপ (গড় ঋতুচক্র ব্যতীত)
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এনওএএ

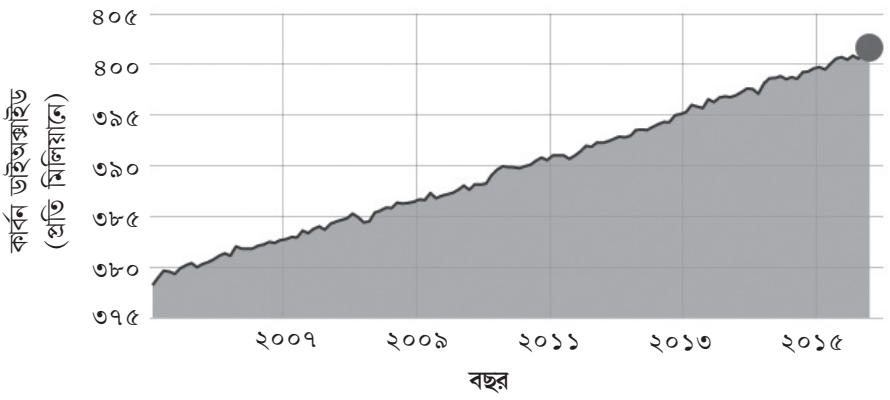

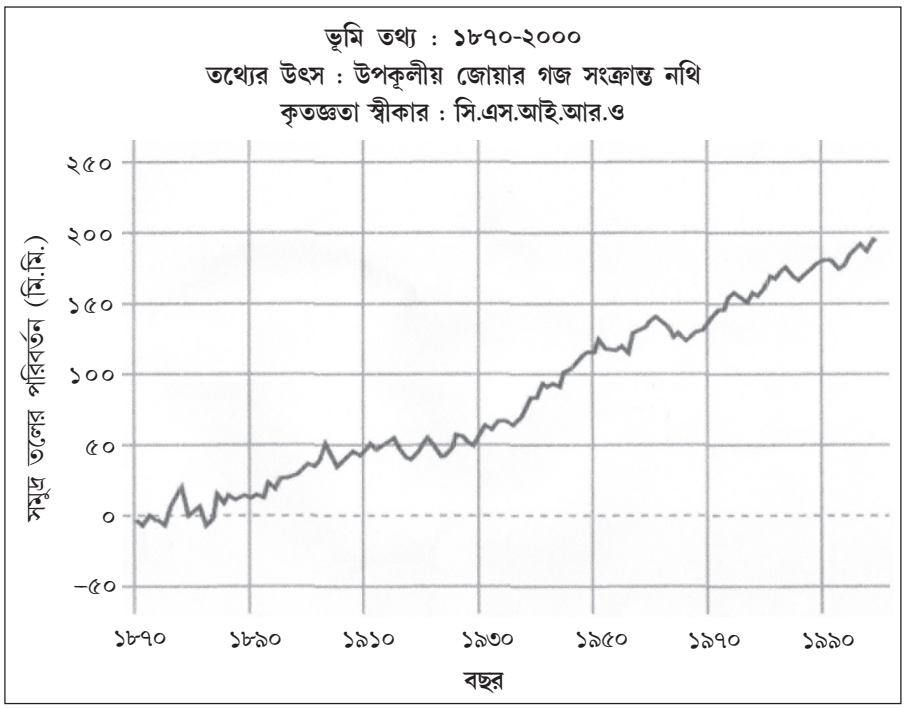

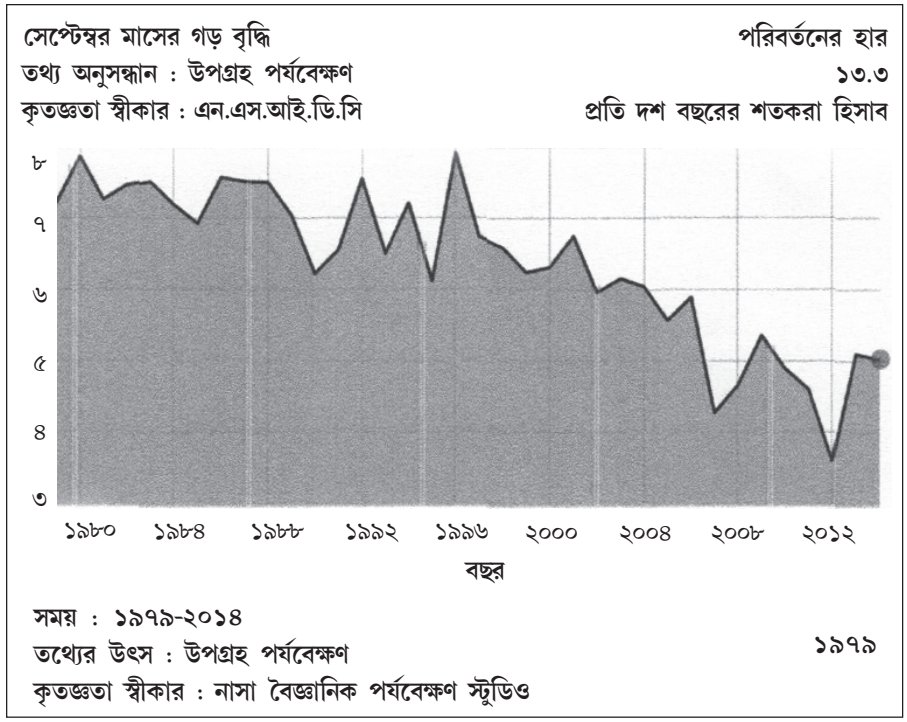

ভূমি তথ্য : ১৮৭০-২০০০
তথ্যের উৎস : উপকূলীয় জোয়ার গজ সংক্রান্ত নথি
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সি.এস.আই.আর.ও

সেপ্টেম্বর মাসের গড় বৃদ্ধি — পরিবর্তনের হার
তথ্য অনুসন্ধান : উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ — ১৩.৩
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এন.এস.আই.ডি.সি — প্রতি দশ বছরের শতকরা হিসাব

সময় : ১৯৭৯-২০১৪
তথ্যের উৎস : উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ — ১৯৭৯
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : নাসা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ স্টুডিও

যে পরিমাণ কার্বন নির্গমন করেছে তা বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে জমা কার্বনের ৭০ শতাংশ। যা আজকের জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণায়নের জন্য দায়ী। তাই তাদের উপর চেপেছে কার্বন নির্গমন কমানোর নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দায়ভার।

পরিশিষ্ট-১ বহির্ভূত দেশের মধ্যে আছে উন্নয়নশীল দেশের সারি—যেখানে বাস করে বিশ্বের ৮০ শতাংশ মানুষ। তাদের জন্য সংগত কারণেই কোনও লক্ষ্যমাত্রা নেই। আর এই নিয়েই বেঁধেছে বিবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশ চাইছে ভারত ও চীনের মতো 'উদীয়মান অর্থনীতি'-র উপর লক্ষ্যমাত্রা চাপানো হোক। আর সেই উদ্দেশ্যে চাপ তৈরি করার জন্য তারা অনেকেই কিয়োটো প্রোটোকল থেকে বেরিয়ে আসে। অথচ এই সেদিনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ কার্বন নির্গমনকারী দেশ!

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন—কী ও কেন?

পরিবেশের দূষণজনিত কারণে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর উষ্ণায়নকে দায়ী করেছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে উষ্ণতা বেড়ে চলেছে। প্রধানত নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে। মেরু অঞ্চলে বরফ গলতে শুরু করেছে। সমুদ্রজলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও 'গ্রিনহাউস এফেক্ট' সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যা, ঝড়, খরা, টর্নেডো, এল নিনো প্রভৃতি ও ঋতুর পরিবর্তন পৃথিবীর নানা দেশে পরিলক্ষিত হয়েছে।

এর প্রভাব মানুষের জীবনযাত্রাসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পড়ছে। কারণ হিসাবে দেখা যায় বনভূমি হ্রাস, বায়ুমণ্ডলের দূষণ, ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শহর ও নগরায়ণের বিকাশ, সীমাহীন ভোগ বিলাসের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনমন ইত্যাদি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে শুধুমাত্র দিল্লি শহরেই বর্তমানে ৮০ লক্ষ গাড়ি চলছে এবং দৈনিক ১৯০০ গাড়ি বাড়ছে। এই ভারসাম্যহীন আচরণ পরিবেশের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনছে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে এর ফলে বিশ্বজুড়ে কৃষি উৎপাদনে ঘাটতি হবে যা জীবজন্তু-সহ উদ্ভিদ ও মানুষের বিপর্যয়ের পথ প্রশস্ত করছে। আজ যে হারে মানুষ জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে চলেছে তাতে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে যার ফল হিসাবে সমুদ্রতলের উচ্চতায় বৃদ্ধি ঘটবে এবং বহু প্রজাতির নিশ্চিহ্ন হওয়া সুনিশ্চিত হবে। এতে তটবর্তী মানুষের জীবন জীবিকার উপর বড় প্রভাব পড়বে।

আর অন্যদিকে সমুদ্রের বরফ গলে গেলে কম সৌরকিরণ ও উষ্ণতা প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে ফিরে যাবে। সুমেরু আরও বেশি উষ্ণ হয়ে উঠবে। অপরদিকে মিথেন গ্যাস বরফ আবৃত তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে নির্গমন হবে, যা কার্বন ডাইঅক্সাইডের থেকে ২০

উপগ্রহ-তথ্য : ১৯৯৩—বর্তমান সময় পর্যন্ত
তথ্য অনুসন্ধান : উপগ্রহ থেকে সমুদ্রতট পর্যবেক্ষণ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : নাসা গোদার্ড মহাকাশ উড়ান কেন্দ্র

পরিবর্তনের হার
৩.২৪
মিমি বাৎসরিক হার অনুযায়ী

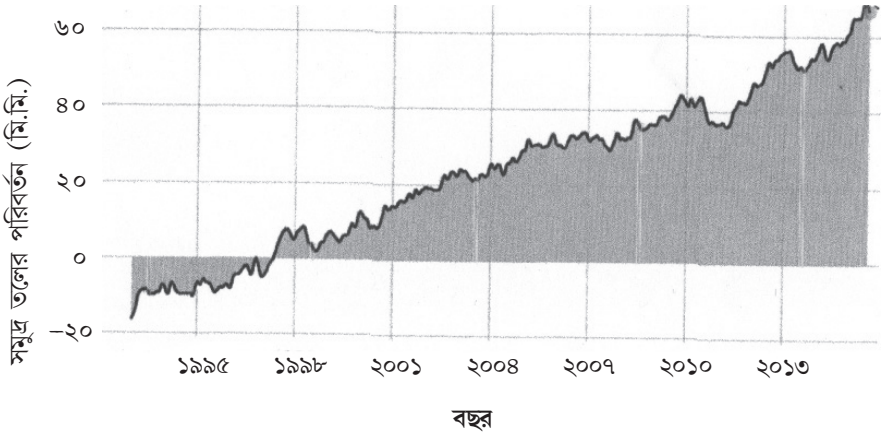

ভূমি-তথ্য (১৮৭০-২০০০)
তথ্য অনুসন্ধান : উপকূলীয় জোয়ার গজ সংক্রান্ত নথি
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সি.এস.আই.আর.ও

বিশ্ব ভূমি ও মহাসাগরের তাপমাত্রা সূচি
তথ্য উৎস : নাসার গোদার্ড মহাকাশ অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠান
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : নাসা। জিআইএসএস

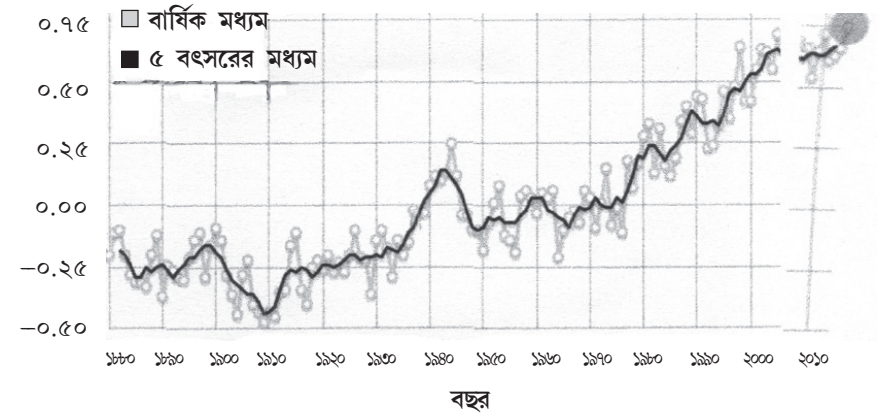

সময় : ১৮৮৪ থেকে ২০১৪
তথ্য উৎস : নাসা। জিআইএসএস
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : নাসা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ স্টুডিও

গুণ বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত।

মানুষের কার্যকলাপের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে এসেছে। পৃথিবীর ভূমিভাগের এক-তৃতীয়াংশ কৃষিকার্যে এবং একের অর্ধাংশ নগরায়ণ ও উন্নয়ন ও বাণিজ্য কর্মকাণ্ডে। বনভূমি ধ্বংসের ফলে এক-চতুর্থাংশ পক্ষী-প্রজাতি বিলুপ্ত হতে চলেছে। জলদূষণ ও জলসংকট আজ দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। প্রকৃতির কোনও অংশই আজ মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা ও মুনাফালাভের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

বিগত ১৫০ বছরে মনুষ্যকৃত বিপর্যয়ের সংখ্যাও কম নয়। ভোপালে ইউনিয়ন কারবাইড গ্যাস লিক, রাশিয়ার চেরনোবিলে পারমাণবিক প্লান্টে বিস্ফোরণ, 'লাভ ক্যানাল'-এ রাসায়নিক বর্জ্য ফেলা, ২০ এবং ২১ শতকের বিভিন্ন সময়ে সমুদ্রে তৈল দূষণ ইত্যাদি পরিবেশের উপর গভীর ক্ষত রেখে গেছে।

উপসংহার

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রাখতে গেলে প্যারিস জলবায়ু ডিসেম্বর ২০১৫ সম্মেলন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দেওয়া নেওয়ার মানসিকতার। বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা ফ্রান্সের এই সভায় পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে মানব কল্যাণের স্বার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন এই আশায় তাকিয়ে আছে সারা বিশ্ব। ❑

[লেখক দেবজ্যোতি চন্দ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণজ্ঞাপন ও ভিডিওগ্রাফি বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং অমর্ত্য সাহা তাঁর তত্ত্বাবধানে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করছেন।]

জলবায়ু পরিবর্তনের প্যারিস সম্মেলনে কী হবে

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের হিসেব-নিকেশ নিয়ে দেশে-দেশে দ্বন্দ্ব চলে এসেছে বহুকাল ধরে। উন্নত বনাম উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে চাপান-উতোর চলছেই। এখন সবার নজর প্যারিসের সম্মেলনের দিকে। এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগ নিয়ে পর্যালোচনা করছেন **ড. মোহিত রায়।**

বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং তার প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কাটি গত দুই দশক ধরে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতির আলোচনায় ক্রমশ মুখ্য স্থান অধিকার করে নিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে যথেষ্ট কিছু না করা গেলে পৃথিবীর ভয়ংকর দিন এগিয়ে আসছে—এরকম ভবিষ্যদ্বাণী অহরহ হচ্ছে, যদিও কিছু বিজ্ঞানী এরকম আদৌ ভাবছেন না। সংখ্যায় কম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিজ্ঞানী এ বিষয়টি ভিন্ন চোখে দেখেন। একদল এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেন না, এটি ঠিকমতো মাপা হচ্ছে বলে মনে করেন না। একদল এই ব্যাপারে মনুষ্য প্রভাব ও এর ব্যাখ্যায় গাণিতিক মডেল ও সুপার কম্পিউটারের সফলতা সম্পর্কে সন্দিহান। যেহেতু পৃথিবীর উন্নত ধনী পশ্চিমি দেশগুলি এ নিয়ে সবচেয়ে সোচ্চার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলি কিছুটা বাধ্য হয়েই এই বিষয়ের কার্যক্রমে যোগদান করেছে। ফলে রাজনীতির প্রশ্ন থাকেই যাচ্ছে। এমনকী অনেকে মনে করছেন বিষয়টি এত গুরুত্ব পেয়েছে পশ্চিম ইউরোপের নৈতিক সমস্যার কারণে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা জলবায়ু পরিবর্তনের বিজ্ঞানটি অল্প কথায় জেনে নেওয়া যাক। সূর্য থেকে যে আলোক ও তাপশক্তি পৃথিবীতে আসে তার অনেকটাই আবার তাপ হিসেবে ফেরত যায়। এই ফেরত যাওয়া তাপের কিছুটা ধরে রাখতে সক্ষম জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য কয়েকটি গ্যাস। বিষয়টি ১৮৯৬ সালে প্রথম উন্মোচিত করেন সুইডিশ বিজ্ঞানী আরেনিয়াস। এই জন্যই পৃথিবী একেবারে ঠান্ডা হয়ে যায় না, এই উষ্ণতার জন্য পৃথিবীতে প্রাণের এত বিপুল বিস্তার। আমাদের কাছের পরিচিত গ্রহ-উপগ্রহগুলিতে বায়ুমণ্ডলের অনুপস্থিতি বা সামান্য উপস্থিতির জন্য এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের অভাবের জন্য সেখানে তাপমাত্রা কখনও খুব বেশি বা কখনও খুব কম—পৃথিবীর মতো সবসময়ের জন্য কিছু উষ্ণতা ধারণ করবার অবস্থা সেখানে নেই। গ্রিনহাউস এফেক্টের জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে—এমন আশঙ্কা শুরু হয় গত শতাব্দীর আশির দশকে। পৃথিবীর তাপমাত্রা কমা বাড়াটা নতুন কিছু নয়। পৃথিবীর তাপমাত্রা এর আগেও কয়েকবার বেড়েছে আবার খুব কমেও গেছে (যাকে বলে হিমযুগ)। দশ হাজার বছর আগে হয়েছিল শেষ মহা হিমযুগের অবসান, তারপর আবার তাপমাত্রা বেড়ে যায়। মাঝে আগের কয়েকটি শতক—তেরোশো সাল থেকে আঠারোশো সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর তাপমাত্রা বেশ কমে যায়, লন্ডনের টেমস নদীতে শীতকালে জমে গেলে স্কেটিং করা হত। একে বলা হল ছোট হিমযুগ। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী পৃথিবীতে শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই জীবাশ্ম জ্বালানির দহনের ফলে গত একশো বছর ধরে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড সহ অন্যান্য গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত তাপ সঞ্চিত হয়ে বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সার্বিক তাপমাত্রা, এর ফলে জলবায়ুর বিরূপ পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে দিয়েছে এবং এই অবস্থা ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ হতে পারে—এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে। কতটা তাপমাত্রা বাড়তে পারে, তার ফলে জলবায়ুতে কী কী প্রভাব পড়বে, কী কী ধরনের ঘটনা যেমন সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি, বেশি ঘূর্ণিঝড়, খরা, অতিবৃষ্টি, অধিক তাপমাত্রা, অধিক ঠান্ডা—এরকম বিভিন্ন প্রভাব; সেসব জানতে বিশাল কম্পিউটারে বিভিন্ন গাণিতিক মডেল প্রয়োগ করে জানবার চেষ্টা হচ্ছে।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগ

উষ্ণায়নের কারণ ও প্রভাব বিশ্বজুড়ে ফলে তার জন্য চাই একটি বিশ্বজনীন প্রচেষ্টা। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং তার প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জানা, গবেষণা করা, তাপমাত্রার পরিমাপ করা—এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নিতে ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত হল ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ—আইপিসিসি। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে বসে রাষ্ট্রসংঘের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন। এটা বসুন্ধরা সম্মেলন বলে পরিচিত। এই সম্মেলনে হাজির ছিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতিসহ রেকর্ড সংখ্যক রাষ্ট্রনায়কেরা। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে দুশ্চিন্তা এই সম্মেলনে প্রথম আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পেল, তৈরি হল একটি দলিল—ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC)। এটি এক ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি যার ফলে উষ্ণায়নকারী গ্যাসগুলির নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এই চুক্তির অবশ্য কোনও আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল না, এমনকী উষ্ণায়নকারী

গ্যাসগুলির নিয়ন্ত্রণের কোনও লক্ষ্যমাত্রাও ঠিক করা হল না। এই চুক্তিতে পৃথিবীর দেশগুলিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা হল। প্রথম দলে (পরিশিষ্ট বা অ্যানেক্স-১) রইল উন্নত দেশগুলি অর্থাৎ ইউরোপের দেশগুলি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়ারা। আর অন্য দলে উন্নয়নশীল দেশগুলি যার মধ্যে রয়েছে ভারত ও চীন। এই চুক্তিতে বলা হল যে প্রথম দলের দেশেরা তাদের উষ্ণায়নকারী গ্যাসগুলির নির্গমন ১৯৯০ সালে যতটা হত ততটায় কমিয়ে আনার চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে উন্নয়নশীল বা গরিব দেশগুলির কোনও দায়িত্ব থাকবে না। ১৯৯৪ সালে ৫০টি দেশ এই চুক্তিতে সম্মতি দেওয়ায় রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম অনুযায়ী চুক্তিটি কার্যকর হল। ঠিক হল প্রতি বছর স্বাক্ষরকারী দেশগুলি একবার করে মিলিত হবে, একে বলা হয় কনফারেন্স অফ পার্টিস (COP)। ১৯৯৫ সালে এই প্রথম COP বসে বার্লিন শহরে। এভাবে গত কুড়ি বছর ধরে প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে COP বসে আসছে। প্যারিস সম্মেলনে হবে একুশতম COP সভা। এই COP সভাগুলি কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করতে এই চুক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলির প্রস্তাব এনেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ও গুরত্বপূর্ণ নিয়মকানুন চালু হয় ১৯৯৭-এর জাপানের কিয়োটো-তে বসা তৃতীয় COP-তে যাকে বলা হয় কিয়োটো প্রোটোকল। এই কিয়োটো প্রোটোকল বলা হল যে উন্নত দেশগুলিকে ২০০৮ থেকে ২০১২-র মধ্যে তাদের ১৯৯০ সালে যা কার্বন নির্গমন ছিল তা থেকেও ৬-৮ শতাংশ কমাতে হবে, আমেরিকাকে কমাতে হবে ৭ শতাংশ। গরিব দেশগুলির কার্বন নির্গমন নিয়ে কোনও বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। গরিব দেশের কোনও ধরনের প্রকল্পে বা প্রযুক্তিতে কার্বন নির্গমন কমালে উন্নত দেশের কোনও কোম্পানি তা দাম দিয়ে কিনে সেটাকে তার কার্বন নির্গমন হ্রাস বলে দেখাতে পারবে। একে বলা হল কার্বন বাণিজ্য যার ফলে ভারতে ও চীনে কার্বন ক্রেডিট বিক্রির এক বড় বাজার তৈরি হয়েছে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে COP সভায় ঠিক হল যে ২০১০ আসতে চলল কিন্তু এখনও এই উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের কাজ তেমন এগোয়নি, ফলে ২০০৯-এর কোপেনহেগেনের সভায় ২০১২ ও তার পরের সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কোপেনহেগেন সম্মেলনে ইউরোপের দেশগুলি বলেছিল যে তারা ২০২০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালে যতটা কার্বন নির্গমন হত তার থেকেও ২০ শতাংশ কমাবে। আমেরিকা বলেছিল তারা ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫ সালে যতটা কার্বন নির্গমন হত তার থেকে ৪০ শতাংশ কমবে। আমরা এখন থাকি এক বিশ্বসমাজে ফলে এক ঘরে হয়ে থাকার কোনও মানে হয় না, ফলে চাপে পড়ে ভারত ও চীন এই কমানোর কথাটা বলেছিল একটু ঘুরিয়ে। এর মধ্যে পৃথিবীর অর্থনীতিতে চীনের অভাবনীয় অগ্রগতি অনেক হিসেব পালটে দিয়েছে। কিছুটা দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে ভারতেরও। এই দুটি দেশের জনসংখ্যা পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ। ফলে যদিও জনপ্রতি কার্বন নির্গমন এই দেশগুলির এখনও কম তবু মোট কার্বন উদ্‌গিরণ অনেক। সাম্প্রতিকতম হিসাবে চীনের মোট কার্বন উদ্‌গিরণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেছে, ভারত রয়েছে তৃতীয় স্থানে। চীন ও ভারত বলেছিল তারা অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রতি এককে যথাক্রমে ৪০-৪৫ শতাংশ ও ২০-২৫ শতাংশ কার্বন নির্গমন কমাবে। একে বলা হচ্ছে কার্বন গাঢ়তা কমানো। অর্থাৎ এতে মোট কার্বন নির্গমন বা দেশের উৎপাদনে কোনও নিয়ন্ত্রণ না করেও কার্বন নির্গমনের হার কমানো যাবে। এই প্রতিশ্রুতির কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং এর ওপর কোনও আন্তর্জাতিক নজরদারিও থাকবে না।

সারণি-১
১৯৯০-২০১৩—পৃথিবীতে কার্বন নির্গমনের পরিবর্তন

উষ্ণায়নকারী দেশ	২০১৩		১৯৯০	
	কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন (০০০, টন)	জনপ্রতি নির্গমন, টন	কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন (০০০, টন)	জনপ্রতি নির্গমন, টন
১. চীন	১০,৩৩০,০০০	৭.৪	২৪৬০৭৪৪.০	২.২
২. আমেরিকা	৫,৩০০,০০০	১৬.৬	৪৮২৩৫৫৭.১	১৯.৩
৩. ভারত	২,০৭০,০০০	১.৭	৬৯০৫৭৬.৮	০.৮
৪. রাশিয়া	১,৮০০,০০০	১২.৬	২০৮১৮৪০.২	
৫. জাপান	১,৩৬০,০০০	১০.৭	১০৯৪২৮৭.৮	৮.৯
৬. জার্মানি	৮৪০,০০০	১০.২	৯২৯৯৭৩.২	
৭. দক্ষিণ কোরিয়া	৬৩০,০০০	১২.৭	২৪৬৯৪৩.১	১২.১
৮. কানাডা	৫৫০,০০০	১৫.৭	৪৩৫১৮১.২	১৫.৭
৯. ব্রিটেন	৪৮০,০০০	৭.৫	৫৫৫৯০২.৫	৯.৭
১০. ফ্রান্স	৩৭০,০০০	৫.৭	৩৭৫৬৩২.৮	৬.৪
১১. ইটালি	৩৯০,০০০	৬.৪	৪১৭৫৫০.৩	৭.৪

সারণি-১ থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে গত কুড়ি বছরের প্রচেষ্টার কিছু ফল ফলেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলি তাদের কার্বন নির্গমন অনেকটাই কমিয়েছে এবং ১৯৯০-এর থেকেও তা কমেছে। অর্থনৈতিক উন্নতি চালু রেখে এই হ্রাস নিশ্চয়ই কম সাফল্য নয়। কিন্তু পাশাপাশি চীন তার কার্বন নির্গমন বাড়িয়েছে চার গুণ, ভারত তিন গুণ। ফলে মোট যোগফল জলবায়ু পরিবর্তনের দুশ্চিন্তা এখনও কমাতে পারেনি। সেই কারণেই ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানের সম্মেলনে ঠিক হল ২০১৫ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন হ্রাস করার জন্য সব দেশ দায়িত্ব নেবে এরকম একটা চুক্তি তৈরি করতে হবে। এটা এর আগের সব চুক্তি থেকে এক ধাপ এগিয়ে কারণ এতে

বড়লোক-গরিব সব দেশকেই দায়িত্ব নেবার কথা বলা হল।

জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমন

সব দেশ নিজেরাই আগামী বছরগুলিতে কতটা কার্বন নির্গমন করবে তার একটা হিসাব দেবে যাতে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রাক-শিল্পবিপ্লবের সময়ের তাপমাত্রার চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৃদ্ধি না পায়। এর নাম—(ইনটেনডেড ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কনট্রিবিউশানস)—INDC বা জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমন। ২০১৪-র ডিসেম্বরে ১৯৪টি দেশের অংশগ্রহণে সর্বশেষ সম্মেলন হল পেরুর রাজধানী লিমাতে। লিমা সম্মেলনে ১৯৪টি দেশ মিলে ঠিক করল যে ৩০ অক্টোবর ২০১৫-র মধ্যে তারা প্রত্যেকে তাদের INDC জানিয়ে দেবে যাতে তারা কীভাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছবে তারও রূপরেখা থাকবে। এছাড়াও এসবের জন্য অর্থ, প্রযুক্তি বিনিময় ইত্যাদি নানা বিষয়েও পরবর্তী সম্মেলনে আলোচনা হবে। সেটা হবে প্যারিসে। এটি ধনী-গরিব দেশের বিভাজনটি সরিয়ে দেবার একটি পরিকল্পনা যাতে সব দেশ কিছু দায়িত্ব নেয়।

ভারত তার INDC রিপোর্ট জমা দিয়েছে। রিপোর্টটি অযথা কিছু চলতি পরিবেশ নিয়ে গালভরা কথা, ভারতীয় ঐতিহ্য, মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি দিয়ে পৃষ্ঠা ভরানো হয়েছে। এই সব বড়বড় কথার পর আমাদের অত্যন্ত লজ্জাজনক অস্তিত্বের কথাগুলি স্বীকার করে বলা হয়েছে যে ভারতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দরিদ্র লোকের বাস, সবচেয়ে বেশি লোকের ঘরে বিদ্যুৎ নেই, পানীয় জল নেই, জ্বালানির জন্য ব্যবহার করতে হয় কাঠকুটো ইত্যাদি। ভারতের জনপ্রতি বার্ষিক শক্তির ব্যবহার ০.৬ টন তৈল সমতুল (TOE) যেখানে পৃথিবীর গড় জনপ্রতি ১.৮৮ TOE। ভারত মানব উন্নয়ন সূচকে অনেক পিছিয়ে ১৩৫তম স্থানে এবং উন্নত জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন অন্তত জনপ্রতি ৪ TOE। ফলে ভারতের এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই প্রাধান্য দিতে হবে এবং 'সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট'-এর পথে এগোতে হবে। এর জন্য যেসব বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রতি এককে শক্তি গাঢ়তা (এনার্জি ইন্টেনসিটি) ২০০৫ থেকে ২০১০-এর মধ্যে ১২ শতাংশ কমেছে। বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে যেমন আরও বেশি পুনর্নবীকরণযোগ্য ও অচিরাচরিত শক্তির (সৌর, বায়ু ইত্যাদি) ব্যবহার, শক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, অরণ্যায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫-এর অনুপাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রতি এককে ৩০-৩৫ শতাংশ শক্তি গাঢ়তা কমাবে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ আসবে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে।

সারণি-২
কয়েকটি দেশের INDC

উদ্গীরণকারী দেশ	কত গ্রিনহাউস গ্যাস কমানো হবে	কোন বছরের তুলনায়	কবের মধ্যে কমান হবে
১. চীন	জাতীয় আয়ে ৬০-৬৫ শতাংশ শক্তি গাঢ়তা কমাবে	২০০৫	২০৩০
২. আমেরিকা	২৬-২৮ শতাংশ	২০০৫	২০২৫
৩. ভারত	জাতীয় আয়ে ৩০-৩৫ শতাংশ শক্তি গাঢ়তা কমাবে	২০০৫	২০৩০
৪. রাশিয়া	২৫-৩০ শতাংশ	১৯৯০	২০৩০
৫. জাপান	২৬ শতাংশ	২০১৩	২০৩০
৬. ইউরোপ	৪০ শতাংশ	১৯৯০	২০৩০
৭. ব্রাজিল	৪৩ শতাংশ	২০০৫	২০৩০
৮. অস্ট্রেলিয়া	২৬-২৮ শতাংশ	২০০৫	২০৩০
৯. থাইল্যান্ড	২৬-২৮ শতাংশ	২০১৫	২০৩০
১০. ইন্দোনেশিয়া	২৯ শতাংশ	২০০৫	২০৩০

৩০ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর প্যারিসে বসছে ২১তম COP। এই সম্মেলনের প্রথম কাজ হচ্ছে জমা দেওয়া বিভিন্ন দেশের এই সব INDC নিয়ে আলোচনা। এই আলোচনাতেই দেখা যাবে কোন দেশ কার্বন নির্গমনের জন্য কতটা দায়িত্ব নিচ্ছে। এখন পর্যন্ত ১৩১টি দেশ তাদের INDC জমা দিয়েছে। মোটামুটি বড় দেশগুলি সবাই ৩০-৪০ শতাংশ কার্বন উদ্গিরণ কমাবে বলেছে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলির অনেকেই বলেছে যে এটা সম্ভব হবে উন্নত দেশগুলির থেকে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সাহায্য পেলেই। চীন তার INDC-তে বলেছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫-এর অনুপাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রতি এককে ৬০-৬৫ শতাংশ শক্তি গাঢ়তা কমাবে। এই সবের ভিত্তিতে প্যারিস সম্মেলনের দ্বিতীয় বড় কাজ হল পৃথিবীর সব দেশকে নিয়ে সর্বসম্মত একটি চুক্তি প্রস্তুত করা যাতে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রির মধ্যে রাখা যায়। তৃতীয় কাজ হল এই চুক্তির পক্ষে সবাইকে অংশগ্রহণে এবং ২০২০-র মধ্যে আরও কার্যকরী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অসরকারি ও অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠনকে এই লক্ষ্যে যুক্ত করা।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের হিসেব-নিকেশ যখন হচ্ছে তখন পৃথিবীর গরিব আর ধনী দেশগুলির চিরন্তন দ্বন্দ্ব আবার শিরোনামে চলে এল। হিসাবটা একদিকে খুব সোজাই। বায়ুমণ্ডলে এত কার্বন ডাইঅক্সাইডের বোঝা তাতে মূলত চেপেছে গত একশো বছর ধরে পশ্চিমি দেশগুলির শিল্পোন্নয়নের ফলেই। পশ্চিমি দেশগুলির উন্নত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে দরকার প্রচুর শক্তির জোগান আর তা থেকেই এত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমস্যার জন্ম। কিন্তু গরিব দেশগুলি আজকে উন্নয়নের পথে চলেছে, তাদের তো শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রয়োজনে এখনও

অনেকদিন কার্বন ডাইঅক্সাইডের কথা ভাবলে চলবে না। গড় ভারতীয় গড় জার্মান বা ব্রিটিশের থেকে প্রায় ৮ গুণ কম কার্বন খরচ করে। আর গড় আমেরিকান খরচ করে ১৬ গুণ বেশি। সুতরাং বিশ্ব উষ্ণায়ন কমাতে হলে পশ্চিমি দেশগুলির কার্বন খরচ কমানো ছাড়া উপায় কি। যদি পৃথিবীতে অসাম্য কমাতে হয় তাহলে ভারতীয়দের কার্বন খরচ ৪ গুণ বেড়ে যায় আর ইউরোপিয়ানদের ৪ গুণ কমেও যায়, তবুও ভারতের জনসংখ্যা ইউরোপের প্রায় আড়াই গুণ হওয়ার ফলে সব মিলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস অনেক বেড়েই যাবে। তাহলে কী করণীয়? প্যারিস সম্মেলন কি তার উত্তর দিতে পারবে?

এছাড়া আইপিসিসি-র বিভিন্ন রিপোর্ট নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। আইপিসিসি-র ৩য় রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের এক-পঞ্চমাংশ সমুদ্রে তলিয়ে যাবে, দু কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হবেন। এটা বলা হয়েছিল প্রতি বছরে গড় সমুদ্র জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি ধরে। বাংলাদেশের কয়েকটি জায়গায় যে সমুদ্রের জলস্তর মাপা হয় সেখানে এই জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধিও লক্ষ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের গত ৩০ বছরের উপগ্রহ চিত্র তুলনা করে দেখা যাচ্ছে যে উপকূল অঞ্চলে ১০০০ বর্গকিলোমিটার জমি বেড়ে গেছে। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রের বয়ে আনা পলি এই জমি তৈরি করেছে। একসময় উপকূল অঞ্চলে বাঁধ দিয়ে অনেক জমি উদ্ধার করা হয়েছিল, বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মতে এভাবে বাঁধ দিয়ে আরও ৫০০০ বর্গকিলোমিটার জমি পাওয়া যেতে পারে। তাহলে বাংলাদেশের পরিকল্পনা কী হবে— এক-পঞ্চমাংশ জমি ডুবে যাবে এই ভেবে না আরও নতুন জমি পাওয়া যাবে তা ভেবে। এই সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনেও। গঙ্গা মোহনার ঘোড়ামারা দ্বীপ ডুবছিল অনেকদিন ধরেই, গত দু দশকে তা ঘটল দ্রুত। একদল বিজ্ঞানী বলে দিলেন এসব উষ্ণায়নের ফল। কিন্তু পাশাপাশি আরেক দল বিশেষজ্ঞ মনে করেন এর কারণ নদীর নিজস্ব গতিপ্রকৃতি। কয়েকটি দ্বীপ যেমন ডুবছে তেমনি দু' দশকে সেখানেই নয়াচর দ্বীপ দুগুণ বড় হয়েছে। ফলে আমাদের তড়িঘড়ি কোনও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত না নেওয়াই মঙ্গল।❑

[লেখক পরিবেশবিদ। দেশে-বিদেশে তিন দশক ধরে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কাজ করছেন। কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট'-এ অতিথি অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতাও করেন।]

শোকসংবাদ

যোজনা (বাংলা) পত্রিকার সম্পাদক **অন্তরা ঘোষ**-এর অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।

অন্তরা ঘোষ

(০৪.০৪.১৯৬৩ — ২৭.১১.২০১৫)

ভারতীয় তথ্য কৃত্যক (ইন্ডিয়ান ইনফর্মেশন সার্ভিস)-এ তিনি ১৯৮৭ সালে [কলকাতার প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো-তে তথ্য সহায়ক পদে] যোগ দেন। ১৯৯৪ সাল থেকে আমৃত্যু কর্মজীবনের বেশিরভাগটা তিনি প্রকাশনা বিভাগের যোজনা (বাংলা) পত্রিকাতেই কাটিয়েছেন। দীর্ঘ অসুস্থতার পর গত ২৭ নভেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্র । চ্ছ । দ । নি । ব । ন্ধ

জলবায়ুর পরিবর্তন ঠেকাতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ভূমিকা

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ সব মহলেই। পরিত্রাণের উপায়? বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির নিঃসরণ যথাসম্ভব কমানো। শক্তি উৎপাদনক্ষেত্র থেকেই সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস মেশে বায়ুমণ্ডলে। তার ওপর জীবাশ্ম জ্বালানিগুলির সীমিত ভাণ্ডারেও এখন টান পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে পুনর্নবীকরণ শক্তির উৎসগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হলে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি দেশের শক্তি নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করা যাবে। লিখছেন **অমিত কুমার।**

কয়েক হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে এই পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এটি একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। কিন্তু বর্তমানে যে বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তা সেটা হল জলবায়ু পরিবর্তনের গতি—বিশেষ করে যে হারে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে তা রীতিমতো বিজ্ঞানীদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। এমনিতে পৃথিবীর মাটি উষ্ণ হয় এবং সেই উষ্ণতা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে—এইভাবেই একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস-এর গ্যাসগুলি জমতে থাকার ফলে তাপমাত্রার বিকিরণ ঘটতে পারছে না। বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই উষ্ণতা আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। ফলে ক্রমেই উষ্ণ হচ্ছে এই সবুজ গ্রহ। ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বা 'নাসা'-র মতে '১৮৮০ সাল থেকেই পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকেই এই উষ্ণতার প্রকোপ বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। ১৯৮১ সাল থেকে ২০টি উষ্ণতম বছরের সাক্ষী থেকেছে পৃথিবী এবং গত ১২ বছরে ১০টি উষ্ণতম বছর এসেছে এই গ্রহে...গত ২০১৪ সালটি ছিল এত দিনের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণ বছর।'

মানুষের নানাবিধ কাজকর্ম যে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করেছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন একমত। গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বেড়েছে। গত এক শতকে জীবাশ্ম জ্বালানির নিরন্তর ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণও ক্রমেই বেড়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয় আন্তঃসরকারি প্যানেল বা 'ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC)-এর পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী '১৯৭০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির নির্গমন ক্রমেই বেড়েছে...১৯৭০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে যেখানে গ্রিনহাউস নির্গমন বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল যেখানে ১.৩ শতাংশ সেখানে ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বছরে গড়ে ২.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এই গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির নির্গমন।' চিত্র-১-এ বর্ণনা রয়েছে। এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, 'বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমন এবং শিল্পসংক্রান্ত নানান কাজকর্ম গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন বৃদ্ধির ৭৮ শতাংশের জন্য দায়ী।' এর মধ্যে শক্তি সরবরাহ ক্ষেত্রের দায় ৪৭ শতাংশ, শিল্পক্ষেত্রের ৩০ শতাংশ, পরিবহণ ক্ষেত্রের ১১ শতাংশ এবং আবাসন নির্মাণ ক্ষেত্রের দায় ৩ শতাংশ।

পরিবেশ তথা আবহাওয়ার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে কিন্তু মারাত্মক। ঘন ঘন খরা বা তুষারঝড়ের মতো ঘটনার মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তনের প্রভাব টের পাওয়া যাচ্ছে। বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষিকাজ। সমুদ্রের জলস্তর বাড়ার ফলে উপকূলবর্তী বহু এলাকা জলের তলায় চলে যাচ্ছে। ফলে ওই সমস্ত এলাকায় বাসিন্দাদের ভিটেমাটি ছাড়া হতে হচ্ছে। তাছাড়া উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে নানারকম রোগব্যাধির প্রকোপ তো বাড়ছেই।

অতীতে যা ঘটে গেছে তাকে আর পরিবর্তন করা যাবে না। কিন্তু পৃথিবীর এই উষ্ণতা বৃদ্ধিকে একটা নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য মাত্রায় ধরে রাখতে বিশ্বজুড়ে সমবেত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো চুক্তি বা 'ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' (UNFCCC)-এর ঘোষিত লক্ষ্যই তাই ছিল, 'চুক্তির প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাপনা পত্রগুলি মেনে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ধরে রাখা যাতে মানুষের বিপজ্জনক সব কর্মকাণ্ডের ফলে জলবায়ুর ভারসাম্য বিপর্যস্ত না হয়ে পড়ে।' এই লক্ষ্য মেনে আইপিসিসি-এর ঘোষণা অনুযায়ী একটি বৈজ্ঞানিক পন্থা মেনে কানকুন বৈঠকে সমবেত দেশগুলি পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি যাতে শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী আমলের তাপমাত্রার চেয়ে ২ ডিগ্রি না ছাড়ায় তা সুনিশ্চিত করতে সম্মত হয় (১৮৮০ সাল থেকে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ০.৮৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়েছে বলে জানানো হয়েছে IPCC-এর প্রতিবেদনে)। তবে নতুন নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সীমা যথেষ্ট নয়, ২ ডিগ্রির বদলে এই সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত ছিল ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। যে হারে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে এই একই ধারা যদি চলতে থাকে তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ঘোরাফেরা করবে ৩.৬ ডিগ্রি থেকে ৪.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে।

বিশ্বের মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের দুই-তৃতীয়াংশ শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের কারণেই ঘটে থাকে। এই কারণে জলবায়ু পরিবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব

চিত্র-১
মোট বার্ষিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন (১৯৭০-২০১০)

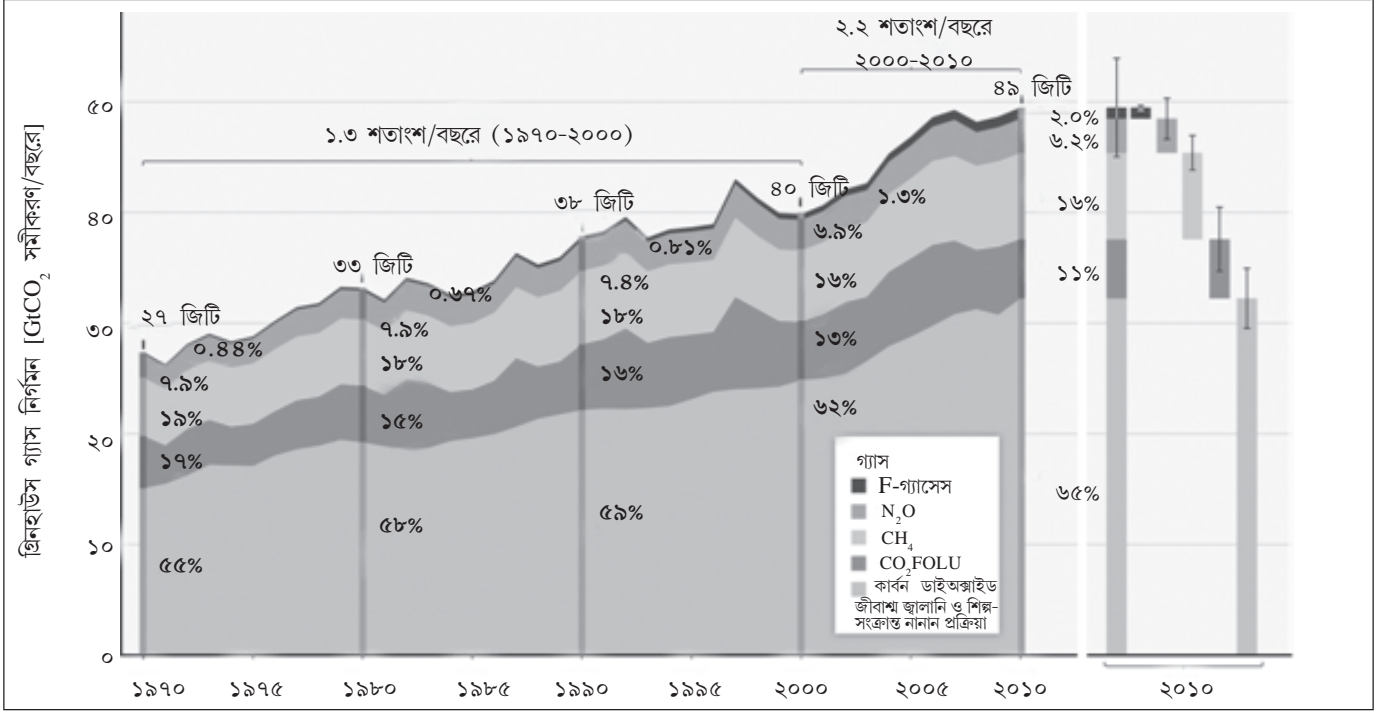

কমানোর যে কোনও কর্মপরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদন ও এর ব্যবহার-সহ সামগ্রিকভাবে শক্তিক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতিগুলি ঠেকানোর অন্যতম পন্থা হল এই ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎসগুলির ওপর নির্ভরতা যথাসম্ভব কমানো, যেমন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, গরম বা ঠান্ডা করার কাজে বা পরিবহণ ক্ষেত্রে কয়লা বা তেলের দহন কমিয়ে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আর এই কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনরোধে যে কোনও দেশের কোনও বিশেষ কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহের দিক থেকে যথাক্রমে শক্তি সংরক্ষণ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্তম্ভ।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি কেন?

শক্তিক্ষেত্র থেকেই বিশ্বে সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হয়। আবার শক্তি উৎপাদন ছাড়া বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা যেমন দারিদ্র দূরীকরণ, পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহারের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে একদিকে শক্তি সম্পদের নাগাল এবং অন্যদিকে শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের শিক্ষা ও সাক্ষরতার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই একটা যোগাযোগ রয়েছে। ফলে দারিদ্র দূরীকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং ত্বরান্বিত আর্থিক বিকাশের লক্ষ্য পূরণের জন্য শক্তির উৎপাদন বাড়ানো আবশ্যক। কারণ এর পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ণের বাড়তি চাপও রয়েছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে একদিকে শক্তির (বিদ্যুৎ) ওপর অর্থনীতির নির্ভরতা যথাসম্ভব কমাতে হবে এবং অন্য-দিকে, সৌর, বায়ু, বায়োমাস বা জলবিদ্যুতের মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসের মাধ্যমে শক্তিসম্পদের এই চাহিদা পূরণ করতে হবে।

বিভিন্ন কারণে জীবাশ্ম জ্বালানির চেয়ে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি বর্তমানে আরও বেশি করে আলোচনার শিরোনামে উঠে এসেছে। প্রথমত, এই উৎসগুলি থেকে দূষণের সম্ভাবনা অনেক কম। দ্বিতীয়ত, এগুলি থেকে বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর কার্বন ডাইঅক্সাইড মেশার সম্ভাবনাও যৎসামান্য (IPCC-এর পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতিরোধ বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদন থেকে চিত্র-২-এ বিষয়টি তুলে ধরা হল)। চিরাচরিত শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে ছোটখাট কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানোর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ যে সম্ভব নয় তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে। তাই পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসগুলির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারের দিকে অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি রোধের যে কোনও পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতেই যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে স্থান দিতে হবে সেটা উপলব্ধি করে বিশ্বজুড়েই এই বিষয়টির ওপর এখন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। REN 21-'পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ২০১৫ : বিশ্বের অবস্থানবিষয়ক প্রতিবেদন' থেকে জানা যাচ্ছে যে বিশ্বের যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে তার ৫৮.৫ শতাংশ আসছে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে এই বছরের শেষে বিশ্বের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ২৭.৭ শতাংশের উৎস হবে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং বিশ্বের মোট বিদ্যুতের চাহিদার ২২.৮ শতাংশ মিটবে এই পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসগুলি থেকেই। সারণি-

১-এ প্রধান প্রধান পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সূচক তুলে ধরা হল।

ভারতের চিত্র

ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং সেইসঙ্গে আর্থিক বিকাশের দ্রুতগতি পরিকাঠামোর ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করেছে, যার ফলে আদতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ। একদিকে প্রাকৃতিক সহায়সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং অন্যদিকে শিল্পদূষণ—এই দুয়ের বিচারেই এদেশের পরিস্থিতিও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। তার সঙ্গে বনাঞ্চল কেটে সাফ করার প্রবণতা, ভূমিক্ষয় এবং জমির ক্ষয়ক্ষতির ফলে গ্রামাঞ্চলে আর্থিক বিকাশ বাধা পাচ্ছে। দেশের মহানগরগুলিতে যে দ্রুতগতিকে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ ঘটছে তাও যথেষ্ট চিন্তার কারণ।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও শক্তি উৎপাদনক্ষেত্র থেকেই সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। দেশের মোট কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের ৫৫ শতাংশের দায়ই শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রের। সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৯০-২০২০ সময়কালের মধ্যে এই ক্ষতিকর কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ আরও চারগুণ বাড়বে (TERI এনার্জি অ্যান্ড এনভাইরনমেন্ট ডেটা ডিরেক্টর অ্যান্ড ইয়ার বুক ২০০০)। এইভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস এবং বাতাসে ভাসমান ছাই (ফ্লাই অ্যাশ)-এর পরিমাণ বাড়তে থাকলে পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের বিকল্পগুলি খতিয়ে দেখার সময় দেখতে হবে সেগুলি যেন শুধু মূলধন নিবিড় না হয়, সেগুলি যেন হয় পরিবেশবান্ধব।

অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো গেলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলির রোধের প্রয়াসে অনেকটাই এগোনো যাবে। সৌভাগ্যবশত, এ দেশে সূর্যের আলো, বায়ু, বায়োমাস বা জৈবভর এবং জলের মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস প্রচুর। শক্তি সংরক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নানান প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা এমনভাবে করা উচিত যাতে একদিকে

সারণি-১
প্রধান প্রধান পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সূচক

		সূচনা ২০০৪	২০১৩	২০১৪
বিনিয়োগ				
পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও জ্বালানিতে নতুন বিনিয়োগ (বার্ষিক)	বিলিয়ন	৪৫	২৩২	২৭০
শক্তি (বিদ্যুৎ)				
পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা (মোট, এর মধ্যে জলবিদ্যুৎ নেই)	গিগাওয়াট	৮৫	৫৬০	৬৫৭
পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা (মোট, জলবিদ্যুৎকে ধরে)	গিগাওয়াট	৮০০	১৫৭৮	১৭১২
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মোট)	গিগাওয়াট	৭১৫	১০১৮	১০৫৫
জৈববিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	গিগাওয়াট	< ৩৬	৮৮	৯৩
ভূগর্ভের তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের (জিওথার্মাল) ক্ষমতা	গিগাওয়াট	৮.৯	১২.১	১২.৮
সৌর ফোটোভোল্টেইক উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা	গিগাওয়াট	২.৬	১৩৮	১৭৭
সূর্যের তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা (কনসেনট্রেটিং সোলার থার্মাল পাওয়ার)	গিগাওয়াট	০.৪	৩.৪	৪.৪
বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা	গিগাওয়াট	৪৮	৩১৯	৩৭০

সূত্র : REN 21—'পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ২০১৫ : বিশ্বের অবস্থান সংক্রান্ত প্রতিবেদন'।

মাথাপিছু শক্তিসম্পদের চাহিদা (চিরাচরিত উৎসগুলি থেকে) কমে অথচ অন্যদিকে আর্থিক বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি পুরোপুরি দেশীয় এবং এগুলির যথাযথ সদ্ব্যবহার ঘটলে জীবাশ্ম জ্বালানিগুলির ওপর থেকে নির্ভরতা কমবে। বিশ্বজুড়ে জীবাশ্ম জ্বালানিগুলির ভাণ্ডারে যেভাবে টান পড়ছে তাতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলিকে ঠিকমতো কাজে লাগানো হলে দেশের শক্তি নিরাপত্তা বজায় রাখা যাবে এবং দীর্ঘমেয়াদিভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে। এ দেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র, দেশের আয়তন, সর্বোপরি দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির পরিসরের বিচারে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি যেহেতু দেশের বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তাই এগুলিকে স্থানীয় বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত হবে। এতে দেশের বহুবিধ ও বহুমুখী কাজে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো যাবে, কারণ এই ধরনের কর্মকাণ্ড ক্রমেই বেড়ে বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে এই উৎসগুলিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের বাড়িতেও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া যাবে। এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। গ্রামাঞ্চলে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হলে কাজের সন্ধানে শহরে যাওয়ার প্রবণতা কমবে।

বিশ্বজুড়ে প্রথম তেল সংকটের পরই সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি নিয়ে যখন প্রথম কাজকর্ম শুরু হয় তখন থেকেই এই কাজে ভারত যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। তারপর থেকে ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিসংক্রান্ত কর্মসূচির তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। একমাত্র এ দেশেই পুনর্নবীকরণ শক্তির জন্য একটি আলাদা মন্ত্রক রয়েছে, যার নাম—'নতুন ও পুনর্নবীকরণ শক্তিমন্ত্রক'। আমাদের 'জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় (ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ, NAPCC) শক্তিসম্পদ ব্যবহারে কুশলতা (অপব্যবহার ও

চিত্র-২
বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন উৎসের ক্ষেত্রে গ্রিনহাউস গ্যাসের জীবনচক্রের হিসাবনিকাশ

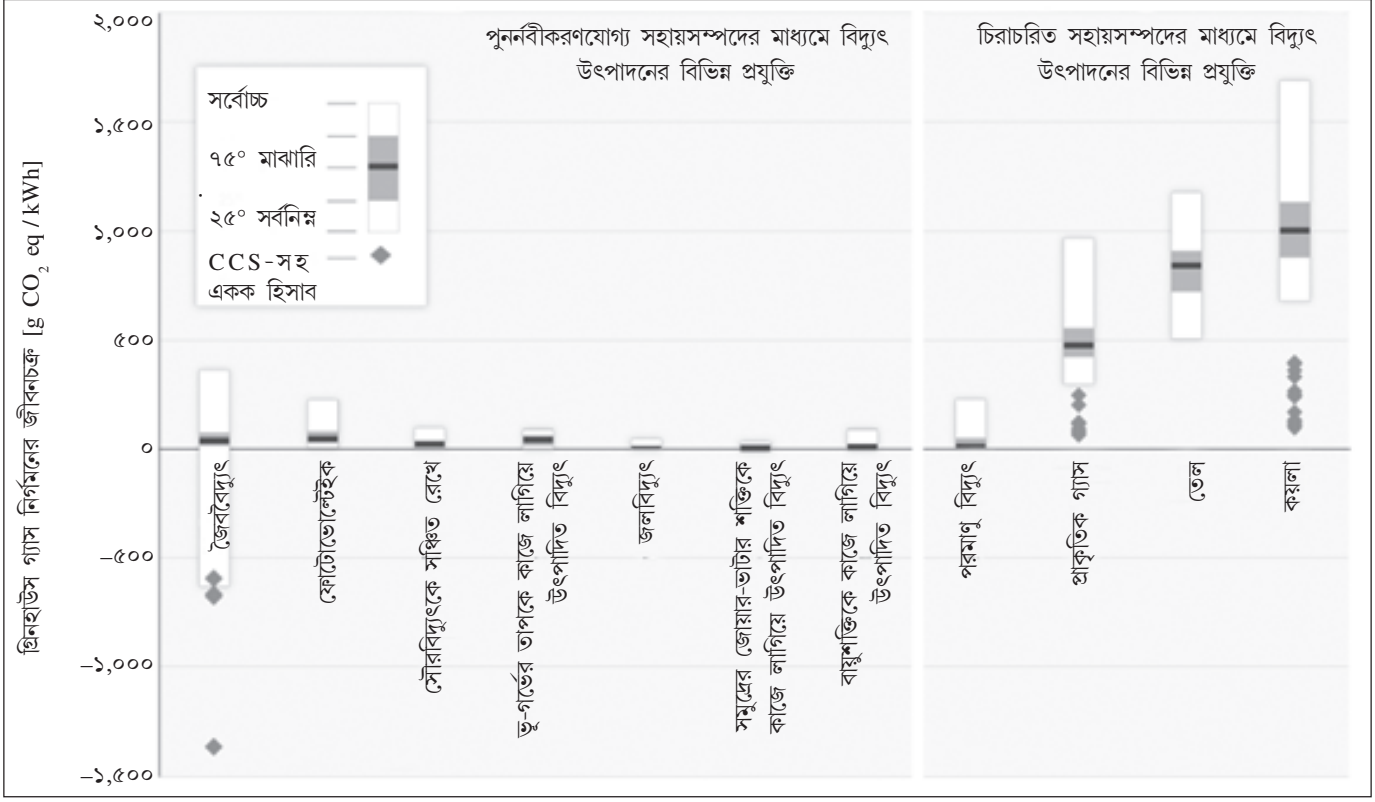

অপচয়রোধ করে শক্তিসম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার) এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শক্তিসম্পদ ব্যবহারের কুশলতা বৃদ্ধি ও সৌরশক্তি ব্যবহারের বিষয়ে মিশনরূপে দুটি কর্মসূচি গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে এখানে। এছাড়া, ২০২০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুতের ১৫ শতাংশ যাতে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসগুলি থেকে আসে সেই লক্ষ্যও বেঁধে দেওয়া হচ্ছে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনায়।

UNFCCC-এর কাছে ভারত সম্প্রতি যে 'ইনটেন্ডেড ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কনট্রিবিউশানস (INDC)' জমা দিয়েছে তাতে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৪০ শতাংশ জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়া শক্তির অন্যান্য উৎস থেকে উৎপাদন করা এবং দ্বিতীয়ত, ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ওপর জিডিপি-র নির্ভরতা (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) ২০০৫ সালের মাত্রার চেয়ে ৩৩ থেকে ৪৫ শতাংশ কমানোর অভিপ্রায়ের কথা ভারত আবারও জানিয়েছে। ২০১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের তথ্য অনুযায়ী এ দেশে ৩৭ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ আসে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসগুলি থেকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২ সালের মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসগুলি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য গ্রহণ করেছে সরকার।

পরিশেষে

জলবায়ু পরিবর্তনের হারকে এমন একটা মাত্রায় যদি বেঁধে রাখতে হয় যাতে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন না হয় সেজন্য বিশ্বজুড়েই কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিঃসরণ যথাসম্ভব কমাতে হবে। গত এক দশকে পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎপাদনের বেশকিছু প্রযুক্তির প্রয়োগ সফল হয়েছে এবং এগুলির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন যে ব্যয়সাশ্রয়ী হবে তা প্রমাণিত হয়েছে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রসার কতটা সফল হবে তা কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে, যেমন—ব্যয়সাশ্রয়, শক্তিসম্পদের বাজারের কাঠামো ও কাজকর্ম এবং বিদ্যুৎভিত্তিক বিভিন্ন পরিষেবা। এই প্রতিটি বিষয় আবার সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে সরকারের অনুকূল নীতির পালে ভর করে এবং উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ মানবসম্পদের সহায়তায় এ দেশে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এবং বহুমুখী পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন কর্মসূচি গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়েছে।

ভবিষ্যতে শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনার সময় চাহিদার দিক দিয়ে শক্তিসম্পদ ব্যবহারের কুশলতা এবং সরবরাহের দিক দিয়ে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারের বিষয়টিই সবচেয়ে প্রাধান্য পাবে। শুধু যে জলবায়ুর পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয় দুটির ওপর নজর দেওয়া হবে তা নয়, বরং দেশের শক্তি নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থেই এই দুটি বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেই হবে। আর, সবচেয়ে বড় কথা, নানান প্রতিকূল পরিবেশের কারণের আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশের বাড়িতে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া যায়নি। পুনর্নবীকরণ শক্তির মাধ্যমে এই অভাব-অভিযোগ দূর করে দেশের বিকাশ প্রক্রিয়াকে আরও সুষম করে তোলা যাবে।❑

[লেখক TERI বিশ্ববিদ্যালয়ের SE4ALL-এর সমন্বয়কারী ও দূরশিক্ষার ডীন।
email : akumar@teri.res.in]

মানবসভ্যতা ও সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ওপর জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণের প্রভাব

বর্তমানে মানব সভ্যতার ওপর সবচেয়ে বড় বিপদের নাম জলবায়ু পরিবর্তন। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস মিশে ডেকে আনছে নানান বিপদ। পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বাড়ছে। এর জেরে বাড়ছে তাপপ্রবাহ, খরা, বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দাপাদাপি। বাড়ছে বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রকোপ। মার খাচ্ছে কৃষি উৎপাদন। তৈরি হচ্ছে খাদ্য সংকট। এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের কী ভূমিকা হওয়া উচিত? নতুন নতুন গবেষণা কি পারে পরিত্রাণের কোনও পথ দেখাতে? লিখেছেন **ড. জে এস পান্ডে।**

গত কয়েক দশক ধরে বিশ্ব জুড়ে কিংবা আঞ্চলিক বা স্থানীয় স্তরের জলবায়ুতে ক্রমাগত যে পরিবর্তন ঘটছে তা সবার কাছেই রীতিমতো উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ বিশেষ শহরাঞ্চল বা শিল্পাঞ্চলে যে আশপাশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে দিনে দিনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'হিট আইল্যান্ড এফেক্ট' বলা হয় তাও কিন্তু দুশ্চিন্তার আরও একটা বড় কারণ। মানুষের বিভিন্ন কাজকর্ম যেমন জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার, তথা শিল্প-বাণিজ্য ও গৃহস্থালির নানান কাজকর্মের দরুন মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস পরিবেশে মেশার ফলেই এই দশা। মানুষের এহেন কর্মকাণ্ডগুলো যে হারে বাড়ছে তাতে পরিবেশের মধ্যেই দূষণ প্রতিহত করার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে তা আর কাজ করছে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য তথা পরিবেশের ওপর বড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে। বর্তমানে যে ঘন ঘন তীব্র তাপপ্রবাহ দেখা দিচ্ছে তাতে মৃত্যুর ঘটনা, বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ও দরিদ্রদের মধ্যে মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে। এতে নানা ধরনের জলবাহিত ও জীবাণুবাহিত রোগব্যাধির আশঙ্কাও বাড়ছে। সবচেয়ে বড় কথা রোগ সংক্রমণের ধরনও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বদলে যাচ্ছে যার শিকার হচ্ছে মূলত শিশু, বয়স্ক এবং দরিদ্র জনসাধারণ (পান্ডে এবং অন্যান্য, ১৯৯২ বি-১৯৯৪; ২০০৫)।

আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহ

চিরাচরিত বায়ুদূষণের সঙ্গে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির ক্ষতিকর দিকগুলি যুক্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে একটা দুষ্টচক্র তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে অঞ্চল ভেদে এর প্রভাব অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে (পান্ডে এবং অন্যান্য, ১৯৯১)। আন্তর্জাতিকস্তরে সুসমন্বিত নানান প্রয়াসের মাধ্যমে এই ধরনের দুষ্টচক্রের প্রভাব মোকাবিলা অবশ্য করা হচ্ছে। এই সময় প্রয়াসের মধ্যে রয়েছে—রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক বায়ুদূষণ কর্মসূচি প্রশাসন বা স্টেট অ্যান্ড টেরিটোরিয়াল এয়ার পলিউশন প্রোগ্রাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (STAPPA) এবং স্থানীয় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মী সংগঠন বা অ্যাসোসিয়েশন অফ লোকাল এয়ার পলিউশন কনট্রোল অফিশিয়ালস (ALAPCO)। একই সঙ্গে চিরাচরিত বায়ুদূষণ ও গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির নির্গমন হ্রাসের কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে এই সংস্থাগুলির একটি সুসংগঠিত কর্মসূচির খসড়া বা মেনু অফ হারমোনাইজড অপশনস (MHO) তৈরি করেছে। যে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলিকে নিয়ে প্রধান দুশ্চিন্তা তার মধ্যে রয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রো-ফ্লুরোকার্বন, পার-ফ্লুরোকার্বন এবং সালফার হেক্সাফ্লুওরাইড। বায়ুমণ্ডলের ট্রোপোস্ফিয়ারে যদি ওজোন তৈরি হয় তখন সেই ট্রোপোস্ফেরিক ওজোনকেও কিন্তু গ্রিনহাউস গ্যাস বলেই গণ্য করা হবে। এছাড়া NO_x এবং মিথেন ছাড়া বিভিন্ন উদ্বায়ী জৈব যৌগ বা NMVOC-ও কিন্তু পরোক্ষভাবে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

কার্বন ও ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিকর প্রভাবগুলি মোকাবিলায় পুরোপুরি তৈরি থাকার জন্য প্রথমেই প্রতিটি শিল্প, বাণিজ্য, গৃহস্থালি সংক্রান্ত কাজকর্মের ফলে কতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে মিশছে (কার্বন ফুটপ্রিন্ট) এবং প্রাকৃতিক সহায় সম্পদই বা কতটা নিঃশেষিত হচ্ছে (ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট) তার একটা যথাযথ পরিমাপ করা অত্যন্ত জরুরি (পান্ডে এবং অন্যান্য, ২০০১ বি, পান্ডে ২০১০)।

পরিবেশের ওপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়নে বর্তমানে এই কার্বন ফুটপ্রিন্ট এবং ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট সবচেয়ে

কার্যকরী হাতিয়ার মার্কিন এনভাইরন মেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি (US-EPA) এবং ওয়াটার ইউটিলিটি ক্লাইমেট অ্যালায়েন্স-এর মতো সংস্থাগুলি কার্বন ফুটপ্রিন্ট এবং ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট পরিমাপ ও বিশ্লেষণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে।

ছবিতে একটি উদাহরণ তুলে ধরা হল (চিত্র-১)—

চিত্র-১
কাগজ শিল্পের উদাহরণ

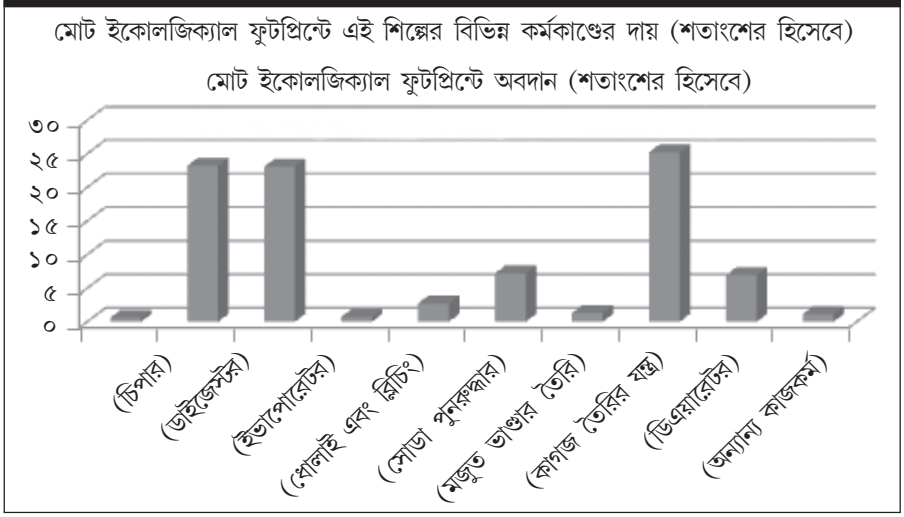

আন্তঃবিভাগীয় ও সুসংহত কর্ম পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলি মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়েই একটি আন্তঃবিভাগীয় (মাল্টি ডিসিপ্লিনারি) এবং সুসংহত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। সেই সঙ্গে স্থানীয় ও আঞ্চলিক স্তরে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির সঙ্গে প্রথাগত দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থগুলির সংমিশ্রণের পাশাপাশি বিকিরণ, কার্বন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস, বৃষ্টিপাত চক্রের (হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল) সম্পর্ক অনুসন্ধানের একটা এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যাতে এই ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সহজেই আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক তথা স্থানীয় স্তরে জলবায়ু পরিবর্তনের একটা সামগ্রিক প্রভাব পরিমাপ করা যায় (পান্ডে এবং অন্যান্য ১৯৯১, ১৯৯৫, ১৯৯৭-৯৮, ২০১৩)।

বাস্তুতন্ত্র ও জনস্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বায়ু, জল ও মৃত্তিকা দূষণের সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনও বাস্তুতন্ত্র ও জনস্বাস্থ্যের ওপর মস্ত বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘন ঘন তাপপ্রবাহ, বন্যা, খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলির জন্য মূলত জলবায়ু পরিবর্তনই দায়ী। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি আবার নানান রোগব্যাধি ডেকে আনছে এবং সেই সঙ্গে বিশেষ কিছু প্রজাতির জীবাণুবাহিত রোগের শিকার হয়ে মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু বা ডায়রিয়ার মতো সাধারণ জীবাণুবাহিত রোগের প্রকোপও বাড়ছে। তবে মাত্রার বিচারে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে গবেষকদের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে সেগুলি হল—

- বাস্তুতন্ত্র ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট ও কার্বন ফুটপ্রিন্টের কার্যকারণ সম্পর্ক ও প্রভাবগুলিকে চিহ্নিত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির মূল্যায়ন এবং তার মোকাবিলায় কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনসাধারণের ওপর কী কী বিপদ আসতে পারে তার পাশাপাশি এই পরিবর্তনের সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে এর পর্যালোচনা।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব কমানো এবং তা মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা রচনা, পর্যালোচনা ও তা গ্রহণ।

বাস্তুতন্ত্র ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বায়ু, জল এবং মাটির মাধ্যমে দূষিত পদার্থ কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন দূষিত পদার্থের মধ্যে থাকা ক্ষতিকর রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসার ফলে বা বিভিন্ন ওষুধপত্রের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানবশরীর কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার পর্যালোচনাও অত্যন্ত জরুরি (পান্ডে এবং অন্যান্য ২০০১এ, ২০০৫)।

সামগ্রিক প্রভাব পরিমাপ করার কাজ সহজ নয়

জলবায়ু পরিবর্তনের সামগ্রিক এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিভিন্ন প্রভাব অঙ্কের হিসাবে পরিমাপ করার কাজটা মোটেও সহজ নয়। এ কাজে অনেক বাধা এবং অনিশ্চয়তা রয়েছে। প্রথমত একটি স্কেল বা মানদণ্ড নির্ধারণ, দ্বিতীয়ত 'ঝুঁকি'র সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং সেই সঙ্গে জটিল ও পরোক্ষ কর্মপ্রণালীগুলিকে ব্যাখ্যার কাজটা অত্যন্ত কঠিন। এই সমস্ত জটিলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক অতীত ও বর্তমানের সাক্ষ্য প্রমাণ ও তথ্যের ভিত্তিতে কাজটা শুরু করা যেতে পারে। এই কাজটা শুরু করা গেলে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কী পড়তে পারে তা নিরূপণের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। মোদ্দা কথাটা হল এখন যত দ্রুত সম্ভব জল ও জনস্বাস্থ্যের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা তুলে ধরতে হবে এবং সেইসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাথমিক

প্রভাবগুলি প্রমাণ পেশ করার পাশাপাশি কোন পরিস্থিতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কী প্রভাব পড়তে পারে তার পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিভিন্ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর বিভিন্ন পরিকল্পনার লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণের কাজ এখন থেকেই শুরু করতে হবে।

জলবায়ু ঘটিত পরিবেশ দূষণের সমস্যার মোকাবিলায় নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক এবং বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরির প্রয়োগ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডগুলি নিয়মিত জারি রাখতে হবে। প্রয়োজনে নিয়মিত এগুলিকে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতেও হবে। (পান্ডে এবং অন্যান্য ২০০২-২০০৬)।

যে প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা জরুরি

- বিভিন্ন ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্র, পরিবহণ, শিল্প, বাণিজ্য, গৃহস্থালি, কৃষি, বনসৃজন ও বনসংরক্ষণ, মৎস্যচাষ) দায় কতখানি।
- সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি থেকে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
- গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ বেড়েছে তা স্থির করার মাপকাঠিগুলি কী কী এবং কীভাবে এই ক্ষতিকর গ্যাসগুলির নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে?
- এজন্য কী কী নীতি ও নিয়মবিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন?

এই বিষয়গুলি প্রধানত পরিবেশের প্রধান তিনটি উপাদান যথা জল, বায়ু ও মাটির পারস্পরিক সম্পর্ক আদান ও প্রদানের ওপর নির্ভর করে। যেমন শহরগুলিতে বায়ুদূষণের ফলে যে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় তার ফলে জলের উৎসগুলি দূষিত হয়ে পড়ে। এই বিষয়টির তাৎপর্য কিন্তু অনেক গভীর। কারণ এর ফলে সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলই বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে (পান্ডে এবং অন্যান্য, ২০০১এ)।

পরিবেশে দূষণ সৃষ্টিকারী অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মিলিত প্রভাব যোগ হলে জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রও (বায়ো-জিওকেমিক্যাল সাইক্লিং) বিপর্যস্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যেমন কার্বন, জল, নাইট্রোজেন, সালফার এবং ফসফরাস চক্রে অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসতে পারে, কিংবা সংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের মাটি, বায়ু বা জলে কোনও ক্ষতিকর ধাতু জমা হতে পারে, মানুষের শরীর স্বাস্থ্য ও জীবিকার ওপর যার প্রভাব হতে পারে মারাত্মক।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানান প্রভাবের ফলে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত মার খাচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করা যাচ্ছে না। আর সেইসঙ্গে, ঘরের বাইরে এবং ভেতরেও দূষণ ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাড়ির ভেতরে যাঁরা থাকেন তাঁরাও আজ দূষণজনিত নানান বিপদের সম্মুখীন।

এই মুহূর্তে পরিবেশ সংক্রান্ত যে বিষয়গুলির ওপর অবিলম্বে নজর দিয়ে আশু সমাধানের পথ খোঁজা উচিত তার মধ্যে রয়েছে পরিবেশে জলের চাহিদা (পান্ডে এবং অন্যান্য, ২০০৬), জলাভূমিগুলিতে পুষ্টি উপাদানের সংস্থান (পান্ডে এবং অন্যান্য ১৯৯৭) তথা দূষণ নিবারক/দূষণ হ্রাসকারী হিসাবে এগুলির ভূমিকা (পান্ডে এবং অন্যান্য, ২০০৪এ), কার্বন এবং ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট (পান্ডে এবং অন্যান্য, ২০০১বি; পান্ডে, ২০১০) এবং বাস্তুতন্ত্রের ওপর ঝুঁকির মূল্যায়ন (পান্ডে এবং অন্যান্য, ২০০১এ) তথা 'প্ল্যান্ট ফাংশন টাইপ' (PFT) [পান্ডে এবং খান্না, ১৯৯০] এবং বাস্তুতন্ত্রের অর্থনৈতিক দিকগুলির রূপরেখা তৈরি (পান্ডে এবং অন্যান্য, ২০০৪) ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তন, বাস্তুতন্ত্র এবং ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং

জৈব ভূ-রাসায়নিক (বায়ো জিও-কেমিক্যাল) চক্রের পরিবর্তন এবং তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিবর্তনের মধ্যে ক্রমাগত একটা পারস্পরিক ক্রিয়া বা আদান-প্রদান (ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ই) চলতেই থাকে। জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র এবং এই চক্রে পরিবর্তনের সঙ্গে নানান ধরনের প্রাকৃতিক, রাসায়নিক, জৈব প্রক্রিয়া জড়িত থাকে এবং এই সমস্ত প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা। তাই পরিবেশের সহন ক্ষমতা যাতে সীমা অতিক্রম না করে যায় তা নিশ্চিত করতে গেলে জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রের এই পরিবর্তনকে যথাসম্ভব কমানোর দিকে মনোযোগ দেওয়াটাই হবে সবচেয়ে কার্যকরী উপায়।

এই প্রসঙ্গেই বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য হালহকিকত পর্যালোচনা বা 'ইকোসিস্টেম হেল্‌থ অ্যাসেসমেন্ট' নামক বিষয়টির অবতারণা। ঠিক যেমন মানুষের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় ঠিক তেমনিভাবেই এই বিষয়টিতে পরিবেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রভাব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। মানবশরীরে স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটলে, বা দেহের কলকবজাগুলো ঠিকমতো কাজকর্ম না করলে দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তন দেখে যেমন তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়; ঠিক তেমনিভাবেই সংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রের কোনও অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটলেও তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিবর্তনের ধরন দেখেই তার আঁচ পাওয়া যায়।

কোনও বাস্তুতন্ত্রের কাজকর্মের ধরনকে যদি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এর সঙ্গে ইলেকট্রনিক (ইন্টিগ্রেটেড) সার্কিটের অনেক মিল রয়েছে। এর কোনও অংশ অ্যামপ্লিফায়ার, কোনও অংশ অসিলেটর, কোনও অংশ আবার ক্যাপাসিটর, আবার কোনও অংশ ইনডাকটার, কোনও অংশ বা রেজিস্টারের মতো কাজ করে এবং বস্তু, বিদ্যুৎ (শক্তি), তথ্যের বিনিময়ের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক [বা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক] দুটি দিকই থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ সংক্রান্ত পরিষেবা

এবার প্রশ্নটা উঠছে পরিবেশে প্রাপ্ত জল ও কৃষিক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদনের প্রসঙ্গে। কারণ দুটি ক্ষেত্রের সামনে বড় বিপদ। আগামীদিনে চাষাবাদের উপযোগী প্রয়োজনীয় মিষ্টি জল পাওয়া যাবে কি না সেটাও একটা বড় প্রশ্ন বটে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং জমি ব্যবহারের ধরন দিনে দিনে বদলে যাওয়ায় বর্তমানে বাস্তুতন্ত্রের ওপর যে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে তাতে অচিরেই হয়তো মুখ থুবড়ে পড়বে মানব সভ্যতা। ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে বিচক্ষণতার সঙ্গে জমি ও জলের ব্যবহার করতে হবে। আর সেই সঙ্গে মানবসভ্যতার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য আলাদা করে আনুপাতিক হারে এই সীমিত সম্পদগুলিকে ভাগ করে দিতে হবে। ঠিক এই কারণেই দীর্ঘমেয়াদি নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। কারণ বিষয়টি শুধু কারিগরি ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবেশগত তথা আর্থ-সামাজিক বিচারেও বিষয়টির বিরাট তাৎপর্য হয়েছে এবং বিষয়টি রূপায়ণের জন্য আন্তঃবিভাগীয় (মাল্টি ডিসিপ্লিনারি) ও সুসংহত পদক্ষেপের প্রয়োজন।

বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র

বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু মানবসভ্যতা টিকে রয়েছে এবং তার বিকাশ ঘটছে। তবে গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়েই নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয়েছে। বনাঞ্চল ধ্বংসের পরিণামে ক্ষয়ক্ষতির লক্ষণগুলি তো দেখা দিয়েইছে, সেইসঙ্গে গাছগাছড়ার শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত (গ্রিনহাউস গ্যাসসহ দূষণ সৃষ্টিকারী অন্যান্য পদার্থ) বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। বিশেষ করে বায়ুদূষণ সৃষ্টিকারী অন্যান্য অতিরিক্ত পদার্থের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের ট্রোপোস্ফিয়ারে সৃষ্টি হওয়া ওজোন মিলেমিশে গাছ-গাছড়ার দীর্ঘস্থায়ী শারীরবৃত্তীয় ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি জৈব-রাসায়নিক বিপর্যয়ও ঘটাচ্ছে। এর ফলেই মূলত বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য কিছু পরামর্শ

- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য বা হালহকিকত এবং পরিবেশের ওপর এই প্রভাব মূল্যায়নের ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিশেষ প্রকল্প/কর্মসূচিকে বেছে নিতে হবে।
- দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে কিছু কিছু স্বল্পমেয়াদি এমন সব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজন মেটানো যায়। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কাজে যাতে বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো যায় এখানে তা সবার আগে সুনিশ্চিত করতে হবে।
- যে উদ্যোগগুলি নেওয়া হবে তা যেন নীতিগত প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। প্রাথমিকভাবে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরে মূল নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করাই হবে এই ধরনের উদ্যোগের লক্ষ্য।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বোঝাপড়া ও যোগাযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, তথ্যের আদানপ্রদান ও সচেতনতা প্রসারেরও বিরাট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- বৈজ্ঞানিক কৌশলগুলি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতীয়/আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা এক্ষেত্রে অনেকাংশে সাহায্য করবে।
- গবেষণার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে বা নীতিগত সিদ্ধান্ত ও চালু ধারার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যেতে তহবিল সংগ্রহের জন্য একটি সুসমন্বিত প্রচেষ্টাও জারি রাখতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্ভাবনমূলক গবেষণা কর্মের ওপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া যেতে পারে—

- ইকোলজিক্যাল এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট পরিমাপের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত নিরীক্ষণ বা 'এনভাইরনমেন্টাল অডিটিং' এর নতুন পদ্ধতি।
- পরিবেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন বা 'এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট' (EIA) পদ্ধতিকে দ্রুততর করার জন্য নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত প্রযুক্তি পদ্ধতি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের মূল্যায়ন।
- পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতার মেলবন্ধন।
- খণ্ড খণ্ড ভাবে না দেখে দীর্ঘমেয়াদিভাবে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তার জন্য একটি সুসংহত ও সুসমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি।
- শহরের পার্শ্ববর্তী পরিবেশগত দিক থেকে স্পর্শকাতর এলাকাগুলির জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা তৈরি যাতে একইসঙ্গে শহর ও গ্রামাঞ্চলের পরিবেশগত সমস্যাগুলির সমাধান করা যায়।

গবেষণা ব্যবস্থাপনা

যে ব্যবস্থাগুলির কথা এতক্ষণ বলা হল তার জন্য আন্তঃবিভাগীয় স্তরে (মাল্টিডিসিপ্লিনারি) বেশ কিছু গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (আর অ্যান্ড ডি) উদ্যোগের

প্রয়োজন। ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট বিষয়ক উদ্যোগগুলিকে সরাসরি শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র, আবাসনক্ষেত্র ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই যুক্ত করা উচিত। কারণ, কিছু নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড কিছু নির্দিষ্ট পণ্য ও কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই এই ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই এই ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট ও কার্বন ফুটপ্রিন্টের ওপর ভিত্তি করেই 'সুনির্দিষ্ট পরিবেশ ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা' (রেজোলিউট এনভাইরনমেন্টাল প্ল্যান্ট) রচনা করতে হবে। পরিবেশ রক্ষার এই পরিকল্পনার প্রভাব অনেক বেশি কার্যকরী হবে বলেই আশা। আর পরিবেশ রক্ষা পেলে সুস্থ থাকবে মানুষ। দীর্ঘস্থায়ী হবে মানবসভ্যতা। ❑

[লেখক CSIR-NEERI-তে অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইনোভেটিভ রিসার্চ-এর প্রধান বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রোগ্রাম-এর প্রধান।

email : jaispandey@rediffmail.com]

সহায়ক সূত্র :

Pandey, J.S., Moghe, S. and Khanna, P. 1991. *Green House Gases, Environmental Stress and Ecological Analysis.* IGBP Report No. 18 : 2, 1991, p. 103-108.

Pandey, J.S. and Khanna, P. 1992a. *Speed-Dependent Modeling of Ecosystem Exposures from Vehicles in the Near-Road Environment.* Journal of Environmental Systems 21 (2) : 185-192.

Pandey, J.S., Pimparkar, S. and Khanna, P. 1992b. *Micro-Environmental Zones and Occupancy Factors in Jharia Coal-Field : PAH-Health Exposure Assessment.* Journal of Environmental Systems 21 (4) : 349-356.

Pandey, J.S., Pimparkar, S. and Khanna, P. 1993. *Health Exposure Assessment and Policy Analysis.* International Journal of Environmental Health Research 3 : 161-170.

Pandey, J.S., Mude, S. and Khanna, P. 1994. *Comparing Indoor Air Pollution Health Risks in India and United States.* Journal of Environmental Systems 23 (2) : 179-194.

Pandey, J.S. and Khanna, P. 1995. *Development of Plant Function Types for Studying Impact of Green House Gases on Terrestrial Ecosystems.* Journal of Environmental Systems 23 (1) : 67-82.

Pandey, J.S., Deb, S.C. and Khanna, P. 1997. *Issues Related to Greenhouse Effect, Productivity Modelling and Nutrient Cycling : A Case Study of Indian Wetlands.* Environmental Management 21(2) : 219-224.

Pandey, J.S. and Khanna, P. 1998. *Sensitivity Analysis of a Mangrove Ecosystem Model.* Journal of Environmental Systems 26(1) : 57-72.

Pandey, J.S. and Joseph, V. 2001a. *A Scavenging-Dependent Air-Basin Ecological Risk Assessment (SABERA) - Model Applied to Acid Rain Impact around Delhi City, India.* Journal of Environmental Systems 28(3) : 193-202.

Pandey, J.S., Khan, S., Joseph, V. and Singh, R.N. 2001b. *Development of a Dynamic and Predictive Model for Ecological Footprinting (EF).* Journal of Environmental Systems 28 (4) : 279-291.

Pandey, J.S., Khan, S. and Khanna, P. 2001c. *Modeling and Quantification of Temporal Risk Gradients (TRG) for Traffic Zones of Delhi City in India.* Journal of Environmental Systems 28(1) : 55-69.

Pandey, J.S., Khan, S., Joseph, V. and Kumar, R. 2002. *Aerosol Scavenging : Model Application and Sensitivity Analysis in the Indian Context.* Environmental Monitoring and Assessment 74 : 105-116.

Pandey, J.S., Joseph, V. , Shanker, R. and Singh, R.N. 2004a. *Modeling the Role of Phytoremediation in Mitigating Groundwater Contamination in India.* Journal of Environmental Systems 30 (3) : 177-189

Pandey, J.S., Joseph, V. and Kaul, S.N. 2004b. *A Zone-wise Ecological-Economic Analysis of Indian Wetlands.* Environmental Monitoring and Assessment 98 : 261-273.

Pandey, J.S., Kumar, R. and Devotta, S. 2005. *Health Risks of NO_2, SPM and SO_2 in Delhi (India).* Atmospheric Environment 39 : 6868-6874.

Pandey Jai S. and Devotta, S. 2006. *Assessment of Environmental Water Demands (EWD) of Forests for Two Distinct Indian Ecosystems.* Environmental Management 37 (1) : 141-152.

Pandey, J.S., Wate, S.R. and Devotta, S. 2007. *Development of Emission Factors for GHGs and Associated Uncertainties.* PROCEEDINGS : 2nd International Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories. International Institute for Applied Systems Analysis, A-2361 Laxenburg, Austria, 27-28 September, 2007.

Pandey, J.S. 2010. Development of Ecosystem-specific Direct Emission Factors (DEF) for Estimating Carbon and Ecological Footprints (CF&EF). In "Climate Change, Global Warming and NE India : Regional Perspectives (Eds. : Borthakur, S.K., Sharma, R.K., Sharma, G.K. and Barbhuiya, A.H.), ERD Foundation, Guwahati, pp. 59-65.

Pandey, J.S. 2013. "Synergistic Impacts of Climate Change and Environmental Pollution : Studies Required for Impact Minimization and Environmental Management". "Climate Change Impacts on Water Resource Systems" (Ed. Shete, D.T.), Excel India Publishers, New Delhi, India, pp. 112-118.

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ও ভারতীয় প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ নিয়ে চিন্তিত সারা বিশ্ব। এর মোকাবিলায় পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিকল্পনা থাকা একান্ত আবশ্যক। ভারতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কাঠামো, বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি, এর সার্বিক উন্নয়নের দিশা-সহ সামগ্রিক চালচিত্র ধরা পড়েছে **ড. অনিল কুমার গুপ্তা***-র এই নিবন্ধে।*

জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের উন্নয়নের পথে এক বড় প্রতিবন্ধকতা। এর ফলে দু'ভাবে মানুষের ক্ষতি হয়। একদিকে বন্যা, খরা, তাপপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়, বিধ্বংসী ঝড়ের মতো জল-আবহগত বিপর্যয়ের সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়ে। অন্যদিকে বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় ও পরিবর্তনের ফলে খাদ্য উৎপাদন ও জলের সরবরাহ কমে, মানুষের জীবনযাত্রার ওপর পড়ে নেতিবাচক প্রভাব। প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের সামনে আরও অসহায় হয়ে পড়ে গোটা সমাজ। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এর মাত্রা আরও বেশি, কেননা এখানে কৃষি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক ভিত্তিভূমি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস প্রভৃতির মতো ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয়ের থেকেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের অভিঘাত অনেক বেশি।

বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে বৈজ্ঞানিক সচেতনতার সূত্রপাত ১৯৮০ দশকে বা তারও আগে থেকে। এর পরই এই বিষয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। আমার মনে পড়ে, ১৯৮৯ সালের আগস্টে মধ্য ভারতে পরিবেশগত বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম। হিমবাহ গলন, ভয়াল বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও মহামারীর আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল ওই সম্মেলনে। কিন্তু তখনও বিজ্ঞানীমহলে এ নিয়ে তেমন সাড়া পড়েনি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল IPCC মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় দ্বিতীয় যুগান্তকারী পরিবর্তন

২০০৭ সালে IPCC-র চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর পরই বিষয়টি বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক স্বীকৃতি পায়। একেই আমরা দ্বিতীয় যুগান্তকারী পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করছি। এতে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। এগুলি হল—(১) বিপর্যয় ও ঝুঁকির মোকাবিলা। (২) মানুষের অসহায় অবস্থা দূর করা এবং (৩) পরিবেশ জ্ঞানসমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথম যুগান্তকারী পরিবর্তন ছিল বিপর্যয়ের পর 'গৃহীত ব্যবস্থা ও ত্রাণ' থেকে 'প্রতিরোধ ও প্রস্তুতি'-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তরণ।

অর্থনীতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাও এখন বিশ্বজুড়ে এক রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে। পরিবেশগত পরিবর্তনের তিনটি দিক আছে। জলবায়ু পরিবর্তন, জমির ব্যবহারে পরিবর্তন এবং বাস্তুতন্ত্রে পরিবর্তন। এগুলির জেরে বিপদের আশঙ্কা ও ঝুঁকি ক্রমশই বাড়ছে। বাস্তুতন্ত্র ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার কার্যপ্রণালীরও পরিবর্তন ঘটছে। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯, রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় হ্রাস দশকে বিপর্যয় মোকাবিলায় কারিগরি কৌশলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ২০০৫-২০১৫, হিয়োগো কর্মপরিকাঠামোয় গুরুত্ব দেওয়া হয় আর্থ-সামাজিকগোষ্ঠী-ভিত্তিক অসহায়তা দূর করার ওপর। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় প্রস্তুতিকে। সুরক্ষিত পৃথিবীর লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের বিশ্ব সম্মেলনে ইয়োকোহামা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনায়

চিত্র-১
এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়।

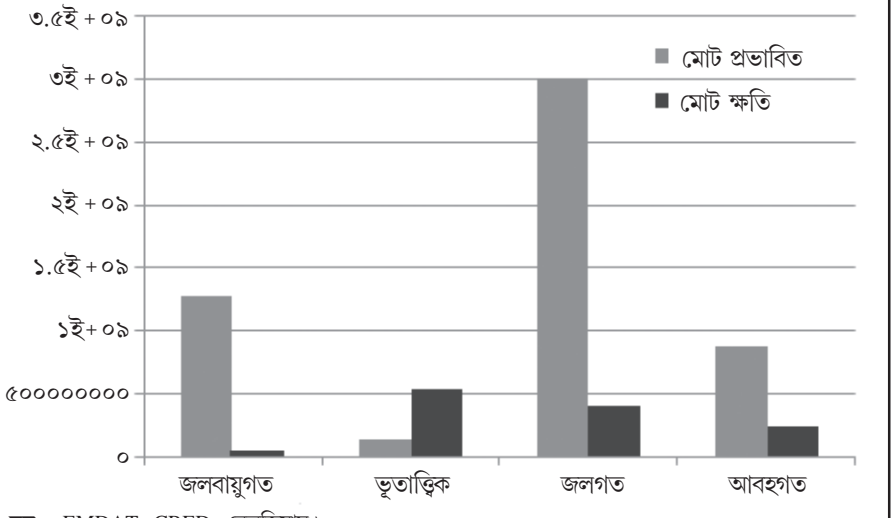

সূত্র : EMDAT, CRED, বেলজিয়াম।

স্পষ্টতই বিপর্যয় হ্রাস ও সুস্থিত উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বীকার করে নেওয়া হয়। হিয়োগো কর্মপরিকাঠামোর পর্যালোচনায় একে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় বিপর্যয়ের ঝুঁকি ও অসহায়তার অন্তর্নিহিত কারণগুলি অনুসন্ধানের জন্য।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শুধু নানাবিধ সমস্যাতেই সীমায়িত নয়, অসহায়তা এবং ঝুঁকি বহনের ক্ষমতার ওপরেও এর প্রভাব পড়ে (সারণি-২)। এজন্যই জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি ব্যাঙ্কক ঘোষণা এবং এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপাদান নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৪ সালের জুন মাসে থাইল্যান্ডে ষষ্ঠ এশীয় মন্ত্রীস্তরীয় সম্মেলনে এটি গৃহীত হয়। ২০১৫ সালের বিশ্ব সম্মেলনের ফল হিসাবে এই সংযুক্তিকরণের বিষয়টি ২০১৫ থেকে ২০৩০ সময়কালের জন্য সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশানেও স্পষ্টভাবে উল্লেখিত।

জলবায়ুগত বিপর্যয়ের বিপদ

আগেই বলা হয়েছে, ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয়ের থেকেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের সংখ্যা ও অভিঘাত অনেক বেশি। এর আভাস প্রথম পাওয়া গিয়েছিল মুম্বই-এর শহরাঞ্চলে বিধ্বংসী বন্যায়। পরে ঢাকা, ইসলামাবাদ, সুরাট, ভোপাল, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, দিল্লি, হায়দরাবাদের মতো বহু এশীয় শহরে এই ধরনের বিপর্যয় দেখা যায়। ফাইলিন, হুদহুদের মতো একের পর এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ভারতীয় উপকূলভাগে আছড়ে পড়ে। ভারতের পাশাপাশি অন্য দেশগুলিও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি। উত্তরাখণ্ড ও কাশ্মীরের ভয়াবহ বন্যা, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের তীব্র তাপপ্রবাহ, খরাপ্রবণ অঞ্চলের এলাকা প্রতি বছর বাড়তে থাকার মতো নানা ঘটনা এর মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কৌশলগতগোষ্ঠীগুলিকে আরও কাছে আনে। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির অধিকাংশই অনুন্নত বা উন্নয়নশীল। তাই এই ধরনের বিপর্যয় কেবল তাদের ভূমি ও জলবায়ুর ওপরেই প্রভাব ফেলে না, ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর্থ-সামাজিক সম্পদও। থ্যাইল্যান্ড ও মায়ানমারে সাম্প্রতিক বন্যায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে সেখানকার জন পরিকাঠামো, বাস্তুতন্ত্র, জীবিকা

সারণি-১

প্রেক্ষাপট-১ : তাপমাত্রা ও দুর্যোগের পরিলক্ষিত পরিবর্তন, ১৯৫০ থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় শুষ্কভাব, ভিত্তিকাল ১৯৬১-১৯৯০

প্রেক্ষাপট-২ : তাপমাত্রা ও দুর্যোগের এবং দক্ষিণ এশিয়ার শুষ্কভাবের সম্ভাব্য পরিবর্তন। সময়কাল ২০৭১-২১০০ (১৯৬১-১৯৯০ সময়কালের তুলনায়) অথবা ২০৮০-২১০০ (১৯৮০-২০০০ সময়কালের তুলনায়)

প্রেক্ষাপট	তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রবণতা (উষ্ণ এবং শীতল দিন)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রবণতা (উষ্ণ এবং শীতল রাত)	তাপপ্রবাহ ও খরার প্রবণতা	প্রবল বর্ষণের প্রবণতা (বৃষ্টি, তুষারপাত)	শুষ্কতা ও খরার প্রবণতা
১	উষ্ণ দিনের সংখ্যাবৃদ্ধি (উষ্ণ দিনের সংখ্যা কম)	উষ্ণ রাতের সংখ্যাবৃদ্ধি (উষ্ণ রাতের সংখ্যা হ্রাস)	পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব	ভারতে মিশ্র সংকেত	অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংকেত
২	উষ্ণ দিনের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা (শীতল দিনের সংখ্যা হ্রাস)	উষ্ণ রাতের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা (শীতল রাতের সংখ্যা হ্রাস)	তাপপ্রবাহ আরও ঘন ও আরও বেশি সময় ধরে চলার সম্ভাবনা	সামান্য বা অপরিবর্তিত % DP 10 সূচক দক্ষিণ এশিয়ায় বৃষ্টির পরিমাণ ও তীব্রতা বাড়ার সম্ভাবনা	অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন

সূত্র : গুপ্তা ও নায়ার ২০১২

সারণি-২

জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়, ক্ষতির আশঙ্কা এবং ত্রাণ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	জল-আবহ বিপর্যয়	বাস্তুগত বিপর্যয়	রাসায়নিক বিপর্যয়	ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয়	জৈব বিপর্যয়
বিপদ বৃদ্ধি	বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ, শৈত্যপ্রবাহ প্রভৃতি	বনাঞ্চলে আগুন, ভূমিধস, উপকূলের ক্ষয়, প্রজাতির বিলোপ প্রভৃতি	আগুন, বিস্ফোরণ, বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন, তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ প্রভৃতি	ভূমিকম্পের জেরে ভূমিধস, ভূমিক্ষয় প্রভৃতি	জীবাণুবাহিত, জলবাহিত মহামারী প্রভৃতি
ক্ষতির আশঙ্কা বৃদ্ধি	বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয়, প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষয়, আর্থ-সামাজিক দুর্বলতা	আর্দ্রতা হ্রাস, শুষ্ক ও উত্তপ্ত আবহাওয়া, গাছগাছালি কমে যাওয়া	নিরাপত্তা সংক্রান্ত সীমা-রেখার পরিবর্তন, কাজের ওপর জলবায়ুর প্রভাব বৃদ্ধি, পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন	ফসলের প্রকৃতিগত পরিবর্তন, হিমবাহ ও বরফের গলন, নিকাশি ব্যবস্থার পরিবর্তন	জলবায়ুগত জীবাণুর প্রকৃতি পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত পরিবর্তন
বিপর্যয়ের প্রভাব/ ত্রাণ	আশ্রয়, জলনিকাশি, বর্জ্য ও পরিবেশ-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়সমূহ, বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রভাব	মাটিদূষণ, জীবাণু ও রোগবৃদ্ধির ঝুঁকি, জীব-বৈচিত্র, নিকাশি ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রভাব	স্থানীয় আবহাওয়ার পরিবর্তন, বাস্তুতন্ত্র ও গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব	ভূপ্রাকৃতিক পরিবর্তন, বাস্তুতন্ত্র, ভূব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রভাব	আশ্রয়, জলনিকাশি, বর্জ্য ও পরিবেশ-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়সমূহ প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য মানব-সম্পদ ও মূলধনের অপচয়

ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর। নেপালে ২০১৫ সালের ভূমিকম্প ও একের পর এক আফটার শকে প্রভূত ভূমিধসের সঙ্গে সেখানকার বাস্তুতন্ত্রগত অবক্ষয় ঘটেছে। চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গুর মতো রোগ সংক্রমণের পিছনেও রয়েছে আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ুর ধরন পরিবর্তন।

ভারতের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে ২০১২ সালের ৫ জুন নতুন দিল্লিতে 'পরিবেশগত চরমতা—বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল এর প্রকাশক। (সারণি-১)। প্রতিবেদনের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, চরমভাবাপন্ন জলবায়ু মানুষের জীবন ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। এর জেরে অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যাহত হতে পারে পর্যটন, কৃষির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্র। নাগরিক জীবন ও ছোট দ্বীপরাষ্ট্রের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ওপর পড়তে পারে নেতিবাচক প্রভাব, জল, কৃষি, খাদ্য সুরক্ষা, বনসৃজন, স্বাস্থ্য, পর্যটনের মতো যেসব ক্ষেত্র জলবায়ুর ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, সেগুলিই সবথেকে বেশি ক্ষতির শিকার হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে বিপর্যয়ের পথ প্রশস্ত করে?

প্রথমত, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় গৃহীত নীতিগুলি ছিল প্রশমনমূলক ও ভূতাত্ত্বিক মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। এখন জোর দেওয়া হচ্ছে সুরক্ষাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেলের ২০১২ সালের জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে চরম অবস্থা ও বিপর্যয়ের ঝুঁকির মোকাবিলা নিয়ে বিশেষ রিপোর্টে এই কথাই বলা হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে মূল্যায়নের ভিত্তিতে 'বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস: পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে ঝুঁকি ও দারিদ্র' শীর্ষক ২০০৯ সালের রিপোর্টে বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয়কে প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০৬ সালে বিশ্ব ব্যাংক তাদের রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রভাব বিশেষত দরিদ্র মানুষের ওপর কীভাবে পড়বে তা ব্যাখ্যা করে। এর মধ্যে রয়েছে :

- শুষ্ক অঞ্চলে জলের জোগান ও মানের ক্রমহ্রাস
- বহু অঞ্চলে বন্যা ও খরার আশঙ্কা বৃদ্ধি
- পার্বত্য এলাকায় জলের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস
- জলবিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা হ্রাস
- ম্যালেরিয়া, কলেরার মতো জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব
- চরম আবহাওয়ার জন্য ক্ষতি ও মৃত্যুর হার বৃদ্ধি
- কৃষি উৎপাদনশীলতা হ্রাস, মৎস্যচাষের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব
- বাস্তুতন্ত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব

বিপর্যয়ের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক নয়। ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতিগত পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়ের মতো পরিবেশগত বিষয়গুলির সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। এছাড়া অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পগত কেন্দ্রায়ন, বন্যাপ্রবণ সমভূমি, ক্ষয়প্রবণ ঢাল, পাহাড়ি এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা, কৃষিক্ষেত্রে সমসংস্কৃতি, প্রথাগত সুরক্ষিত বাড়ির বদলে আধুনিক অথচ পলকা কাঠামোর আবাস নির্মাণ, প্রযুক্তির অভাব প্রভৃতি নানা বিষয় বিপর্যয়ের ঝুঁকির মাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। এই পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে নীচের ছবিতে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ত্রিস্তরীয়। বিপদকে চিহ্নিত করা, সুরক্ষার অভাব কমানো এবং দক্ষতা বৃদ্ধি। (প্রতিরোধ এবং আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য কার্যকর প্রস্তুতি) জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে একশো বছর অন্তর আসা বন্যা দশ বছর অন্তর আসতে থাকে, উপকূলীয় ঝড়ের দাপটে সমুদ্রে জলস্তর বাড়ে, ঘন ঘন শক্তিশালী সামুদ্রিক ঝড় আসে, বিধ্বংসী ঝড়ের সংখ্যা ও মাত্রা বৃদ্ধি পায়, দাবানল বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, খরার আশঙ্কা বাড়ে, কৃষকরা প্রতিকূল আবহাওয়ায় সমস্যায় পড়েন। মানুষ, সম্পত্তি, বাস্তুতন্ত্র, সম্পদ এবং সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড ক্ষতিকর পরিবেশের মধ্যে পড়লে তাকে সুরক্ষার অভাব বলা হয়। প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা না করতে পারা, সুরক্ষার অভাবের মধ্যে পড়ে।

মোকাবিলা বলতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা থেকে সহনশীলতা—সব কিছুকেই বোঝায়। মানিয়ে নেওয়ার অর্থ, ফলাফলের প্রতিক্রিয়া। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া হল 'প্রতিরোধ ও প্রস্তুতি'। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় এ এক নতুন ধাপ। (সারণি-৩)

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা হল ঝুঁকি কমাতে এবং বিপজ্জনক ঘটনার প্রভাব যতদূর সম্ভব কম করার লক্ষ্যে মানুষের যাবতীয় প্রচেষ্টা। এর বিভিন্ন 'কাঠামোগত' ও 'কাঠামো বহির্ভূত' দিক রয়েছে।

বিপর্যয়ের ঝুঁকি এবং তার ব্যবস্থাপনায় মোটামুটিভাবে চারটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

- ইঞ্জিনিয়ারিং নির্ভর কাঠামোগত ব্যবস্থা
- গোষ্ঠীভিত্তিক প্রস্তুতি নির্ভর ব্যবস্থা
- কেন্দ্রায়িত সমন্বয়ভিত্তিক নির্দেশ ব্যবস্থা (আপৎকালীন পরিস্থিতি)
- পরিবেশ নির্ভর সংযুক্ত ব্যবস্থা

সম্প্রতি বিশ্ব জুড়ে বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাসে বাস্তুতন্ত্র ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ রক্ষা ও ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অংশীদারিত্ব এবং বাস্তুতন্ত্র ভিত্তিক অভিযোজন এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবনযাত্রা স্বাভাবিকতায় ফেরাতে, খাদ্য সুরক্ষায়, স্বাস্থ্য সম্পদে এবং অন্যান্য বাস্তুতন্ত্র নির্ভর পরিষেবায় এর ফল মিলছে। এতে একদিকে অর্থনীতি জোরদার হচ্ছে, অন্যদিকে অসহায়তা কমছে।

আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় প্রতিরোধ, মোকাবিলা, প্রস্তুতি, পুনর্বাসন, পুনর্গঠন সহ সবদিকেই খেয়াল রাখা হয়েছে। এর মধ্যে আছে :

- কার্যকর পরিকল্পনা, তার প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের জন্য কারিগরি আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন

সারণি-৩
মানিয়ে নেওয়ার উপাদান, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

ক) বিপজ্জনক ঘটনা ঘটার ঝুঁকি কমানো	১। বিপদ প্রতিরোধ	২। মানিয়ে নেওয়া (অভিযোজন)	৩। নিয়ন্ত্রণ
খ) বিপজ্জনক ঘটনার মুখোমুখি হওয়া এড়ানো	১। এড়িয়ে যাওয়া/ অভিবাসন	২। সয়ে যাওয়া	৩। প্রভাব নিয়ন্ত্রণ
গ) ধারণের ক্ষমতা	১। ক্ষতি আটকানো	২। লোকসান আটকানো	৩। দ্রুত স্বাভাবিকতায় ফেরা

চিত্র-২
আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক

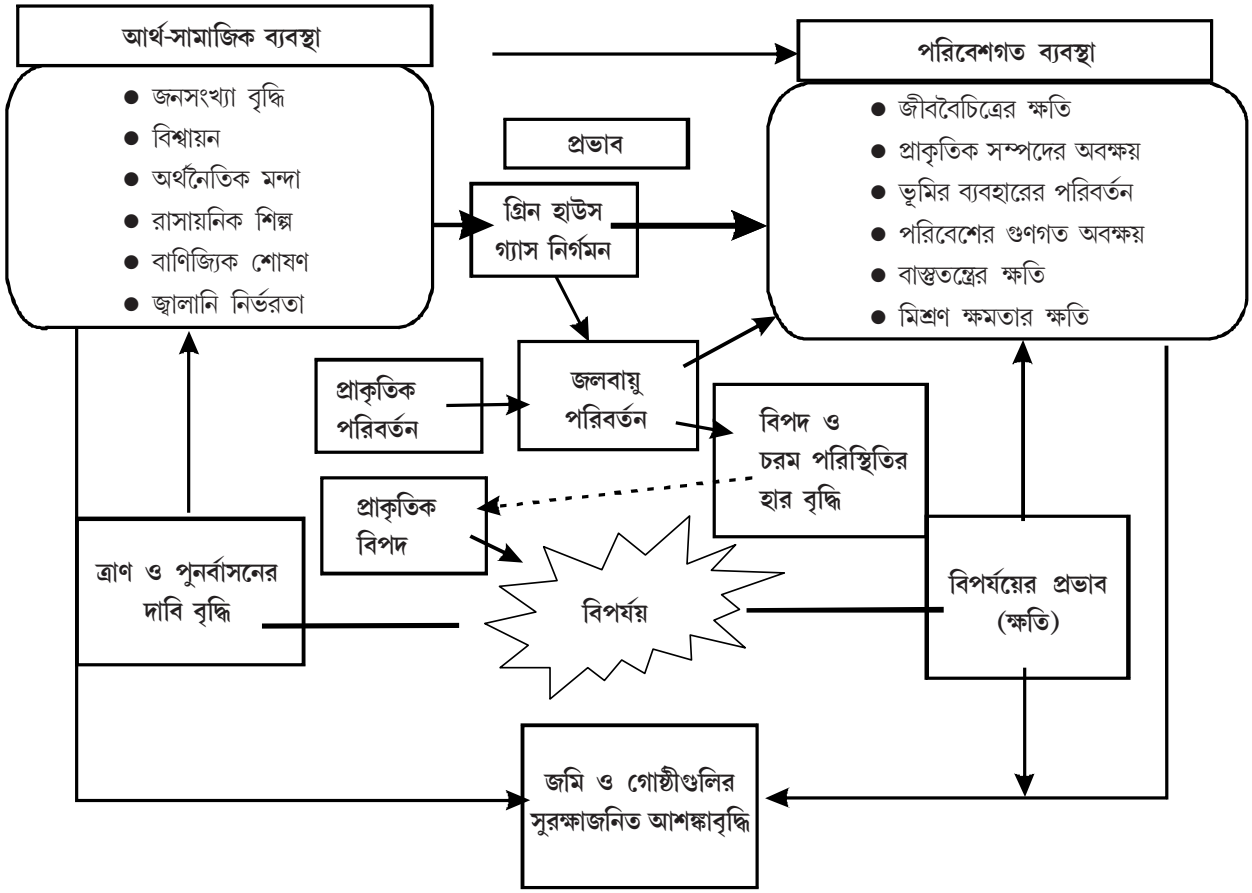

- বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নানা প্রকল্পের মাধ্যমে এর প্রয়োগ
- বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করে একে সার্বিক চেহারা দেওয়া। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এর আওতার মধ্যে আনা।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাকে একটি সার্বিক সংহত রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে মায়ানমার, কাম্বোডিয়া, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশের মতো এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ছোট ছোট দেশগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই সব এলাকায় বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের শরিক করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্র, সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে।

প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশের গুণমান রক্ষা এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের দিকে লক্ষ রেখে পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মানবসম্পদগত যে তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল—(১) পরিকাঠামো ও শিল্প, (২) পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং (৩) সামাজিক কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক পরিষেবা। এ সংক্রান্ত আইনগুলি বিপর্যয়ের মোকাবিলা, অসহায়তার বোধ কমানো এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশগত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন আমরা খতিয়ে দেখেছি।

বিপর্যয় মোকাবিলা—কয়েকটি উদাহরণ

বিশ্ব জুড়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় নানা প্রয়াস চলছে। ভারতে বিপর্যয় সংক্রান্ত আইনে পরিবেশকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ফলে এক্ষেত্রে সংহতি সাধনের সুযোগ রয়েই গেছে। ২০০৫ সালের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইনে বিপর্যয়ের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা হল—'কোনও অঞ্চলে প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ঘটনা, যার জেরে প্রাণহানি বা ক্ষতি বা লোকসান বা সম্পত্তিহানি হয়, অথবা পরিবেশের মানের অবনমন ঘটে। এই ক্ষতি এমন প্রকৃতি বা মাত্রার, যা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দাদের সহনক্ষমতার বাইরে।' আইন ছাড়াও ভারতে বেশ কিছু নীতি আছে, যা বিপর্যয় মোকাবিলা ও পরিবেশ রক্ষার মধ্যে সংহতি সাধন করে। এগুলি হল—

- জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০০৬
- জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯
- জাতীয় জল নীতি ২০০২ (সংশোধিত ২০১২)
- জাতীয় অরণ্য নীতি
- জাতীয় নগর নিকাশি নীতি
- জাতীয় কৃষি নীতি
- জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি (খসড়া/বকেয়া)
- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কৌশল (জাতীয় কর্মপরিকল্পনা)

কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা নীচে বলা হল—

- **বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা :**

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারগুলির

চিত্র-৩
প্রস্তাবিত জাতীয় কাঠামো

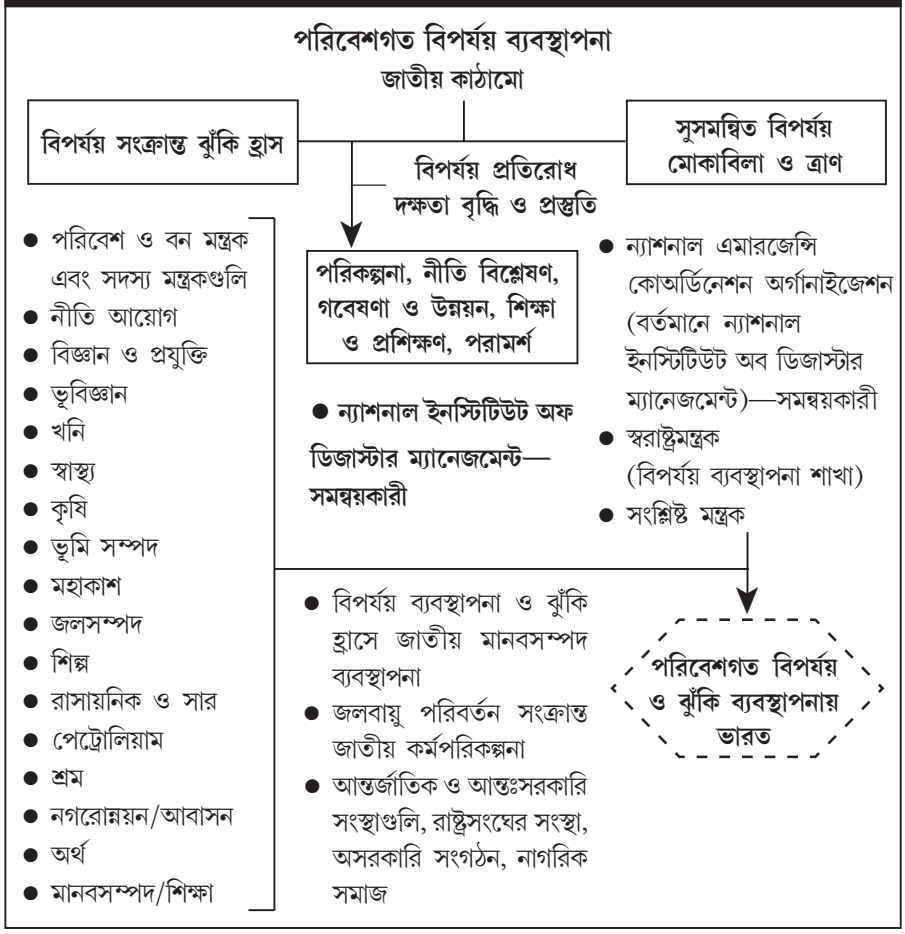

কাছ থেকে পাওয়া মতামতের ভিত্তিতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এর সার্বিক রূপ দেওয়া প্রয়োজন। ২০১৩ সালে উত্তরাখণ্ড বিপর্যয়ের পর জাতীয় কার্যনির্বাহী সমিতির তত্ত্বাবধানে র‍্যাপিড অ্যাকশন প্ল্যান গড়ে তোলা হয়। এতে আমরা যে বিষয়গুলির ওপর জোর দিয়েছি সেগুলি হল বিপদের ঝুঁকি ও অসহায়তার স্পষ্ট ছবি তুলে ধরা, মোকাবিলার পরিকল্পনা এবং মানবসম্পদের দক্ষতাবৃদ্ধি। এই সুযোগে অর্থনৈতিক কৌশল এবং আপৎকালীন মোকাবিলা কৌশলকেও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

● **জাতীয় মানবসম্পদ পরিকল্পনা ২০১২ :**

এই পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন স্তরের মূল্যায়ন করে সম্পদ চিহ্নিতকরণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের ভূমিকা ও দায়িত্বের উল্লেখ রয়েছে।

● **বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার জাতীয় নির্দেশিকা :**

জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বন্যা, খরা, ঝড়, ভূমিধসের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার নির্দেশিকা জারি করেছে।

● **পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ :**

বিপর্যয়ের যথাযথ মোকাবিলায় সময়োপযোগী নির্ভুল পূর্বাভাস অপরিহার্য। ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত হওয়ায় আমরা ফাইলিন ও হুদহুদের মতো ঝড়ের সামাল দিতে পেরেছি। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর তাদের পরিকাঠামো আরও উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

● **স্বাভাবিকতায় ফেরার পরিকল্পনাকে জেলাস্তরে নিয়ে যাওয়া :**

বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে মানিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার পরিকল্পনা জেলাস্তরে নেওয়া হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলায় এই প্রয়াস শুরু হয়েছে। এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে 'শিক্ষার ভাগ'।

● **জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় রাজ্যস্তরের পরিকল্পনা :**

উপকূল এলাকার সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জকে মাথায় রেখে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের এ সংক্রান্ত পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়েছে। জেলাস্তরের পরিকল্পনাকেও সংযুক্ত করা হয়েছে এর সঙ্গে। এতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলির অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

● **জলবায়ু পরিবর্তন ও বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসকে বিভিন্ন প্রকল্পে আনা :**

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প, ইন্দিরা আবাস যোজনা, সংযুক্ত জল উন্নয়ন প্রকল্প, জওহরলাল নেহরু নগর পুনর্নবীকরণ মিশন, প্রধানমন্ত্রী সেচ প্রকল্পের মতো নানা প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা ও বিপর্যয়জনিত ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

উপসংহার

সরকার, জনগোষ্ঠী, কর্পোরেট ক্ষেত্র এবং সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে এই লক্ষ্যে নানা কার্যক্রম চলছে। এগুলি যথাযথভাবে নথিবদ্ধ করে রাখা দরকার। ২০১৪ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রকাশিত আবাসন সংক্রান্ত দিল্লি ঘোষণায় বন্যা প্রতিরোধক বাড়ি নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। সুস্থিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নতুন প্রোটোকল ঘোষণা করায় এক্ষেত্রে ২০১৫ সাল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর যথাযথ প্রয়োগের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি এবং জেলা ও গ্রামস্তর পর্যন্ত পরিকল্পনার রূপায়ণ প্রয়োজন। ১৯৮৬ সালে পরিবেশ রক্ষা আইন প্রণয়নের সময় থেকেই জেলাস্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রয়োগের বিষয়টি বকেয়া হয়ে রয়েছে। পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের ক্ষেত্রকে আরও উন্নত করতে হবে। সচেতনতা, কার্যকর তত্ত্বাবধান এবং জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা সুস্থিত উন্নয়নের অন্যতম উপাদান। এ বিষয়ে সামাজিক ও পেশাদার পরিবেশ গড়ে তুলতে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আওতায় একটি জাতীয় মিশন শুরু করা যেতে পারে।❑

[লেখক নতুন দিল্লির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিস্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট-এর সহযোগী অধ্যাপক তথা নীতি পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান।
email : envirosafe2007@gmail.com
anil.nidm@nic.in]

জলবায়ু পরিবর্তন ও সুস্থিত উন্নয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে এক পরিচিত শব্দ। কিন্তু এর অর্থ ঠিক কী, এর কারণ, কীভাবে এর বিপদ পৃথিবীকে গ্রাস করছে, তা থেকে নিষ্কৃতির পথ কী—সবই সহজবোধ্যভাবে এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন লেখক **সুভাষ শর্মা।** *জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় ভারতের ইতিকর্তব্য নিয়েও রয়েছে বিস্তারিত আলোচনা।*

জলবায়ু পরিবর্তন হল আবহাওয়ার ধরনের পরিসর ও সময়গত পরিবর্তন অথবা কোনও অঞ্চলের বা সমগ্র বিশ্বের কিছু অঞ্চলের আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্য ও ধর্মের পরিবর্তন। জৈব পদ্ধতি, পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তন, সমুদ্র ও মহাদেশের পরিবর্তক্রিয়া, মহাদেশীয় প্লেটের সরে যাওয়া, পর্বতের সৃষ্টি, হিমবাহ গলনের ওপর সূর্যের তাপের হেরফের, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো নানা প্রাকৃতিক কারণ এবং বনাঞ্চল ধ্বংস, শস্যের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে দেওয়া, জৈব জ্বালানির ব্যবহার, বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার প্রভৃতি (এয়ার কন্ডিশনার, বিমান, রেফ্রিজারেটর, ভাক্যুম ক্লিনার, শিল্পের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ। বিশ্ব উষ্ণায়ন বলতে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বোঝায়। জলবায়ু পরিবর্তন আরও বৃহত্তর ও সার্বিক একটি শব্দ, যার আওতায় উষ্ণায়নের পাশাপাশি আবহাওয়ার প্রকৃতিগত যাবতীয় পরিবর্তনও চলে আসে। এর জেরে এবং মানুষের কাজ ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, উভয়ের প্রভাবেই গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন ক্রমশ বাড়ছে। বহু পরিবেশবিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের পিছনে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক—দু' ধরনের শক্তিই রয়েছে। অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি প্রাকৃতিক। বাহ্যিক শক্তিগুলি প্রাকৃতিক (সৌরালোকের পরিবর্তন) অথবা মানবীয়, দুই-ই হতে পারে। জলবায়ু সংক্রান্ত ইতিহাসে ২০১৪ সাল ছিল উষ্ণতম বছর। ২০১৫ সালের জুলাই, ১৮৮০ সালের জানুয়ারির পর থেকে গত ১৬২৭টি মাসের মধ্যে উষ্ণতম মাস। মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের নিরিখে দেশগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) ৬০টি এমন দেশ আছে যাদের গড় মাথাপিছু জিডিপি হল ১৭৬৮ ডলার এবং মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের পরিমাণ ২.৩ টন। (খ) ৭৪টি দেশের গড় মাথাপিছু জিডিপি ৩০৫৮ ডলার এবং মাথাপিছু কার্বন নির্গমন ৪.৫ টন। (গ) এমন ১৩টি দেশও আছে, যেখানে গড় মাথাপিছু জিডিপি ৩৩,৭০০ ডলার এবং কার্বন নির্গমনের পরিমাণ মাথাপিছু ১০ টনেরও বেশি। (সূত্র : বিশ্বব্যাংক, ২০১৪)

বর্তমানে বিশ্বের বাস্তুতন্ত্র দুটি বিপদের সম্মুখীন। প্রথমটি জলবায়ু পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়টি বিভিন্ন লতাপাতা গাছগাছালির প্রজাতির বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। পশ্চিম ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে। সময়মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হলে একবিংশ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। ইতিমধ্যেই আবহাওয়ার চরমতার বেশকিছু নিদর্শন চোখে পড়ছে। চলতি বছরে ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা খরার কবলে পড়েছে। বিশ্বজুড়ে হিমবাহ গলছে, হ্রদ শুকিয়ে যাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, দেখা দিচ্ছে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, উষ্ণায়ন, অ্যাসিড বৃষ্টির মতো নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বহু জায়গায় শীতকাল আরও দীর্ঘ ও ঠান্ডা হচ্ছে। সারণি-১-এ এগুলি এক ঝলকে দেখানো হল।

১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের গাছগাছালির জেনেটিক সম্পদ সংক্রান্ত লেইপজিগ সম্মেলনে বলা হয়েছে, সবুজ বিপ্লব ও শিল্পগত কৃষি পদ্ধতির দরুন জীববৈচিত্রের ৭৫ শতাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রসংঘের অপর একটি সংস্থা ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন দেখিয়েছে, ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ বনভূমি ধ্বংসের জন্য দায়ী শিল্পগত কৃষি। এর আওতায় বাণিজ্য ও রপ্তানির জন্য চাষ করা হয়, খাদ্যের জন্য নয়। নৃতত্ত্বজনিত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ৪৪ থেকে ৫৭ শতাংশ আসে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চলা খাদ্যশিল্প ক্ষেত্র থেকে। এছাড়া জৈব জ্বালানির ব্যবহারও এজন্য বিশেষভাবে দায়ী। এটা কঠিন সত্য যে, ভারতের জ্বালানির ৬৮ শতাংশ আসে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে, যেখানে মূলত কয়লা এবং কিছুক্ষেত্রে গ্যাস ও তেল ব্যবহার করা হয়। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি কার্বন নির্গমন বাড়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী। এছাড়া যানবাহনের দূষণ, কাঠ পোড়ানো প্রভৃতি তো রয়েছেই। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মালিকানা রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বেসরকারি সংস্থার হাতে। কোথাও কোথাও যৌথ উদ্যোগও রয়েছে। তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে সব থেকে আগে মহারাষ্ট্র (২৮২৯৪ মেগাওয়াট)। এরপর রয়েছে গুজরাট (২৩১৬০ মেগাওয়াট), ছত্তিশগড় (১৩২৩৪ মেগাওয়াট), উত্তরপ্রদেশ (১২২২৮ মেগাওয়াট), তামিলনাড়ু (১১৫১৩ মেগাওয়াট), মধ্যপ্রদেশ (১১৪১১ মেগাওয়াট) এবং রাজস্থান (১০২২৬ মেগাওয়াট)।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল এ বিষয়ে বহু রিপোর্ট পেশ করেছে। AR5-এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে যে প্রবণতাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তা হল :

সারণি-১
জলবায়ু পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব

ক্রমসংখ্যা	ঘটনা	দেশ/মহাদেশ	সময়	জলবায়ুগত প্রভাব
১।	চাদ হ্রদের শুকিয়ে আসা	চাদ, আফ্রিকা	১৯৬০-২০০২	এক সময়ে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম এই হ্রদ ক্রমশ শুকিয়ে গিয়ে এখন তার মূল আয়তনের একের কুড়ি অংশে গিয়ে ঠেকেছে। জলের বদলে সেখানে এখন জলাভূমি।
২।	তশকা হ্রদের শুকিয়ে আসা	মিশর	১৯৮৪-২০০১	নীল নদের নাসের হ্রদের জলাধার থেকে পশ্চিম মরুভূমির তশকা হ্রদে জল যেত। ২০০১ সাল থেকে তা বন্ধ। হ্রদ প্রায় শুকিয়ে গেছে।
৩।	মিসিসিপি নদীতে বন্যা	আমেরিকা	২৮ জানুয়ারি, ২০১১-৩ মে, ২০১১	প্রবল তুষারপাতের শীতকাল এবং প্রথম গ্রীষ্মে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির কারণে মিসিসিপি ও তার শাখানদীগুলিতে বন্যা হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় লক্ষ লক্ষ বাড়িঘর, বিস্তীর্ণ কৃষিজমির ফসল ও বনাঞ্চল।
৪।	সিন্ধু নদে বন্যা	পাকিস্তান	আগস্ট, ২০১০	দশ লক্ষ একরেরও বেশি কৃষিজমির ফসল নষ্ট হয়, বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে সুক্কর, ডাডু ও মেহারের মতো শহর, ১৮০০ জন প্রাণ হারান, আশ্রয়হীন হন ১ কোটি মানুষ।
৫।	ইয়েলো নদীর গতিপথ পরিবর্তন	চীন	২০০১-২০০৯	ইয়েলো নদী চীনা সভ্যতার ধাত্রী। ঘন ঘন বন্যা এর গতিপথ পালটে দিয়েছে। একে এখন 'চীনের দুঃখ' বলা হয়।
৬।	মিয়াদ হ্রদের শুকিয়ে যাওয়া	আমেরিকা	২০০০-২০১০	মিয়াদ হ্রদ থেকে ক্যালিফোর্নিয়া, আরিজোনা, নেভাদা, লাস ভেগাস ও মেক্সিকোতে জল সরবরাহ করা হয়। ২০০০ সাল থেকে এর জল কমতে থাকে। ২০১০ সালের জুলাইতে এতে জল ছিল ধারণ ক্ষমতার মাত্র ৩৮ শতাংশ। ২০০১ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে এর জলস্তর ১৮ মিটার কমে।
৭।	বিশ্ব উষ্ণায়ন	সারা বিশ্ব	১৮৮০-২০০৯	১৮৮০ সাল থেকে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। এই বৃদ্ধির দুই-তৃতীয়াংশই হয়েছে ১৯৭৫ সালের পর থেকে। প্রতি দশকে তাপমাত্রা ০.১৫ থেকে ০.২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে বাড়ছে।
৮।	হেলহেইম হিমবাহের গলন	গ্রিনল্যান্ড	২০০১-২০০৫	হেলহেইম হিমবাহের গলন ক্রমশ বাড়ছে, বাড়ছে হিমবাহ থেকে সমুদ্রে যাওয়া জলের পরিমাণও।
৯।	ইনজা হিমবাহের গলন	হিমালয়		হিমবাহের নীচের দিকে গলনের হার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন জলাশয়ের।
১০।	মাউন্ট কিলিমানজারোর বরফ গলা	তানজানিয়া, আফ্রিকা	১৯৯৩-২০০০	তিনটি আগ্নেয়গিরির মুখ নিয়ে গড়ে ওঠা কিলিমানজারো, বিশ্বের উচ্চতম 'ফ্রি স্ট্যান্ডিং' পর্বত। এর চূড়ার বরফ ব্যাপকভাবে গলছে।
১১।	কেদারনাথে বন্যা	উত্তরাখণ্ড, ভারত	জুন ২০১৩	মেঘভাঙা বৃষ্টিতে প্রাণ হারিয়েছেন ১০ হাজার মানুষ, ব্যাপক সম্পত্তিহানি হয়েছে।

সূত্র : নাসার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে।

(ক) গ্রিনহাউস গ্যাসের নৃতত্ত্বজনিত নির্গমন এখন সর্বাধিক। জলবায়ু পরিবর্তনের গভীর প্রভাব পড়ছে মানবসভ্যতা ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ওপর।

(খ) সমুদ্রের জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশে এর অম্লতা বাড়াচ্ছে। ১৮৮২ থেকে ২০১২ সময়কালে উষ্ণতা বেড়েছে ০.৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সমুদ্রের জলস্তরে ১৯০১ থেকে ২০১০ সময়কালে বৃদ্ধির পরিমাণ ০.১৯ মিটার।

(গ) গ্রিনহাউস নির্গমন ক্রমাগত হয়ে চলায় এর তীব্র, অসহনীয় প্রভাব পড়তে চলেছে মানবসভ্যতা ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর।

(ঘ) তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে বেঁধে রাখার যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, সেজন্য কার্বন নির্গমন ২৯০০ $GtCO_2$-এর নীচে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ২০১১ সালের মধ্যেই নির্গমনের মাত্রা ১৯০০ $GtCO_2$ ছুঁয়ে ফেলেছে।

(ঙ) ঝুঁকির বণ্টন সাম্যের ভিত্তিতে হচ্ছে না। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষজন সব দেশেই বেশি করে বিপদের আওতায় থাকছেন।

(চ) জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং এর মোকাবিলার পরিপূরক কৌশল বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমায়।

(ছ) বর্তমানে যে মোকাবিলা ব্যবস্থা

আছে তা উন্নত না করলে একবিংশ শতাব্দীর শেষে বিশ্বজুড়ে প্রবল, ব্যাপক, অসংশোধনীয় প্রভাবের ঝুঁকি রয়েছে।

(জ) আগামী কয়েক দশকে নির্গমনের হার বিপুলভাবে কমাতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর শেষে কার্বন নির্গমন এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার শূন্যের কাছাকাছি নামিয়ে আনা দরকার। এর রূপায়ণের পথে মুখোমুখি হতে হবে প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জের।

(ঝ) একবিংশ শতাব্দীর শেষে সমুদ্রের ৯৫ শতাংশ এলাকাতেও জলস্তরের উচ্চতা বাড়বে।

(ঞ) পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ শতাংশের মধ্যে বেঁধে রাখতে হলে ২১০০ সালে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব ৪৫০ PPM CO_2-র বেশি হওয়া চলবে না। এজন্য ২০৫০ সালের মধ্যে নৃতত্ত্বজনিত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ কমাতে হবে।

গবেষকরা বলছেন, গত কয়েক দশক ধরে জলবায়ুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে এবং এর প্রভাব পড়ছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। এই সত্যকে উপযোগিতাবাদী, উন্নয়নবাদী ও রাজনৈতিক নেতারা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবেন না। সময় থাকতে জলবায়ু পরিবর্তনের যথাযথ মোকাবিলার ব্যবস্থা করতে হবে।

II

চলতি বছরের ২ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার Intended Nationally Determined Contribution—INDC প্রকাশ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা ভারত কীভাবে করতে চায়, এটি তার সরকারি নথি। এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে নগরায়ণ, পরিবহণ, কৃষি, স্বাস্থ্য, জল ও উপকূল ক্ষেত্রের কথা। ২০০৭ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বালি সম্মেলনে প্রায় সব দেশই মোটের ওপর সম্মত হয় যে, কার্বন নির্গমন হ্রাসে 'টপ-ডাউন' কাঠামোয় আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বদলে 'বটম আপ' চুক্তিতে স্বাক্ষর করা উচিত। (চলতি বছরের ডিসেম্বরে প্যারিসে এই চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার কথা।) অর্থাৎ এক ধাক্কায় বিশ্বজুড়ে সর্বত্র কার্বন নির্গমন কমানোর ফতোয়া দেবার বদলে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় প্রতিটি দেশকে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রস্তুতের স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। অনেক বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদ মনে করেন, এর সুফল অনেক বেশি। এতে বায়ুদূষণ কমবে, জ্বালানির অপচয় কমবে এবং আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে। ভারত মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ করছে, যিনি বলেছিলেন, 'সবার সব অভাব পূরণ করার ক্ষমতা পৃথিবীর আছে, কিন্তু কারও লোভ মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।' এই অভাব বনাম লোভের দ্বন্দ্ব আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এখানে আর্থ-সামাজিক ও বাস্তুগত উৎকর্ষ ছাড়াও একটা নৈতিক কণ্ঠস্বর রয়েছে। তবে কিছু গবেষক (এন কে দুবাশ, রাধিকা খোসলা প্রমুখ) বলেন, বাস্তবে ভারতে তথাকথিত 'প্রকৃতিবান্ধব জীবনযাত্রা' দেখা যায় না। প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ প্রকাশ্যে মলত্যাগ করেন, দিল্লি বিশ্বের দূষিততম শহর, (বায়ুদূষণ—ওজোন, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ও অতি সূক্ষ্ম পদার্থ—অনুমোদিত PM ২.৫-এর থেকে ৬ গুণ বেশি), বিশ্বের সব থেকে দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে ১৩টি ভারতে, এখানেই PM ২.৫-এর মাত্রা সব থেকে শোচনীয়, মুম্বইয়ের ৬০ শতাংশ মানুষই বাস করেন অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে, গ্রামীণ নাগরিকদের দুই-তৃতীয়াংশই রান্নার জন্য কাঠ বা জ্বালানি তেল ব্যবহার করেন, ভারতের জ্বালানি সরবরাহের ৭৫ শতাংশই অপুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস থেকে, প্রায় ৩০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করেন। ২০৩০ সালকে সামনে রেখে ভারত তিনটি অঙ্গীকার করেছে। প্রথমত, ২০০৫-কে ভিত্তি করে কার্বন নির্গমন ৩৩ থেকে ৩৫ শতাংশ কমানো। দ্বিতীয়ত, অজৈব জ্বালানি ব্যবহার করে মোট বিদ্যুতের ৪০ শতাংশ উৎপাদন করা এবং তৃতীয়ত, বনসৃজনের মাধ্যমে আড়াইশো থেকে তিনশো টন কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, গ্রিনহাউস গ্যাস, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতির প্রভাব নিষ্ক্রিয় করা। ভারতের INDC-তে অবশ্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক কোনও দায়বদ্ধতা নেই। সমালোচকরা মনে করেন, এইসব অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন করতে গেলে একটি বিশ্বজনীন চুক্তির প্রয়োজন, যা প্যারিসে হতে চলেছে।

তবে এটা সর্বজনবিদিত যে, ভারতে মাথাপিছু নির্গমন ১.৬ টন, বিশ্ব গড় ৬.৬ টনের থেকে অনেক কম। (কেউ কেউ ৪.৫ টনকে বিশ্ব গড় বলেন।) উন্নত দেশগুলি যেমন আমেরিকা, (১৬ থেকে ২০ টন) এমনকী চীনের (৬ টন) থেকেও ভারতের মাথাপিছু নির্গমন অনেকটাই কম। অন্যভাবে বললে, ভারতে মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের হার বিশ্ব গড়ের ৩৬ শতাংশ এবং আমেরিকার ৮ থেকে ১০ শতাংশ। এর থেকে বোঝা যায়, গার্হস্থ, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রের যান্ত্রিকীকরণের ফলে উন্নত দেশগুলিতে জ্বালানি ব্যবহারের হার, উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি। অন্যদিকে, ১২৫ কোটি বিপুল জনসংখ্যার জেরে ভারতের সম্পূর্ণ কার্বন নির্গমনের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি—২০০ কোটি টন। (বিশ্বের মোট কার্বন নির্গমনের ৫.২ শতাংশ।) ভারতে জ্বালানি ব্যবহারের হার বিশ্বের ৫.৯ শতাংশ। সেজন্যই নাগরাজ আদভে ও আশিস কোঠারি বলেছেন, ভারতের INDC উন্নয়নের দোহাই দিয়ে অন্যায়ভাবে কার্বন নির্গমন ভবিষ্যতে বাড়ার সওয়াল করেছে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ভারতে যে বিপুল ফারাক রয়েছে, INDC সেদিকে দৃষ্টি দেয়নি। ভারতে ১,৭৫,০০০ পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ ১০ লক্ষ ডলার বা তার বেশি। এদের মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের হার আমেরিকা ও ইউরোপের ধনীদের সমান। দেশে ১ শতাংশ ধনীর কার্বন নির্গমন, ৪০ শতাংশ দরিদ্রের ১৭ গুণেরও বেশি। আদভে ও কোঠারি সঠিকভাবেই তাই বলেছেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় মানুষকে প্রস্তুত করে তোলার প্রয়াস কার্যকর দারিদ্র দূরীকরণ, সুস্থিত কৃষির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষার উন্নয়ন, জীববৈচিত্রের বিকাশ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, গোষ্ঠী সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গেও যুক্ত। এই সংযোগগুলি স্পষ্ট করা হয়নি।' এছাড়া

সমালোচকরা দেখিয়েছেন, INDC-তে 'পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি' না বলে 'অজৈব জ্বালানি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর লক্ষ্য ২০৩২ সালের মধ্যে ৬৩ গিগাওয়াটে পৌঁছনো (বর্তমানে ১০ গিগাওয়াট)। পরমাণু বিদ্যুৎকে এখানে 'সুরক্ষিত, পরিবেশবান্ধব ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম উৎস' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিল এবং ২০১১ সালে জাপানে ফুকোশিমা দাইচি বিদ্যুৎকেন্দ্রের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। রিঅ্যাক্টর নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতে বরাবরই যা খরচ ধরা হয়, বাস্তবে ব্যয় তার থেকে ঢের বেশি পড়ে। আবার বিদেশ থেকে রিঅ্যাক্টর আমদানি করাও অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ। এছাড়া বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে গিয়ে যে বিপুল সংখ্যক মানুষকে উচ্ছেদ করতে হয়, তার কোনও উল্লেখও INDC-তে নেই। এখানে কয়লাকে দূষণমুক্ত জ্বালানির উৎস বলা হয়েছে। অথচ কয়লার ক্ষেত্রে কার্বন নির্গমন তেলের তুলনায় ৫০ শতাংশ এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনায় ৮০ শতাংশ বেশি। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কয়লা উৎপাদক। তার সঞ্চয়ে রয়েছে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম কয়লার মজুত ভাণ্ডার। তা সত্ত্বেও ২০১১ সালে ভারতের কয়লা আমদানি মোট চাহিদার ১১ শতাংশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর এর প্রভাব যথেষ্ট।

নতুন নতুন এলাকায় বনসৃজনের যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তাও খুব একটা বাস্তবসম্মত নয়। একদিকে আমরা অরণ্য ধ্বংস রুখতে পারছি না, অন্যদিকে নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ প্রভৃতির জন্য ক্রমশই আরও কৃষিজমি ও বনভূমি নেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞান ও পরিবেশ কেন্দ্রের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, তথাকথিত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য ১৯৯২ থেকে ২০১২ সময়কালে ৬ লক্ষ হেক্টর বনভূমি নেওয়া হয়েছে।

এই সব তথ্য ও পরিসংখ্যানের সাপেক্ষে আমাদের মনে হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় ভারতের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া উচিত।

(ক) বায়ু, সৌর, জল, জৈব, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতির মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সৌরশক্তি বায়ুশক্তি এবং জৈব জ্বালানির থেকে সস্তা।

(খ) প্রাথমিকভাবে সস্তা মনে হলেও পরমাণু শক্তি দীর্ঘকালীন মেয়াদে পরিবেশগতভাবে সুরক্ষিত তো নয়-ই, বরং বেশ বিপদসংকুল। তাই একে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

(গ) শক্তি ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন (যেমন, প্রথাগত বাল্বের বদলে এল ই ডি বাল্ব/ টিউবের ব্যবহার)। এজন্য জাতীয় স্তরে ব্যুরো এবং রাজ্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে আরও সক্রিয় করে তুলতে হবে।

(ঘ) দূষণমুক্ত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন বাড়াতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ দরকার। এজন্য সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগকেও বিশেষ উৎসাহ দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ হলে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(ঙ) প্রতিটি রাজ্যকে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় সার্বিক পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। এ পর্যন্ত ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এটি প্রস্তুত করলেও ৪টি রাজ্য এখনও তা করেনি। কিন্তু ৩১টির মধ্যে মাত্র ২০টি রাজ্যস্তরীয় কর্মপরিকল্পনা যথাযথ। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় সঞ্চালক কমিটি এগুলির ছাড়পত্র দিয়েছে। সব রাজ্যের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে এ বাবদ ১১,৩৩,৬৯১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

(চ) কিয়োটো প্রোটোকলের ১২ ধারায় কার্বন নির্গমন কমাতে কার্বন ক্রেডিট কেনাবেচার সংস্থান রয়েছে। একে দূষণমুক্ত উন্নয়ন ব্যবস্থা বা Clean Development Mechanism—CDM বলা হয়। ২০০৩-১৪ সময়কালে মোট ৭৫৮৯টি CDM প্রকল্পের মধ্যে ১৫৪১টি ছিল ভারত থেকে, যা বিশ্বে দ্বিতীয়। মোট ১৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকার ভারতীয় প্রকল্পে (১৩.২৭ শতাংশ) ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এদের অধিকাংশই জ্বালানি দক্ষতা, জ্বালানি পরিবর্তন, শিল্প ব্যবস্থাপনা, পৌর কঠিন বর্জ্য, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও বনভূমি বিষয়ক। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় CDM প্রকল্পের সংখ্যা অনেকটা কমে গেছে। মোট ৩২২৭টির মধ্যে ভারতীয় প্রকল্প মাত্র ৩০৭টি। ভারতীয় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে তাই উদ্যোগী হতে হবে বাজার ধরতে।

(ছ) কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক কৃষি, জল, বনভূমি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় জাতীয় স্তরে ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করেছে। তবে এর কাজ এখনও শুরু হয়নি। তাছাড়া বিপদের ব্যাপ্তির তুলনায় তহবিলের টাকার অঙ্ক নেহাতই কম।

শেষে বলি, বিশ্বস্তরে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করার যে 'অভিন্ন অথচ পৃথক' দায়িত্ব আছে, ভারতকে অবশ্যই তা পালনে মনোযোগী হতে হবে। গত ৩০০ বছরে বহু উন্নত দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে 'ঐতিহাসিক ভুল' করে গেছে। এর দায় ভারতের নয়, তবুও আজ কার্বন নির্গমন কমাতে ভারতকে সর্বশক্তি দিয়ে উদ্যোগী হতে হবে। ভারতের এ সংক্রান্ত আটটি মিশনকে সক্রিয় করে তুলে তার সময় নির্দিষ্ট রূপায়ণে জোর দেওয়া দরকার।❑

[লেখক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ও আর্থিক উপদেষ্টা। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি একাধিক বই এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে নিবন্ধ লিখেছেন।
email : sush84br@yahoo.com]

সাম্য এবং একটি বিশ্বজনীন জলবায়ু চুক্তি

রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত প্যারিস সম্মেলন। এখানেই বিশ্বজনীন জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার কথা। কিন্তু দায়িত্ব ও বোঝার বণ্টন নিয়ে মতবিরোধ, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বিরোধ, উন্নত দেশগুলির এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতার মধ্যে তা কি আদৌ সম্ভব হবে? সাম্যের ভিত্তিতে দায় বণ্টনের ক্ষেত্রে কার্বন বাজেট দৃষ্টিভঙ্গি কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে? সার্বিক বিশ্লেষণ **টি জয়রামন**-*এর এই নিবন্ধে।*

সূচনা

বিশ্ব বর্তমানে যেসব বৃহৎ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তার মধ্যে অন্যতম হল জলবায়ু পরিবর্তন। বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও শিল্পপতিদের একাংশ এবং কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, বিশেষত, উন্নত দেশগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অস্বীকার করলেও এমন চিন্তাধারা ক্রমশই আরও বেশি করে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে। দায়িত্বশীল কোনও রাজনৈতিক নেতাই জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় সুসমন্বিত বিশ্বজনীন ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন না। গত আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেলের একের পর এক রিপোর্টে এই ব্যবস্থা গ্রহণের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদনও তার ব্যতিক্রম নয়।

বিশ্বজুড়ে একটি জলবায়ু চুক্তি করে তার আওতায় গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমানোর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থাপন করার কাজ বহু চড়াই-উতরাইতে পরিকীর্ণ এবং সময়সাপেক্ষ। মূল খসড়া চুক্তিটির পোশাকি নাম হল United Nations Framework Convention on Climate Change—UNFCCC। যে নীতিগুলির ভিত্তিতে এই খসড়া প্রণয়ন করা হয়, সেগুলিতে সহমত পোষণ করে সিংহভাগ দেশই। ১৯৯২ সালের চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এর বিভিন্ন ধারার রূপায়ণ করতে গিয়ে ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়তে হয়। নানা দেশকে যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে, তা নিয়ে বিবাদ বাধে।

এত সমস্যার উৎস কোথায়, তা বোঝা অবশ্য কঠিন নয়। এর মূল নিহিত জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপের অর্থনৈতিক প্রভাবে। গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে গেলে প্রথমেই কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎসর্জন হ্রাস করতে হবে। অথচ মানবসভ্যতা আজ জৈব জ্বালানি ও তার উপজাত দ্রব্যগুলির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এর ব্যবহার এখন সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেড়শো বছর আগে যে শিল্পবিপ্লব হয়েছিল, তার ভিত্তি ছিল এই জৈব জ্বালানি। এখন অবশ্য নানা নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে, শিল্প ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারও বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার কমানোর বিষয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। উন্নত এবং উন্নয়নশীল—সব দেশই অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব নিয়ে চিন্তিত। উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্বিধা সব থেকে বেশি। একদিকে তাদের সামনে রয়েছে উন্নয়নের ঘাটতি মিটিয়ে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার তাগিদ। আবার এজন্য তাদের নির্ভর করতে হয় জৈব জ্বালানির ওপর। কারণ, শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের ইতিহাসে জৈব জ্বালানির থেকে ভালো বিকল্পের সন্ধান মেলেনি।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার দায়িত্ব ভাগ

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় আশু ব্যবস্থা নেওয়া যে প্রয়োজন, তা নীতিগতভাবে স্বীকৃত। UNFCCC-তে সুনির্দিষ্টভাবে এর উল্লেখ রয়েছে। এই সনদ, সব দেশই মেনে নিয়েছে। প্রশ্ন হল, এর অর্থনৈতিক বোঝা কে কতটা বহন করবে। বিশেষত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে এখনও চরম বৈষম্য থাকায় এই দুই বিভাগের মধ্যে বোঝার বণ্টন ও তার তুলনামূলক ভাগ কী হবে, তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে।

অথচ আর্থিক বোঝার বণ্টন যে সাম্যের ভিত্তিতে করতে হবে UNFCCC-র সনদে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সনদের ৩.১ ধারায় বলা হয়েছে, "বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা দরকার। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি সাম্যের ভিত্তিতে এবং তাদের অভিন্ন অথচ পৃথক দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনুসারে এই কাজ করবে। উন্নত দেশগুলিকে এই অভিযানে নেতৃত্ব দিতে হবে।" ৩.২ ধারায় আরও বলা হয়েছে, "উন্নয়নশীল দেশগুলির চাহিদা ও বিশেষ পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে হবে। বিশেষত যে উন্নয়নশীল দেশগুলি সবথেকে বেশি করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদের মুখে পড়েছে এবং এই সনদের লক্ষ্যপূরণ করতে গিয়ে যাদের ঘাড়ে অস্বাভাবিক বোঝা চেপেছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে হবে।" এছাড়া অন্যান্য ধারাতেও দায়িত্বগ্রহণ, সহযোগিতা, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অর্থের জোগানের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির ভূমিকা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

দুঃখের বিষয় হল, এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকেই উন্নত দেশগুলি তাদের বোঝা কমাতে নানা কৌশল, কূটনৈতিক চাল ও অছিলার আশ্রয় নিয়ে চলেছে। কীভাবে নিজেদের দায়-দায়িত্ব কমিয়ে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলির দিকে তা ঠেলে দেওয়া যায়, সেই দিকেই তাদের লক্ষ্য, চুক্তি স্বাক্ষরের পর দু-দশক ধরে চেষ্টা চলে। যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বুঝিয়ে শুনিয়ে অসম ভার বহনে রাজি করানো যায়।

সাম্প্রতিককালে উন্নত দেশগুলি চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে সাম্যের ভিত্তিতে এবং অভিন্ন অথচ পৃথক দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনুসারে দায় বণ্টনের যে উল্লেখ চুক্তিতে আছে, তা লঘু করে দিতে। ২০১১ সালে ডারবানে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সংক্রান্ত আলোচনায় এই প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যায়। ওই আলোচনাতেই ২০১৫ সালে UNFCCC কমিটির ২১তম বৈঠকে জলবায়ু বিষয়ক বিশ্বজনীন চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি এই প্রবণতার বিরুদ্ধে শক্তভাবে রুখে দাঁড়ালেও তাদের মধ্যে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব তাদের দেশ ও সমাজে প্রবলভাবে পড়ার আশঙ্কায় ভীত, তারা দ্রুত চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী। এ সংক্রান্ত বোঝার একটা বড় অংশ অসমভাবে বিশেষত ভারত ও চীনের কাঁধে পড়তে চললেও তারা এ নিয়ে চিন্তিত নয়।

এটাও বলতে হবে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলি কিছুটা রক্ষণাত্মকভাবে সাম্যের কথা বলছে। সাম্য সুনিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট কোনও প্রস্তাব কিন্তু পেশ করা হয়নি। উন্নয়নশীল দেশগুলির এমন কোনও প্রস্তাব আনা উচিত, যাতে বিভিন্নতা ও উন্নয়নের অগ্রাধিকার বজায় রেখেও তারা আন্তর্জাতিক প্রয়াসে নিজেদের অবদান রাখতে পারে এবং অকর্মণ্যতার দায়ে অভিযুক্ত না হয়।

আসন্ন প্যারিস সম্মেলনে চীন ও ভারত-সহ অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় নিজেদের কর্মপদ্ধতি জানাবে। সব দেশই Intended Nationally Determined Contribution—INDC পেশ করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় কী করার কথা ভাবা হচ্ছে, উন্নত দেশগুলি কেবল তাই জানাবে। বাস্তবে কতটা কাজ তারা করল, তা জানার কোনও উপায় থাকবে না। এই তথাকথিত 'বটম-আপ' দৃষ্টিভঙ্গির বিপদ হল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সহ উন্নয়নশীল দেশগুলির বোঝা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকবে। এটা আরও বেশি করে মনে হওয়ার কারণ হল, উন্নত দেশগুলি তাদের স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্যের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও জানাবে। কিন্তু চীন ছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকাংশেরই শুধুমাত্র স্বল্পকালীন উদ্দেশ্যের কথাই বলা আছে।

মূল প্রশ্ন হল, কীভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলি, বিশেষত ভারত, একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বজনীন জলবায়ু চুক্তির আওতায় আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজেদের কৌশলগত প্রয়াস বজায় রেখেই জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় ন্যায়সংগত অবদান রাখতে পারে। এই নিবন্ধের বাকি অংশে আমরা সংক্ষেপে এমনই এক দৃষ্টিভঙ্গির কথা আলোচনা করব, যা এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে।

কার্বন বাজেট দৃষ্টিভঙ্গি

IPCC-র প্রথম মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এক নম্বর কর্মীগোষ্ঠীর রিপোর্টে জোরের সঙ্গে বিশ্বজনীন কার্বন বাজেট প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এর পিছনে যে মূল বৈজ্ঞানিক ধারণাটি রয়েছে তা হল, একটি নির্দিষ্ট সময়কালে বিশ্বের তাপমাত্রা, মোটামুটিভাবে ওই সময়কালে নির্গত হওয়া গ্রিনহাউস গ্যাসের সমানুপাতিক হারে বাড়ে। আগেকার দৃষ্টিভঙ্গিগুলিতে বলা হত, কার্বন নির্গমনের বার্ষিক বৃদ্ধি ও হ্রাস (যে বছর কার্বন নির্গমনের পরিমাণ সর্বাধিক হত, তাকে শীর্ষ বছর হিসাবে চিহ্নিত করা হত।) এবং তাপমাত্রার বৃদ্ধি ক্রমশ এক ভারসাম্য তাপমাত্রায় পৌঁছবে, যখন গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন আর হবে না। (এবং সমগ্র পরিবেশ এক ভারসাম্যের মাত্রায় পৌঁছাবে।) তবে এটা বৈজ্ঞানিকভাবে স্পষ্ট নয় যে, কার্বন নির্গমনের বৃদ্ধি ও হ্রাস, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। বরং এক্ষেত্রে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কার্বন চক্রের (যেমন গ্যাসগুলিকে সমুদ্র ও আবহমণ্ডলের শোষণ করে নেওয়া এবং বাকি গ্রিনহাউস গ্যাস আবহমণ্ডলে জমাট বেঁধে থাকা) প্রাসঙ্গিকতা তেমন নেই। সরাসরি মোট নির্গমনের পরিমাণ এখানে প্রয়োজন।

বিশ্বজুড়ে কতটা নির্গমন অনুমোদন করা যায়, তা নির্ধারণের এ এক সহজ, চটজলদি পদ্ধতি। একেই বিশ্বজনীন কার্বন বাজেট বলা হয়। এরপর সাম্যের নীতির ওপর ভিত্তি করে এই বাজেটে প্রতিটি দেশের ভাগ বের করা অত্যন্ত সহজ। সব থেকে সহজ হল আগেকার কোনও ভিত্তিবর্ষের সাপেক্ষে মাথাপিছু অনুমোদিত নির্গমনের পরিমাণ নির্ধারণ করা। (অনেকেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য ১৮৫০ সালকে ভিত্তিবর্ষ হিসাবে বেছে নেন। অথবা ১৮৭০ সালকে, যেটি IPCC AR5-এ আগেকার নির্গমনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বাছা হয়েছিল।)

কার্বন বাজেট প্রস্তুতের এই পদ্ধতি IPCC AR5 ছাড়াও বিজ্ঞানীমহলে ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গবেষণা পরিষদ এটিকে বিশদে খতিয়ে দেখেছে। ২০১১ সালে জাতীয় গবেষণা পরিষদ, মার্কিন কংগ্রেসে 'America's Climate Choices' শীর্ষক যে রিপোর্ট পেশ করে, তাতে কার্বন বাজেট পদ্ধতিকেই মূল নীতিগত কাঠামো হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই একই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছে জার্মানির জার্মান কাউন্সিল ফর গ্লোবাল চেঞ্জ এবং চীনের চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সোশ্যাল সায়েন্সেস। অতি সম্প্রতি, প্রথম সারির জলবায়ু বিজ্ঞানীরা নেচার পত্রিকায়

কার্বন বাজেট দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন।

ততটাই নির্গমন অনুমোদন করা হবে, যাতে পৃথিবীর তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়বে না— এই নীতির ওপর ভিত্তি করে কার্বন বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন সম্মেলন এবং পরের বছর কানকুনেও এই নীতিতে সহমত হয়েছে। তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়বে না, এমন সম্ভাবনা যদি ৫০ থেকে ৬৭ শতাংশের মধ্যে ধরা যায় তাহলে কার্বন বাজেট থাকবে ৯৯২ গিগাটন থেকে ১২১২ গিগাটনের মধ্যে।

৯৯২ বা ১২১২ গিগাটনের এই বাজেট গোটা বিশ্বের মোট নির্গমনের জন্য। সমস্ত দেশে এখনও পর্যন্ত নির্গমনের যা পরিমাণ, তাতে বাজেটের একটা অংশ ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত। হিসেব করে দেখা গেছে ৪৪৫ থেকে ৫৮৫ গিগাটন (গড় ৫১৫ গিগাটন) নির্গমন এর মধ্যে হয়ে গেছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া অন্য গ্রিনহাউস গ্যাসগুলিকেও ধরলে নির্গমনের মাত্রা দাঁড়াবে আরও বেশি—৫১৫ থেকে ৬৬৭ গিগাটনে। ভবিষ্যতের নির্গমন আরও বেশি করে অবশিষ্ট কার্বন-পরিসরকে সংকুচিত করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় যে কোনও দেশের কর্মপদ্ধতি তাই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভাগ ফেলবে এই কার্বন বাজটেই। উদাহরণস্বরূপ, ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে নির্গমনের হার ৩৩ শতাংশ কমাবার প্রয়াস চালাচ্ছে। এর অর্থ ২০১২ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৭ শতাংশ জিডিপি হারে ভারতের মোট কার্বন নির্গমন হবে ১৮ গিগাটন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২৫ সালের মধ্যে ২০০৫ সালের নিরিখে ২৬ শতাংশ নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর অর্থ ২০১২ থেকে ২০২৫ সময়কালে ১৯ গিগাটন নির্গমন হয়েছে।

১৮৭০ থেকে ২১০০ সালের মধ্যে মাথাপিছু ভাগ অনুযায়ী প্রথম সারির প্রতিটি দেশের জন্য 'কার্বন বাজেট অধিকার' হল ২১০ গিগাটন। কিন্তু ২০১২ সালের মধ্যেই দেশগুলি ৩৮০ গিগাটন কার্বন নির্গমন করে ফেলেছে। (যা তাদের ভাগের থেকে প্রায় ১৬৯ গিগাটন বেশি)। অর্থাৎ উন্নত দেশগুলি ইতিমধ্যেই কার্বন বাজেটে তাদের ভাগ শেষ করে বসে আছে। এটাই নীচের সারণিতে দেখানো হয়েছে। মাথাপিছু ভাগ না করে মাথাপিছু জিডিপি বা মানবোন্নয়ন সূচককে বণ্টনের ভিত্তি করলে কেমন ফল হবে তাও এখানে দেখা যাবে।

এই সারণি থেকে স্পষ্ট, মাথাপিছু অধিকারের বদলে অন্য কোনও মাপকাঠি ব্যবহার করলে উন্নত দেশগুলির কার্বন পরিসর অধিকার আরও বড় হয়ে দেখা দেয়।

উন্নত দেশগুলি যে INDC পেশ করেছে, তাতে তারা অন্যায়ভাবে কার্বন পরিসরে তাদের প্রাপ্যের থেকে বেশি দখলদারির চেষ্টা চালাচ্ছে।

কার্বন বাজেট একবার কোনও দেশ বা দেশগোষ্ঠী ব্যবহার করে ফেললে তা আর অন্যদের জন্য থাকবে না। তাই কোনও দেশ এখনও কার্বন বাজেট নিয়ে দীর্ঘকালীন লক্ষ্য ঘোষণা না করলে ভবিষ্যতে কার্বন বাজেটের ভাগ পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠবে। বেশি কার্বন নির্গমন করে যে দেশগুলি, তারা ইতিমধ্যেই কার্বন বাজেটে তাদের ভাগের দাবি জানিয়ে বসে আছে। ভারত যদি এখনই দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য ঘোষণা না করে, তাহলে যতদিনে নির্গমনের সাপেক্ষে আমাদের জ্বালানি ও উন্নয়নের ভবিষ্যৎ স্পষ্টতর হবে তখন কার্বন বাজেটে নিজেদের ভাগ দাবি করার মতো আর কিছু পড়ে থাকবে না।

বিশ্বজনীন কার্বন বাজেটে ভারতের ন্যায্য ভাগ কীভাবে নির্ধারিত হতে পারে? উন্নত দেশগুলি কার্বন পরিসর অতিরিক্ত অধিকার করে নেওয়ায় ভারতসহ কোনও উন্নয়নশীল দেশই তাদের ন্যায্য ভাগ পাবে না। ১৮৭০ থেকে ২১০০ সময়কালের জন্য ভারতের ন্যায্য ভাগ হতে পারে ১৮২ থেকে ১৮৬ গিগাটন। কিন্তু বাস্তবে ভারত পেতে চলেছে মাত্র ৮৩ থেকে ১০৯ গিগাটন। কার্বন বহির্ভূত নির্গমনকে হিসাবে ধরলে এই অঙ্কের সামান্য কিছুটা হেরফের হবে। ন্যায্য ভাগ ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে এই ফারাকের জন্য উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে ভারতের প্রযুক্তি হস্তান্তর ও আর্থিক সহায়তা পাওয়া উচিত। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে যেগুলি তেল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের ওপর ঐতিহাসিকভাবে নির্ভরশীল, তাদের ন্যায্য ভাগের থেকেও কিছুটা বেশি কার্বন বাজেট দেওয়া উচিত।

আরও বহু প্রস্তাব আসছে। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলি এমন জলবায়ু বিপদ

সারণি-১
অ্যানেক্স-১ দেশগুলির জন্য কার্বন বাজেট অধিকার (১৮৭০-২১০০) আগের কার্বন ছাড়া অন্যান্য নির্গমনকে হিসাবে ধরে জনসংখ্যা, জিডিপি, মানবোন্নয়ন সূচক ভিত্তিবর্ষ ২০১১

	কার্বন বাজেট অধিকার অ্যানেক্স-১ দেশগুলির জন্য (১৮৭০-২১০০) (গিগাটন)	অ্যানেক্স-১ দেশগুলির আগের নির্গমন (১৮৭০-২০১১) (গিগাটন)	কার্বন পরিসরে অ্যানেক্স-১ দেশগুলির অতিরিক্ত দখলদারি ভবিষ্যতের জন্য পড়ে থাকা কার্বন পরিসর (২০১২-২১০০) (গিগাটন)
মাথাপিছু অধিকার	২১০		– ২৮১
মাথাপিছু জিডিপি-র সাপেক্ষে মাথাপিছু অধিকার	১৯৮	৪৯২	– ২৯৪
মানবোন্নয়ন সূচকের সাপেক্ষে মাথাপিছু অধিকার	১৬০		– ৩৩২

মোকাবিলা পদ্ধতি চায়, যা সাম্যের ভিত্তিতে গঠিত। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন একইভাবে হতে পারে না বলে তারা মনে করে। মোকাবিলা পদ্ধতি নিয়ে দুধরনের প্রস্তাব জমা পড়েছে। মজুতভিত্তিক ও প্রবাহভিত্তিক। প্রবাহভিত্তিক প্রস্তাবগুলি উপশম প্রক্রিয়ায় সাম্য সুনিশ্চিত করতে পারে না। এখানে খেয়ালখুশিমতো বোঝা ভাগ করায় কোনও দেশের কাঁধে অত্যধিক দায়ভার চেপে বসতে পারে। বরং মজুতভিত্তিক প্রস্তাবে মোট নির্গমনকে ভিত্তি হিসাবে ধরা হয় বলে এটি অনেক বেশি মজবুত ও বিজ্ঞানসম্মত। আগেই আমরা বলেছি, মজুতভিত্তিক প্রস্তাবগুলি উল্লেখযোগ্য রকমের সমর্থন পেয়েছে, বিশেষত বিজ্ঞান সম্পর্কিত লেখালেখিতে। তবে অনেক উন্নত দেশ এই প্রস্তাবগুলিতে তাদের ঐতিহাসিক দায় এড়াবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

দুর্ভাগ্যবশত, উপশম প্রক্রিয়ার দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে INDC-গুলিকে ভিত্তি হিসাবে ধরা হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি নিজেদের ইচ্ছামতো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তাদের লক্ষ্য স্থির করছে। এই প্রয়াস যথেষ্ট কি না, এতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব কি না, দায়িত্বের সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত হচ্ছে কি না—তা নিয়ে কোনও আলোচনা হচ্ছে না।

তাহলে কি কার্বন বাজেট দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই বিশ্বজনীন জলবায়ু চুক্তি সম্পাদিত হবে? এ বিষয়ে আগাম কিছু বলা খুব কঠিন। এখনও পর্যন্ত উন্নত দেশগুলি এর ঘোর বিরোধী। আবার বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশও এই প্রস্তাবের সবটুকু ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি। তবে মোট নির্গমন মাত্রা নিয়ে উন্নত দেশগুলি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। আলোচনার পরবর্তী স্তরে তারা যে বিষয়টি তুলবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভারতের ক্ষেত্রে, আমাদের ধারণা, এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্তত একটা মাপকাঠি হিসাবে কাজ করবে, যার ভিত্তিতে ভারত অন্যান্য প্রস্তাব ও মোকাবিলা প্রক্রিয়া বিচার করে নিজের চাহিদার ওপর তাদের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হবে।❑

[লেখক মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর 'স্কুল অফ হ্যাবিট্যাট স্টাডিজ'-এর অধ্যাপক। email : tjayraman@tiss.edu]

উল্লেখপঞ্জি :

Frame, D.J., Macey, A.H. and Allen, M. (2014) Cumulative emissions and climate policy. *Nature Geoscience,* 7: 692-693.

National Research Council (2011), Climate Stabilization Targets: Emissions, Concentrations, Impacts over Decades to Millenia, Washington.

National Research Council (2011), America's Climate Choices, National Academies Press.

Pan Jia Hua and Ying Chen (2009), The **Carbon Budget** Scheme: An Institutional Framework for a Fair and Sustainable World Climate Regime, Social Sciences in China.

WBGU (2009), Solving the Climate Dilemma, The Carbon Budget Approach, *www. wbgu. de/fileadmin/templates/dateien/wbgu_sn2009_en.pdf*

Winkler et al (2011), A South African approach-responsibility, capability and sustainable development, published in "Equitable access to sustainable development: Contribution to the body of scientific knowledge', A paper by experts from BASIC countries, Winkler H. et al, 2011.

Further references on the carbon budget approach:

Kanitkar, T., Jayaraman, T., D'Souza, M., & Purkayastha, P. (2013). Carbon budgets for climate change mitigation—a GAMS-based emissions model. *Current Science, 104(9),* 1200-1206.

Jayaraman, T., Kanitkar, T., D'Souza, M. (2011), 'Equity and burden sharing in emission scenarios: a carbon budget approach' published in Handbook of Climate Change and India: Development, Politics and Governance, Dubash N.K. (ed), Nov. 2011, Routledgc http://www.cprindia.org/seminars-conferences/3364-handbook-climate-change-and-india-development-politics-and-governance

Jayaraman, T., Kanitkar, T., D'Souza, M.(2011) , 'Equitable access to sustainable development: An Indian approach', published in 'Equitable access to sustainable development: Contribution to the body of scientific knowledge', A paper by experts from BASIC countries, Winkler H. et al, 2011 *www.erc.uct.ac.za/Basic_Experls_Paper.pdf*

Global Carbon Budgets and Burden Sharing in Mitigation Actions: Discussion Paper, Supplementary Notes and Summary Report', Jun. 2010 http://climate.tiss.edu/attachments/carbon-budgets-2010/at—download/file

Kanitkar, T., Jayaraman, T., D'Souza, M, Purkayastha, P., Raghunandan, D., Talwar, R. (2009), 'How Much 'Carbon Space' Do We Have? Physical Constraints on India's Climate Policy and its Implications', Economic & Political Weekly, Vol XLIV No. 41, Oct. 10, 2009 http://www.epw.in/epw/uploads/articles/14044.pdf

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও কৃষি সুরক্ষা

কলিকালে সবই উলটো। জলবায়ুর রকমসকম দেখে বলাবলি শুরু করেছে অনেকেই। জলবায়ুর ভোলবদলের হেতু এখন জানা। দ্রুত, আরও দ্রুত উন্নয়নের লাগামছাড়া দৌড় ও মানুষের অবিমৃশ্যকারিতার মাশুল গুনতে হচ্ছে। আতান্তর বিশ্বজুড়ে। নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘ। কৃষি ভারতে রুজিরোজগারের এক বড় অবলম্বন। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা লাগে চাষবাসে। ভারতের পক্ষে তাই এটা উদ্বেগের বিষয়। মুশকিল আসানে দরকার জলবায়ু রদবদলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ও তা কমানো। কেরলের নজির তুলে ধরে কলমচি বলেছেন ১৫০ বছরেরও বেশি আগে চাষিরা প্রতিকূল জলবায়ুর মোকাবিলা করেছে। হাল ছেড়ে না দেবার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতে সবুজ বিপ্লবের পিতা। এই নিয়ে লিখছেন **এম এস স্বামীনাথন।**

এই সবে স্থায়ী উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ ঠিক করেছে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশগুলি। এর মধ্যে ১৩নং লক্ষ্যটিতে জলবায়ুর ভোলবদল ও তার প্রভাবের সঙ্গে যুঝতে রাষ্ট্রগুলিকে জরুরি ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। নভেম্বর-ডিসেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত সম্মেলন হচ্ছে প্যারিসে। প্যারিস বৈঠকের পর, রাষ্ট্রগুলি জলবায়ু পরিবর্তন কমানো ও তার রদবদলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য নিজেদের ইতিকর্তব্য ঠিক করার কর্মকৌশল চূড়ান্ত করবে। কৃষি ভারতে রুজিরোজগারের প্রধান অবলম্বন। গড় তাপমাত্রার প্রতিকূল ওঠানামা, বাড়তি বা ঘাটতি বৃষ্টি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং উপকূল অঞ্চলে ঝড়ঝঞ্ঝা, সুনামির বাড়াবাড়ি আমাদের বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। এ যাবৎ গোটা বিশ্ব, বিশেষত উন্নত দেশগুলির নেওয়া ব্যবস্থাদির ফলে এই শতকের শেষ নাগাদ গড় তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো বাড়ার সম্ভাবনা।

গড় উচ্চতা ২-৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়লে উত্তর ভারতে গমচাষের সময়কাল যাবে কমে। গমের ফলন কমবে ফি-বছর ৬০-৭০ লাখ টন। উষ্ণতা সামান্য একটু বাড়লে সাইবেরিয়া বা উত্তর কানাডার মতো কিছু অঞ্চলের অবশ্য পোয়াবারো। কারণ এর ফলে ওসব জায়গায় গমচাষের মেয়াদ বেড়ে যাবে। অর্থাৎ কি না, অঞ্চলভেদে উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবে হেরফের থাকবে। গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে সাহায্য করা ভারতের নীতি। এই নীতিমাফিক ভারত সরকার গত ১ অক্টোবর ২টি বড় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে—

(ক) ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস ২০০৫-এর ৩৫ শতাংশ স্তর থেকে ৩২-এ নামিয়ে আনা।

(খ) পরমাণু, সৌর, বায়ু, বায়োমাস ও বায়োগ্যাসের মতো অ-জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক শক্তি উৎপাদন হবে মোট শক্তি উৎপাদনের ৪০ শতাংশের মতো।

গড় উষ্ণতা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের সম্ভাব্য বৃদ্ধি আমাদের দেশের পক্ষে মস্ত দুশ্চিন্তা। প্রতিকূল জলবায়ুর প্রভাব থেকে জীবন ও জীবিকাকে সুরক্ষিত করার জন্য আমাদের আগাম ব্যবস্থা নিতে হবে। ভালো মৌসুমিতে ফলন সর্বোচ্চ করা এবং জলবায়ু রদবদলের প্রতিকূল প্রভাব যথাসম্ভব কমানোই আমাদের স্ট্র্যাটেজি হওয়া দরকার। উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং ঘাটতি বা বাড়তি বৃষ্টিপাতের প্রভাব সর্বাত্মক। তাহলেও এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ও এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর কর্মকৌশলকে (অ্যাকশন প্ল্যান) হতে হবে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক। পঞ্চায়েত স্তরে আমাদের গড়ে তুলতে হবে জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (ক্লাইমেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সেন্টার)। প্রশিক্ষণ দিতে হবে সমাজ জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপকদের (কমিউনিটি ক্লাইমেট রিস্ক ম্যানেজার্স।

বাজরা খুব প্রতিকূল বা রুক্ষ জলবায়ু সইতে পারে। এক সময় আমাদের দেশে অনেক জায়গায় মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল এই শস্য। বাজরা চাষ বাড়ানোর জন্য জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। খাদ্যতালিকাতেও ফের ঠাঁই দিতে হবে একে। বাজরা ও এ জাতীয় আরও কিছু কম ব্যবহৃত শস্য খরা ও প্রচণ্ড তাপ সহ্য করতে পারে। আর এগুলি যথেষ্ট পুষ্টিকরও। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানানসই চাষবাস পদ্ধতি ঠিক করতে হবে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিকে। জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত স্থানীয় পুরুষ ও মহিলাদের মাধ্যমে তা জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। চাষবাসের কিছু ক্ষেত্রে রদবদল আনা এবং এসবে আগাম গবেষণা দরকার। যেমন, ধান ও গম। কেননা, জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন এসব চাষের জন্য সময় মিলবে কম। আলুচাষে ভারত এক অগ্রণী দেশ। আলুগাছের কাণ্ড থেকে রস শোষক ক্ষুদ্র কীট (অ্যাফিড) মুক্ত মরশুমে আলুবীজ উৎপাদনের দরুন এটা সম্ভব হয়েছে। এই কীটেরা ভাইরাস জনিত রোগের বাহক। বছরের কিছু সময় এদের প্রাদুর্ভাব বেশি। তাই অ্যাফিড মুক্ত মরশুমে রোগবালাইহীন আলুবীজ উৎপাদন সম্ভব। গড় তাপ বাড়লে এই বীজ উৎপাদন করা যাবে না। তখন আলুচাষের জন্য শরণ নিতে হবে বিকল্প বীজ (ট্রু সেকশুয়াল সিডস)-এর। এহেন সমস্যাদি নিয়ে গবেষণা জোরদার করা দরকার।

আরও ঘনঘন বান-বন্যা ও শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়ঝঞ্ঝার জন্য প্রস্তুতি নেবার দিকেও নজর দেওয়া চাই। সৌভাগ্যের কথা, বন্যাতে দিব্যি বেড়ে উঠতে পারার মতো গাছপালার জিন এখন আমাদের নাগালে। এক্ষেত্রে ধানগাছ বিশেষ উল্লেখ্য। বন্যাপ্রবণ এলাকায় এমনতরো ইলনগেশন জিনযুক্ত ফসলের চাষ চালু করা দরকার। ভারতে উপকূল রেখা লম্বায় ৭৫০০ কিলোমিটার। এছাড়া আছে আন্দামান-নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপ। তাই উপকূল অঞ্চল এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। এসব এলাকায় বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ জঙ্গল সংরক্ষণ করা উচিত। লবণাম্বু গাছপালা লাগাতে হবে আরও বেশি জায়গা জুড়ে। লবণাম্বু উদ্ভিদের বন এক জৈব ঢাল বা বায়োশিল্ড হিসেবে কাজ করে। পৃথিবীতে জলসম্পদের ৯৭ শতাংশ সমুদ্রজল। নোনা জলে চাষবাসের অপেক্ষাকৃত নতুন পদ্ধতির (বায়ো স্যালাইন ফার্মিং) সুযোগও এখন হাতের কাছে। নুন সহিষ্ণু উদ্ভিদ (হ্যালোফাইট) ও সামুদ্রিক অ্যাকোয়াকালচার, দু'ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে। আজকাল নয়, ১৫০ বছরেরও বেশি আগে, কেরলের কুট্টানাডের চাষিরা সমুদ্রপৃষ্ঠের চেয়ে নাবাল জমিতে ধানচাষে তুখোড় ছিল। এজন্য দরকার নোনাজল ব্যবস্থাপনা ও নুন সহিষ্ণু *পোক্কালি* জাতের ধান। কুট্টানাড চাষিদের এই উদ্ভাবনী ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। কুট্টানাড কৃষি ব্যবস্থাকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা বলে ঘোষণা করেছে। আর কুট্টানাডে সমুদ্রপৃষ্ঠের চেয়ে নিচুতে চাষ সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেরল সরকার। সুন্দরবনের মতো অঞ্চল এবং মলদ্বীপ মাফিক দেশের ক্ষেত্রেও বেশ কাজে লাগবে এরকম কেন্দ্র।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার দরুন উপকূল লাগোয়া বাসিন্দাদের জন্য বিকল্প জায়গা খোঁজা দরকার। জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য উপযুক্ত জায়গার সংস্থানে পরিকল্পনা শুরু করতে হবে। নুন সহিষ্ণু গাছ সংরক্ষণের জন্য তামিলনাড়ুর বেদঅরন্যমে এ ধরনের উদ্ভিদের এক জিন উদ্যান গড়েছে এম এস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন। গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর লক্ষ্যে কৃষিরও অবদান থাকা চাই। স্থানীয় লোকজনের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেই অঞ্চলের জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র এক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ করতে পারে। জলবায়ুর ভোলবদলের দরুন খাওয়ার জল, জ্বালানির কাঠকুটো, গোরু-মোষের খাস-খড় ইত্যাদি জোগাড়ে হিমশিম খেতে হয় গাঁয়ের মেয়েদের। জলবায়ুর পরিবর্তন রুখতে তাই মহিলাদের শামিল করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তন কমানোর ব্যবস্থাগুলির মধ্যে বনোচ্ছেদ রোধ ও বনায়ন অন্যতম। এতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর আধিক্য কমবে। আর এক গ্রিনহাউস গ্যাস মিথেনকে কাজে লাগানো যেতে পারে বায়োগ্যাস প্লান্টের জন্য। এতে ফায়দা দুনো। বায়ুমণ্ডলে কমবে মিথেনের পরিমাণ। সেইসঙ্গে মিলবে জ্বালানি গ্যাস ও সার। জমিতে রাসায়নিক সার দিলে নাইট্রাস অক্সাইড নির্গত হয়। ইউরিয়ায় নিমের পোঁচ দিলে এটা কমানো সম্ভব। বস্তুত, গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় স্তরে কার্বন কমানোর সেরা হাতিয়ার হচ্ছে **"একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, কৃষি-বনায়ন প্রকল্পে এমন কিছু গাছ লাগানো (ফার্টিলাইজার ট্রি) যা মাটির উর্বরতা বাড়ায়, ও বায়ু থেকে নাইট্রোজেন শুষে নিয়ে শিকড়বাকড় এবং পাতার মাধ্যমে মাটিতে মিশিয়ে দেয়, প্রতিটি খামারে একটি পুকুর" নীতি অনুসরণ।**

স্থানীয় স্তরে জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপকদের মধ্যে থাকবে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই। জলবায়ুর সঙ্গে মানানসই চাষবাস পদ্ধতির বিকাশে তার হবে নেতৃস্থানীয়। চাষের এই পদ্ধতিতে অবশ্যই ঠাঁই দিতে হবে ডালজাতীয় শস্যকে। ডালগাছ জমিতে নাইট্রোজেন বাড়ায়। আবার মানুষকে জোগায় প্রোটিনে ভরপুর খাদ্য। প্রোটিনের পরিমাণে ডাল গরিবের কাছে মাংস।

উপকূল অঞ্চলে এখন তথ্য প্রযুক্তি কাজে লাগানোর যথেষ্ট সুযোগ। মুঠোফোনের মাধ্যমে সমুদ্রে ঝড়ঝঞ্ঝা, উত্তাল ঢেউ সংক্রান্ত খবরাখবর ছোটখাট মৎস্যজীবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় চটজলদি। মাছের ঝাঁক কোথায় তার তত্ত্বতালাশও। মৎস্যজীবী বান্ধব ইন্টারনেট ও মোবাইল টেলিফোন কম সংগতিওয়ালা মৎস্যজীবীদের জীবনে রূপান্তরের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। ২০০৪-এর ২৬ ডিসেম্বর ভয়াবহ সুনামির পর তারা ভয় খেয়ে গিয়েছিল। এখন অবশ্য ছোট নৌকোয় মাছ ধরার জন্য সাগরে পাড়ি জমায় বুক চিতিয়ে।

এখন ব্যবস্থা না নিলে, জলবায়ু পরিবর্তন বিলক্ষণ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাপ, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতায় পরিবর্তন নিয়ে আগাম প্রস্তুতি নিলে, চাষবাসে নতুন প্রযুক্তি চালু করা সম্ভব। ক্ষুদ্র কৃষি ও মৎস্যজীবীদের পেশায় প্রযুক্তির এই রূপান্তর সুফল আনতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন ফসলের দাম চড়েছে ইতোমধ্যেই। ভবিষ্যতে চড়া দামে খাদ্যশস্য আমদানি করা সাধ্যের মধ্যে নাও কুলোতে পারে। সেজন্য আগামী দিনে, শস্ত্র নয়, শস্যে বলীয়ান দেশগুলি দাপট দেখাবে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে। জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সম্ভাব্য বিপর্যয়কে পালটে কৃষি সুরক্ষার লক্ষ্য অর্জনে হাতিয়ার করার এক অসামান্য সুযোগ এসেছে এখন।❑

[লেখক বিশ্বের অন্যতম কৃষি-বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন এবং ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক। তাঁর পাওয়া সম্মানগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার হল : রেমন ম্যাগসেসে পুরস্কার (১৯৭১), পদ্মশ্রী (১৯৬৭), পদ্মভূষণ (১৯৭২), অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বিশ্ব বিজ্ঞান পুরস্কার (১৯৮৬), কৃষিতে নোবেল পুরস্কারের সমতুল্য বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার (১৯৮৭-প্রথম প্রাপক) ও পদ্মবিভূষণ (১৯৮৯)।

email : founder@mssrf.res.in/

Twitter:@msswaminathan]

জানেন কি ?

কার্বন পৃথকীকরণ

ভাটিকা চন্দ্রা

কার্বন পৃথকীকরণ এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল ও বড় কলকারখানার মতো নৃতাত্ত্বিক (মানব-সৃষ্ট) উৎস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখা হয়, যাতে তা পরবর্তীকালে ব্যবহার করা যায়। বড় মাপের মানব-সৃষ্ট উৎসস্থলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শোধনাগার, বিদ্যুৎ, কয়লা ও গ্যাস, ইথানল, সিমেন্ট উৎপাদন কেন্দ্র ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের মতো বৃহৎ শিল্প। এই প্রক্রিয়ার তিনটে ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে, উল্লেখিত উৎসগুলো থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ (ক্যাপচার) করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে, সংগ্রহ করা কার্বন ডাইঅক্সাইড সংকুচিত (কম্প্রেস) করে পাইপলাইন, ট্রেন, ট্রাক বা জাহাজে করে স্থানান্তরিত (ট্রান্সপোর্ট) করা হয়। তৃতীয় ধাপে, এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গভীর ভূগর্ভস্থ শিলা স্তরে দীর্ঘ সময়ের জন্য সঞ্চয় (স্টোর) করে রাখা হয়।

কার্বন পৃথকীকরণ দু'ধরনের—স্থলজ পৃথকীকরণ ও ভূতাত্ত্বিক পৃথকীকরণ। স্থলজ পৃথকীকরণ পদ্ধতিতে উদ্ভিদের গোড়ায়, কাণ্ডে বা ডালপালায় ও মাটিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষের সময় ব্যবহার করা হয় এবং উদ্ভিদটা শুকিয়ে গেলে তার কার্বন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটিকে আরও উর্বর বানায়। অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে প্রধানত জমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপায়ে উদ্ভিদ ও মাটিতে আরও বেশি পরিমাণে কার্বন দীর্ঘতর সময়কালের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

অন্যদিকে, ভূতাত্ত্বিক পৃথকীকরণ পদ্ধতিতে সংগৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড ভূগর্ভে বেলেপাথর বা বালুশিলা, ব্যাসল্ট, ডলোমাইট, কর্দম, নোনা পাথর এবং ভূগর্ভস্থ কয়লাস্তরের মতো কঠিন, ঝাঁঝর শিলাস্তরে সূচিপ্রয়োগ বা 'ইনজেকশন'-এর মাধ্যমে সঞ্চিত করে রাখা হয়। এই শিলাস্তর অ-ঝাঁঝর ও কঠিন, অভেদ্য শিলার স্তরের নীচে অবস্থিত বলে ছিদ্রপথে ওপরের দিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছড়িয়ে যাওয়া রোধ করা সম্ভব হয়। ছিদ্রপথে যাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে না পড়ে, তা সুনিশ্চিত করে সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করতে সূচিপ্রয়োগের আগে সংরক্ষণ-স্থলের যথাযথ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ধরা যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে ৪০ শতাংশেরও বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন হয়। এই প্রযুক্তি যদি ৫০০ মেগাওয়াটের একটা তাপবিদ্যুৎ (কয়লার উপর নির্ভরশীল) কেন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন এড়ানো সম্ভব হবে তা ৬ কোটি ২০ লক্ষ গাছ লাগানোর এবং ৩ লক্ষ বাড়ির বার্ষিক বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য হওয়া নির্গমনের সমান—এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই প্রযুক্তি পরিবেশবান্ধব। পানীয় ও খাদ্য উৎপাদন, কাগজ ও কাগজের মণ্ড শিল্প, ধাতু ও তেল সংক্রান্ত শিল্পের মতো ক্ষেত্রে এই সংগৃহীত ও সঞ্চিত কার্বন ডাইঅক্সাইড বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। কার্বন পৃথকীকরণের গুরুত্ব বাড়ছে, বিশেষত বর্তমানে এবং আগামী দিনেও এর গুরুত্ব আরও বাড়বে, কারণ এই পদ্ধতি সিমেন্ট উৎপাদন ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ শিল্প থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা অনেকটা কমাতে সাহায্য করতে পারে। সে জন্যই, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিশ্বব্যাপী সংকটের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না।❑

সংশোধন

যোজনা পত্রিকার সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় ড. ইশের আলুওয়ালিয়া রচিত "বিকাশের চালিকা শক্তি হিসেবে শহর" শীর্ষক নিবন্ধে পৃ. ১০-এর শেষ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় লাইনে ভুলবশত "**২ লক্ষ কোটি**" ছাপা হয়েছে। সঠিক পরিসংখ্যান হল : "সকলের জন্য আবাসন মিশনে ২০২২ সালের মধ্যে **২ কোটি** বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।" এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(১৬ অক্টোবর—১৫ নভেম্বর ২০১৫)

বহির্বিশ্ব

● **ফ্রান্সে ধারাবাহিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ :**

১৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের সন্ধ্যায়, ফ্রান্সের প্যারিস ও সেন্ট-ডেনিসে একটি ধারাবাহিক সমন্বিত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ঘটে। আক্রমণটি গণহত্যা, আত্মঘাতী বোমা হামলা, বোমা হামলা ও বন্ধক বানানোর মাধ্যমে করা হয়। কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় ২১:১৬ শুরুতে, সেন্ট-ডেনিসের উত্তর শহরতলিতে স্টাডে দে ফ্রান্সের বাইরে তিনটি পৃথক আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং কেন্দ্রীয় প্যারিসের কাছাকাছি চারটি ভিন্ন স্থানে গণহত্যা ও আত্মঘাতী বোমা হামলা ঘটে। ভয়াবহ হামলাটি হয় বাতাক্লান থিয়েটার যেখানে আক্রমণকারী সেখানে থাকা নাগরিকদের জিম্মি করে; পরে পুলিশ ভারী অস্ত্রসহ সেখানে অভিযান চালায় যা শেষ হয় ১৪ নভেম্বর ২০১৫, ০০:৫৮ কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময়ে। ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড লেভান্ট (আইএসআইএল) এই হামলার দায় স্বীকার করে।

এই হামলায় অন্তত ১২৮ জন নিহত হয়, যার মধ্যে ৮৯ জন নিহত হন বাতাক্লান থিয়েটারে। এই হামলায় প্রায় ৪১৫ জন আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যার মধ্যে ৮০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আক্রমণে নিহতরা ছাড়াও, ৭ জন আক্রমণকারী মারা যায় এবং কর্তৃপক্ষ তাঁদের কোনও সহযোগী রয়েছে কি না তার জন্য অনুসন্ধান অব্যাহত রাখে। আক্রমণটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ফ্রান্সে ঘটা সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী হামলা; এবং এটি ২০০৪ সালে মাদ্রিদ বোমাবর্ষণের পর ইউরোপে হওয়া সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী হামলা।

জবাবে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ, জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন, যা ২০০৫-এর দাঙ্গার পর থেকে প্রথম এবং ফ্রান্সের সীমানার উপর অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। মানুষ এবং বিভিন্ন সংগঠন সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে সহ সংহতি প্রকাশ করে। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ বলেন যে, আক্রমণটি 'ইসলামিক স্টেট অভ্যন্তরীণ সাহায্য নিয়ে' বিদেশ থেকে সংগঠিত করেছে এবং এটিকে তিনি 'যুদ্ধের কাজ' হিসেবে অভিহিত করেন।

১৫ নভেম্বর, আক্রমণের প্রতিশোধ হিসেবে সিরিয়ার আল-রাক্কায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ফ্রান্স আইএসআইএল-বিরোধী বোমা প্রচারাভিযান শুরু করে, যা তাদের ইতিহাসের বৃহত্তম একক বিমান হামলায় অপারেশন।

এই আক্রমণের আগে, ফ্রান্স অক্টোবর ২০১৫ থেকে, সিরিয়া-সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গা লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করে। আইএসআইএল-এর আক্রমণ সিরীয় ও ইরাকি গৃহযুদ্ধে ফরাসি সম্পৃক্ততার প্রতিশোধ ছিল। সেই সপ্তাহে আক্রমণ করতে অগ্রসর হওয়ার আগে, আইএসআইএল দুই দিন আগে বৈরুতে দুই আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং ৩১ অক্টোবর কোগালিমাভিয়া ফ্লাইট ৯২৬৮ ধ্বংস করা-সহ বেশ কয়েকটি হামলার দায় স্বীকার করে। ফ্রান্স জানুয়ারি ২০১৫-এর আক্রমণের পর থেকে উচ্চ সতর্কতায় ছিল যে আক্রমণে পুলিশ কর্মকর্তা ও বেসামরিক ব্যক্তি-সহ ১৭ জন নিহত হয়।

● **পাক মদতে আরবসাগরে চীন :**

আরবসাগরে ঘাঁটি গাড়তে চীনকে ব্যবস্থা করে দিল পাকিস্তান। বন্দর তৈরির জন্য বালুচিস্তানে ২০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে পাকিস্তান তা চীনের সংস্থাকে হস্তান্তর করেছে। পাঁচ বছরের মধ্যে বন্দর ও করিডোর নির্মাণের কাজ শেষ করা হবে বলেও চীনের তরফে জানানো হয়েছে। এই বন্দর তৈরি হয়ে গেলে আরবসাগরে স্থায়ী আস্তানা বানাতে পারবে চীন।

বেজিং আর ইসলামাবাদের তরফে বলা হচ্ছে, দু দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতেই গোয়াদরে চীনা বন্দর তৈরির ব্যবস্থা। চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের কাশগড় শহরের সঙ্গে সড়কপথে জুড়তে চলেছে পাকিস্তানের গোয়াদর। দু দেশই বলছে এটি একটি অর্থনৈতিক করিডোর। এই করিডোর এবং গোয়াদর বন্দরের সুবাদে মধ্যপ্রাচ্যে পণ্য রপ্তানি এবং সেখান থেকে খনিজ তেল আমদানির খরচ অনেকটা কমাতে পারবে চীন।

এই করিডোর নিয়ে ইতিমধ্যেই আপত্তি তুলেছে ভারত। শুধু সড়ক যোগাযোগ নয়, গোয়াদর থেকে বালুচিস্তানের ভিতর দিয়ে, গিলগিট-বাল্টিস্তান হয়ে চীনের কাশগড় পৌঁছচ্ছে খনিজ তেলের পাইপ লাইন। এই গিলগিট-বাল্টিস্তান পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অংশ। ওই এলাকা ভারতের না পাকিস্তানের তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

● **২৫ বছর পর অবাধ ভোটে মায়ানমারে জয় সু চি-র দলের :**

মায়ানমারে হইহই করে জিতেছে আউং সান সু চি-র দল 'ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি' বা এনএলডি। ২৫ বছর পর মায়ানমারে প্রথম অবাধ সাধারণ নির্বাচনে কার্যত ধরাশায়ী হয়েছে শাসক দল 'ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি' বা ইউএসডিপি।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মায়ানমারে সরকার গঠন করতে চলেছে আউং সান সু চি-র দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি (এনএলডি)। তবে সামরিক সরকারের তৈরি সংবিধান অনুযায়ী সু চি-র সন্তানরা বিদেশি নাগরিক হওয়ায় তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। কিন্তু, এনএলডি ঘোষণা করেছে, 'অ্যাবাভ দ্য প্রেসিডেন্ট'—অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের মাথার উপর থাকবেন দলনেত্রী।

● **অবশেষে জামাত-লস্কর যোগের স্বীকারোক্তি :**

২০০৮-এ মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদের সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়া যে লস্করেরই শাখা, মেনে নিল পাকিস্তান। একই সঙ্গে জামাতের হয়ে প্রচারের ক্ষেত্রে দেশের সব বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের উপরেই নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইসলামাবাদ। ৩ নভেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে পাকিস্তান ইলেকট্রনিক মিডিয়া রেগুলেটরি অথরিটি (প্রেমা) জানিয়েছে, 'শুধু জামাত নয়, লস্করের সব শাখা সংগঠন-সহ দেশে নিষিদ্ধ মোট ৭২টি জঙ্গি সংগঠনের ক্ষেত্রেই আমাদের এই নির্দেশ।' স্থানীয় কিছু এফএম চ্যানেলের অবশ্য দাবি, তাদের কাছে এমন কোনও বার্তা আসেনি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ।

● **ঢাকায় জঙ্গিদের হাতে খুন প্রকাশক, আহত তিন :**

ব্লগার এবং লেখক অভিজিৎ রায় খুন হয়েছেন আগেই। ৩১ অক্টোবর তাঁর বইয়ের দুই প্রকাশকের দপ্তরে ঢুকে মালিকদের কোপাল দুষ্কৃতীরা। নিহত হয়েছেন এক প্রকাশক। গুরুতর জখম হয়েছেন আর এক প্রকাশক-সহ তিনজন। আর এই দুই হামলারও দায় স্বীকার করেছে 'আনসার আল ইসলাম' নামে একটি জঙ্গিগোষ্ঠী।

নিহত ফয়সাল আরেফিন দীপন 'জাগৃতি' প্রকাশনা সংস্থার মালিক। দীপন ব্লগার অভিজিতের 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নামের বইটি প্রকাশ করেছিলেন। জখম প্রকাশক আহমেদ রশিদ টুটুল প্রকাশনা সংস্থা 'শুদ্ধস্বর'-এর মালিক। এছাড়াও জখম হয়েছেন তারেক রহিম এবং রণদীপম বসু নামে দুই ব্লগার। শুদ্ধস্বর থেকেই প্রকাশ হয়েছে অভিজিতের বই 'অবিশ্বাসের দর্শন'।

সম্প্রতি একের পর এক ব্লগার এবং লেখক খুনের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছে বাংলাদেশ। চলতি বছরেই অভিজিৎ রায় ছাড়াও খুন হয়েছেন ওয়াশিকুর রহমান, অনন্তবিজয় দাস এবং নিলাদ্রিনিলয় চট্টোপাধ্যায়। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল দীপনের নাম। এর আগে প্রতিটি ব্লগার খুনের দায় স্বীকার করে ইন্টারনেটে বিবৃতি দিয়েছিল আনসারুল্লা বাংলা টিম নামে একটি স্বঘোষিত ইসলামি জঙ্গি সংগঠন। এদিন রাতে আনসার আল ইসলাম নামে একটি সংগঠন টুইটারে নিজেদের আল কায়দার স্থানীয় শাখা দাবি করে অভিজিতের দুই প্রকাশকের দপ্তরে হামলার দায় স্বীকার করেছে।

● **রুশ যাত্রী বিমান ধ্বংস করল আইএসআইএল :**

সিরিয়ায় আইএসআইএল জঙ্গি শিবির ভাঙতে যখন সামরিক অভিযান চালাচ্ছে মস্কো, ঠিক তখনই পর্যটক বোঝাই রুশ বিমান ভেঙে পড়ল মিশরে। ২১৭ জন যাত্রী এবং ৭ রুশ বিমান কর্মী—কেউই বেঁচে নেই। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইসলামিক স্টেট দাবি করল নাশকতা ঘটিয়েছে তারা। যদিও কায়রো বিমানবন্দর সূত্রে জানানো হচ্ছে, শার্ম-এল-শেখ থেকে বিমান ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাইলট যান্ত্রিক গোলযোগের কথা জানিয়ে সংকেত পাঠিয়েছিল।

মিশর থেকে যাত্রী বোঝাই এয়ারবাসটি ফিরছিল রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে। ২১৭ জন যাত্রীর মধ্যে ২১৪ জনই রুশ নাগরিক। তিনজন ইউক্রেনের। ১৩৮ জন মহিলা, ৬২ জন পুরুষ এবং ১৭ শিশু ছিল যাত্রী তালিকায়। আকাশে ওড়ার ২৩ মিনিট পরই এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে বিমানটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরই মধ্য সিনাইয়ের হাসানা অঞ্চলে বিমানটির ধ্বংসাবশেষ মেলে। যে অঞ্চলে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানে আইএসআইএল জঙ্গিদের কিছুটা প্রভাব রয়েছে।

● **নেপালে মহিলা প্রেসিডেন্ট :**

নেপালের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন কমিউনিস্ট নেত্রী বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী। ৫৪ বছর বয়সি এই নেত্রী দেশে মহিলাদের অধিকার নিয়ে লড়াই করে গিয়েছেন। ২৮ অক্টোবর পার্লামেন্টের স্পিকার ওনসারি ঘারতি বিদ্যাদেবীকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, বিদ্যাদেবী পেয়েছেন মোট ৩২৭টি ভোট। যেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নেপালি কংগ্রেস নেতা কুলবাহাদুর গুরুঙ্গ পেয়েছেন ২১৪টি ভোট। অন্যদিকে, বিদ্যাদেবী হলেন দেশের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট। নেপালে কয়েক শতকের পুরোনো রাজতন্ত্র ভেঙে যাওয়ার পর রামবরণ যাদব দীর্ঘ সাত বছর ধরে প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন।

● **ভূমিকম্পের কবলে পাকিস্তান-আফগানিস্তানের বিস্তীর্ণ অংশ :**

গত ২৬ তারিখ ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বত সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। একই সঙ্গে কম্পন অনুভূত হয় পাকিস্তান আর ভারতের একটা বড় অংশে। ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৩৫০ ছাড়িয়েছে।

● **রাষ্ট্রপতি খুনের চেষ্টার দায়ে গ্রেফতার মলদ্বীপের উপ-রাষ্ট্রপতি :**

দেশের রাষ্ট্রপতি আবদুল্লা ইয়ামিনকে খুনের চক্রান্তের দায়ে গ্রেফতার করা হল মলদ্বীপের উপ-রাষ্ট্রপতি আহমেদ আদিবকে। তাঁকে ধুনিধু দ্বীপে জেলে রাখা হয়েছে বলে মলদ্বীপের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উমর নাসির জানিয়েছেন। ধৃত উপ-রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনা হয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ।

২৮ সেপ্টেম্বর মলদ্বীপের রাষ্ট্রপতি যখন নৌকাবিহার করছিলেন, তখন তাঁর নৌকায় বিস্ফোরণটি হয়। অল্পের জন্য বেঁচে যান প্রেসিডেন্ট ইয়ামিন। কিন্তু ওই বিস্ফোরণে তাঁর স্ত্রী ফতিমা ইব্রাহিম-সহ জখম হন আরও দুজন। তদন্তে বেরিয়ে আসে ওই ঘটনায় জড়িত ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি আহমেদ আদিব।

২৪ অক্টোবর চীন-সফর সেরে ফেরার পথে মলদ্বীপের বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয় আদিবকে। অভিযোগ, ইয়ামিনকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যই বিস্ফোরণের ছক কষেছিলেন আদিব।

● **হ্যারিকেন প্যাট্রিসিয়ায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি মেক্সিকোয় :**

মেক্সিকোর দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আছড়ে পড়ল ভয়ংকর হ্যারিকেন 'প্যাট্রিসিয়া'। প্রশান্ত মহাসাগরে এর আগে এমন বিধ্বংসী হ্যারিকেন আর হয়নি। তবে এখনও পর্যন্ত হতাহতের খবর মেলেনি।

২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় ওই ভয়ংকর হ্যারিকেন আছড়ে পড়ে মেক্সিকোয়। ওই সময় ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ২০০ কিলোমিটার। সঙ্গে এক নাগাড়ে ভারী বৃষ্টি। বহু ঘর-বাড়ি চলে গিয়েছে জলের তলায়। বহু মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। বিধ্বংসী ঝড়ে প্রচুর বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে। উপড়ে পড়ে বিদ্যুতের খুঁটি। ছোট ছোট বহু ঘর-বাড়ির মাথার টিন বা অ্যাসবেস্টসের চাল উড়ে যায়।

● **টাইফুন 'কোপ্পু' কাঁপাল ফিলিপিন্সের দ্বীপ :**

ভয়ংকর টাইফুন 'কোপ্পু' আছড়ে পড়ে উত্তর ফিলিপিন্সে। যার জেরে ১৮ অক্টোবর সকালে কার্যত, ধ্বংসস্তূপের চেহারা নেয় দেশের উত্তর প্রান্তে লুজন দ্বীপের ক্যাসগুরান শহরটি। সঙ্গে ছিল বিধ্বংসী ঝড়ের তাণ্ডব। ঝড়ের বেগ ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি। 'কোপ্পু'-র দাপটে উপকূলবর্তী সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্চতা হয় ১২ ফুটেরও বেশি। আরও তিন দিন ধরে হয় ভারী বৃষ্টি।

● **কানাডায় জয় লিবারাল পার্টির জুস্ত্যাঁর :**

প্রায় এক দশকের কাছাকাছি সময় কনজারভেটিভ শাসনের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় লাভ করল কানাডার লিবারাল পার্টি। ন' বছরের প্রধানমন্ত্রী এবং কনজারভেটিভ শাসক স্টেফান হার্পার হেরে গেলেন। মাত্র ৯৯টি আসনেই লড়াই থেমে গেল তাদের। লিবারাল পার্টির তরুণ নেতা জুস্ত্যাঁ ত্রুদোই এবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন।

আর এই ভোটে ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থীরা জিতেছেন ১৯টি আসনে। এর মধ্যে ১৫ জনের জয় লিবারালদের হয়ে। কনজারভেটিভদের হয়ে জিতেছেন তিনজন।

জুস্ত্যাঁর বাবা প্রয়াত পিয়ের ত্রুদোও দীর্ঘ সময় দেশ শাসন করেছেন। জনপ্রিয় এই নেতা ১৯৬৮-১৯৭৯ সাল এবং ১৯৮০-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পদে ছিলেন। তাঁকে আধুনিক কানাডার জনক বলে মনে করা হত।

বেশকিছু বছর ধরে কানাডার অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হাল যথেষ্ট সঙ্গিন হয়ে পড়েছিল। হার্পার যেসব আশ্বাস দিয়ে ক্ষমতায় আসেন, তার মধ্যে আর্থিক প্রতিশ্রুতিগুলি প্রায় ধসে গিয়েছিল। প্রচারের সময়েই কানাডা আর্থিক মন্দার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জমছিল ক্ষোভ।

● **পুতিন-আসাদ সাক্ষাৎ :**

হঠাৎ করেই মস্কো গিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। নির্ধারিত না থাকলেও, ২০ অক্টোবর, মস্কোয় পৌঁছে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন আসাদ।

আইএসআইএল জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আসাদ সরকারের সেনা অভিযানে সেপ্টেম্বরের শেষ থেকেই সিরিয়ায় বিমান হানা শুরু করেছে রাশিয়া।

রুশ প্রেসিডেন্টের দপ্তরের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ জানিয়েছেন, আগামী দিনে সিরিয়ায় আইএস জঙ্গি দমনে রুশ বিমান হানাদারি কোন কোন এলাকায় হবে, তা নিয়ে দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

● **ইসলামাবাদ বিরোধিতায় উত্তাল পাক অধিকৃত কাশ্মীর :**

ইসলামাবাদ বিরোধিতায় ফুঁসছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। বেশ অশান্ত পাকিস্তানের অন্যতম উপদ্রুত এই উপত্যকা। মুজাফফরবাদ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগে বারবার রাস্তায় নেমেছেন সাধারণ মানুষ। চলেছে পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান। সেনার সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের পথ ধরছেন বিক্ষোভকারীরা। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে তাদের উপর হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছে পাক সেনা। একটি নির্দিষ্ট ফুটেজে দেখা গেছে এক বিক্ষোভকারীকে ঘাড় ধরে টানতে টানতে, মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে সেনা। কিন্তু কোনও দমন-পীড়নেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না মানুষের বিক্ষোভকে।

২২ অক্টোবর পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পালিত হয়ে গেল 'কালো দিন'। সে দেশের অন্যতম প্রধান ছাত্র সংগঠন ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন পাকিস্তান বিরোধী এই বিক্ষোভ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। ১৯৪৭-এর ২২ অক্টোবর তৎকালীন অবিভক্ত কাশ্মীরে প্রথম হামলা চালায় পাক সেনা। সেই দিনটাকে মনে রেখেই 'কালো দিন' পালনের ডাক দিয়েছিল এই ছাত্র সংগঠনটি।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ বিশেষত বালুচিস্তানে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে সেনা। যখন তখন যাকে খুশি তুলে নিয়ে গিয়ে ব্যাপক মারধর করছে, এমনকী খুনও করছে। এর জেরে সাধারণ মানুষের মনে তীব্র হচ্ছে ক্ষোভ। জোরালো হচ্ছে পাক-শাসন থেকে স্বাধীনতার দাবি।

এই দেশ

● **প্রধানমন্ত্রীর তিন দিনের ব্রিটেন সফর :**

ব্রিটেনের সঙ্গে অসামরিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের চুক্তি হল ভারতের। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও কয়েকটি চুক্তি হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তিন দিনের সফরে।

১০ ডাউনিং স্ট্রিটে ১২ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এক যৌথ বিবৃতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেছেন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেন-ভারত সহযোগিতায় নতুন মাত্রা যোগ করার কথা ঘোষণা করেন।

দু দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ আর প্রতিরক্ষা সামগ্রী কেনার লক্ষ্য নিয়ে ব্রিটেনে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিন দিনের সফরে। হিথরো বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ভারতে ব্রিটিশ হাই কমিশনার জেমস বেভেন ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হুগো সোয়্যার। তাঁকে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয়।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের আমন্ত্রণে বাকিংহাম প্রাসাদে মধ্যাহ্নভোজও সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্রিটেন সফররত কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্রপ্রধানকে বিশেষভাবে সম্মান জানাতেই তাঁকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানান রানি।

১৩ নভেম্বর ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৭ মিনিটে বাকিংহাম প্রাসাদে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রানি এলিজাবেথ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। সন্ধে ৬টা ৫০ মিনিটে বাকিংহামের অন্দরে রানি ও মোদীর হালকা আলাপচারিতার ছবি টুইটারে পোস্ট করা হয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে।

বাকিংহামে রানির সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের পর ওয়েম্বলিতে প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় ৬০ হাজার মানুষের জমায়েতে নরেন্দ্র মোদী এবং ক্যামেরন যোগদান করেন।

● **স্বচ্ছ ভারত শুল্ক চালু :**

কেন্দ্র আগেই ঘোষণা করেছিল, সমস্ত পরিষেবার উপর স্বচ্ছ ভারত শুল্ক চালু করা হবে। এই করের মাধ্যমে বছরে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা উঠে আসবে সরকারের ঘরে। ফলে এবার থেকে যে কোনও পরিষেবাতেই বাড়তি টাকা গুনতে হবে গ্রাহকদের।

এখন থেকে রেলের আপার ক্লাসে ভ্রমণ করলেই দিতে হবে অতিরিক্ত ০.৫ শতাংশ শুল্ক। পরিষেবা করের সঙ্গে ০.৫ শতাংশ স্বচ্ছ ভারত শুল্ক জুড়ে দেওয়ায় আপার ক্লাসের ভাড়াও বাড়ল ৪.৩৫ শতাংশ। ১৫ নভেম্বর থেকেই এই পরিষেবা কর চালু হয়েছে। পরিষেবা করের উপর স্বচ্ছ ভারত শুল্ককে জুড়ে দেওয়ার কথা কেন্দ্র আগেই জানিয়েছিল। তবে জেনারেল ও স্লিপার ক্লাসের ক্ষেত্রে এই কর নেওয়া হবে না।

প্যান কার্ডের খরচও বাড়ছে এই শুল্ক চালু হওয়ার ফলে। নতুন নিয়মে প্যান কার্ড তৈরি করতে লাগবে ১০৭ টাকা। রেস্তোরাঁয় খেতে গেলেও দিতে হবে এই স্বচ্ছ ভারত শুল্ক।

● **বিহারে জিতল জেডিইউ-আরজেডি-কংগ্রেস-এর মহাজোট :**

বিহার বিধানসভার তিন-চতুর্থাংশ আসন দখল করে নিয়েছে জেডিইউ-আরজেডি-কংগ্রেস-এর মহাজোট। নীতীশ কুমারই ফের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরেই লড়াইতে নেমেছিল মহাজোট। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে নীতীশের শপথ নেওয়ার হ্যাটট্রিক হল।

● **দুর্নীতিতে ভারতকে ছাড়াল চীন :**

'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল'-এর রিপোর্ট জানিয়েছে, দুর্নীতির প্রশ্নে ভারতের থেকে এগিয়ে রয়েছে চীন। দুর্নীতির সূচকে বিশ্বের ১৭৫টি দেশের একটি ক্রমতালিকা তৈরি করে এই সংগঠন। কোন দেশে দুর্নীতি কত কম, সেই সূচকের হিসেবের তালিকায় ভারত রয়েছে ৮৫-তম স্থানে। বেশ কিছুটা পিছিয়ে থেকে চীনের জায়গা হয়েছে ১০০-তম স্থানে। অর্থনীতির বহর বা শিল্পায়নের নিরিখে না হোক, দুর্নীতির মাপকাঠিতে অন্তত চীনকে পিছনে ফেলতে পেরেছে ভারত।

যে দেশ একেবারে দুর্নীতিমুক্ত, তাকে ১০০ শতাংশ নম্বর দিয়ে তালিকা তৈরি করে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল'। এই তালিকায় অবশ্য কোনও দেশেই একশোয় একশো পায়নি। আর ভারত পেয়েছে মাত্র ৩৮ নম্বর। চীন তার থেকে মাত্র দু নম্বর কম পেয়েছে। ১৭৫টি দেশকে নিয়ে তৈরি করা এই তালিকায় সামগ্রিকভাবেও ভারত বেশ খানিকটা পিছিয়ে রয়েছে। সবচেয়ে দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে প্রথম স্থানে রয়েছে ডেনমার্ক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ড। আর সব থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে যৌথভাবে শেষ সারিতে জায়গা পেয়েছে সোমালিয়া এবং উত্তর কোরিয়া।

● **৮০ হাজার কোটির উন্নয়ন প্যাকেজ জম্মু-কাশ্মীরকে :**

জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়নে ৮০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রীনগরে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ৭ নভেম্বর একথা ঘোষণা করেছেন।

এক গুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে জম্মু-কাশ্মীর সফরে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। জনসভায় যোগ দেওয়া ছাড়াও এদিন তিনি একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন এবং একটি জাতীয় সড়কের শিলান্যাস করেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদও প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন।

● **ভারতে ফেরানো হল ছোটা রাজনকে :**

অবশেষে ভারতে ফিরিয়ে আনা হল ছোটা রাজনকে। ভারতীয় তদন্তকারীরা এই গ্যাংস্টারকে নিয়ে বিশেষ বিমানে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ৬ নভেম্বর ভোর ৫টা নাগাদ দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন তাঁরা। আন্তর্জাতিক স্তরে দু-দশক তল্লাশির পর দিন বারো আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার পথে বালিতে গ্রেফতার হন এই মাফিয়া ডন। এর পর থেকেই রাজনকে দেশে ফেরাতে উদ্যোগী হয় কেন্দ্র।

পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিমানবন্দর থেকেই ছোটা রাজনকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ঘিরে সিবিআই সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয়েছে। আপাতত তাদের হেফাজতে রয়েছেন তিনি।

ইন্দোনেশিয়ায় বালিতে ধৃত মাফিয়া ডন রাজনকে নিয়ে দুদিন আগেই দেশে ফেরার কথা ছিল সিবিআই, দিল্লি ও মুম্বই পুলিশের যৌথ দলটির। কিন্তু বালির কাছেই মাউন্ট রিনজানি আগ্নেয়গিরি থেকে শুরু হয় অগ্ন্যুৎপাত। তার জেরে বাতিল করতে হয়েছে বেশকিছু বিমানের উড়ান। পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় বালির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে যায়। বিমানবন্দর খোলার পরে ফের তৎপরতা শুরু হয়।

● **বাংলাদেশ থেকে ফিরলেন আলফা নেতা অনুপ চেটিয়া :**

বাংলাদেশের কারাগারে ১৮ বছর কাটিয়ে অবশেষে ভারতে ফিরলেন এক সময়ে অসম কাঁপানো জঙ্গি সংগঠন আলফার সাধারণ সম্পাদক গোলাপ বরুয়া ওরফে অনুপ চেটিয়া।

দীর্ঘ কূটনৈতিক টালবাহানার পরে ১১ নভেম্বর গভীর রাতে ঢাকায় কাশিমপুর কারাগার থেকে বার করে ভারতীয় দূতাবাসের হাতে তুলে দেওয়া হয় চেটিয়াকে। সেখান থেকে সিবিআই দুই সঙ্গী-সহ (আরও দুই আলফা সদস্য মঙ্গলদইয়ের মনোজ গোস্বামী এবং নগাঁও বেবেজিয়ার লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামী) এই জঙ্গি নেতাকে ভারতে নিয়ে আসে। এই হস্তান্তরের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বর্তমানে আলফার সঙ্গে শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে কেন্দ্র। আলফার পক্ষ থেকে সেই আলোচনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংগঠনের চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়া।

● **বন্যায় মৃত ৩১ :**

দু দিনের বন্যায় রাজ্যে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে ১১ নভেম্বর ঘোষণা করল তামিলনাড়ু সরকার। প্রশাসন জানিয়েছে, ডুবে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৭ জনের। দেওয়াল ভেঙে ও বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ৪ জনের।

● **যুদ্ধবিমান চালাবেন মহিলারাও সায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের :**

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এবার যুদ্ধবিমান চালাতে পারবেন মহিলা পাইলটরাও। সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবটি ২৪ অক্টোবর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অনুমোদন পেয়েছে।

এই মুহূর্তে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে রয়েছেন দেড় হাজার মহিলা। তাঁদের মধ্যে ৯৪ জন পাইলট রয়েছেন, যাঁরা বিমানবাহিনীর বিভিন্ন জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমান চালাতেন। তাঁদের দিয়ে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারগুলিও চালানো হত। নেভিগেটর বিমানগুলিও চালিয়েছেন মহিলা পাইলটরা। কিন্তু, এত দিন বিমানবাহিনীতে মহিলা পাইলটরা কখনও যুদ্ধবিমান চালাননি।

● **অন্ধ্রের নব-রাজধানী অমরাবতীর শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী :**

সংসদ ভবনের মাটি আর যমুনার জল নিয়ে গিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী শহর অমরাবতীর শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শিলান্যাসের পর অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ওই মাটি আর জল তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী।

কৃষ্ণা নদীর তীরে গুন্টুর জেলার উড়ানদারায়ুনিপালেম গ্রামে ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠানে নতুন শহরের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। মেগা স্টার অমিতাভ বচ্চন ছাড়াও এ দিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও, স্থানীয় সাংসদ বেঙ্কাইয়া নাইডু-সহ জনাকয়েক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিশিষ্ট শিল্পপতিরা। জাপান ও সিঙ্গাপুরের কয়েকজন মন্ত্রী, শিল্পপতিও ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে। ছিলেন ১৪টি বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধিরাও।

অন্ধ্রপ্রদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী বিজয়ওয়াড়ার ৪০ কিলোমিটার দূরে অমরাবতী শহরটিকে নতুন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার 'মাস্টার প্ল্যান' বানানো হয়েছে।

● **শিশু ধর্ষণের শাস্তি হোক লিঙ্গচ্ছেদ—মাদ্রাজ হাইকোর্ট বলল কেন্দ্রকে :**

আইনের ফাঁক গলে শিশুদের ধর্ষণ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে অপরাধীরা। এবার সেই ধর্ষকদের শাস্তির জন্য আরও কড়া আইন প্রণয়ন করতে কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। শিশুদের ধর্ষণ করলে শাস্তি হিসেবে লিঙ্গচ্ছেদের মতো কড়া দাওয়াই দেওয়া উচিত বলে মনে করে ওই আদালত। ২৫ অক্টোবর একটি মামলার রায় দেওয়ার সময় কেন্দ্রকে এমনটাই বার্তা দিয়েছে হাইকোর্ট।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি এন কিরুবাকারন জানিয়েছেন, কড়া আইন থাকা সত্ত্বেও ভারতে বাড়ছে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা। আইনের ফাঁক গলে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে অপরাধীরা। তাঁর কথায়, এক্ষেত্রে লিঙ্গচ্ছেদের সাজা শোনালে কমবে এই অপরাধের সংখ্যা।

ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা-সহ ন'টি আমেরিকান প্রদেশ, রাশিয়া, পোল্যান্ডে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের শাস্তি লিঙ্গচ্ছেদ। সেখানে এই শাস্তির আইনি প্রচলনের পরেই অনেক কমেছে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা।

আদালতের মতে, এই শাস্তি নৃশংস হলেও শিশু ধর্ষণের নৃশংসতা আটকাতে পালটা নৃশংস হওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোনও উপায় নেই। আদালতের বিশ্বাস, শাস্তির মাত্রা চরম হলে তবেই অপরাধ করার আগে ভয় পাবে অপরাধীরা।

এই রাজ্য

● **রাজ্যে সেচের কাজে মুগ্ধ কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী উমা ভারতী :**

১ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী উমা ভারতী।

কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী এদিন বিধাননগরের জলসম্পদ দপ্তরে রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সেচ সচিব এবং বিভাগীয় কর্তাদের সঙ্গে সেচের বিভিন্ন প্রকল্প এবং সমস্যার বিষয়ে বৈঠক করেন। তারপরেই তিনি সেচ দপ্তর-সহ রাজ্যের অন্যান্য দপ্তরের কাজের প্রশংসা করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, এ রাজ্যের সেচ দপ্তরের সাফল্যের উদাহরণ দেখিয়ে অন্য রাজ্যগুলিকেও সেচে উন্নতি করতে বলা হবে।

রাজ্য সেচ দপ্তর সূত্রের খবর, এ দিনের বৈঠকে সেচের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী। আয়লা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে পুনর্গঠনের কাজ, খাল-বিল সংরক্ষণ-সহ বিভিন্ন নদী-বাঁধ তৈরির অতীত ও বর্তমান রিপোর্ট এবং ছবি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

● **বাণিজ্য মেলায় বিপণন শুধু কাজের খতিয়ানের :**

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৫ নভেম্বর দিল্লির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পশ্চিমবঙ্গের প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন। রাজ্য সরকার গত সাড়ে চার বছরে কী কী কাজ করেছে, দিল্লির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় শুধু সেই ছবিই তুলে ধরা হল। শিল্প বা বাণিজ্যর আহ্বান নয়। বাণিজ্য মেলায় তাই 'পাহাড় হাসছে' থেকে জঙ্গলমহল কাপ, কন্যাশ্রী-শিক্ষাশ্রী-যুবশ্রী থেকে সংখ্যালঘু উন্নয়ন, জল ধরো, জল ভরো' থেকে কিষাণ কার্ডেরই জয়গান!

পশ্চিমবঙ্গের প্যাভিলিয়নে একদিকে যেখানে শিল্পের বদলে পর্যটন থেকে সংস্কৃতি, বাউল বা সিনেমার উপরেই জোর বেশি। সেখানেই সদ্য প্রকাশিত নেতাজি সংক্রান্ত ফাইলের ডিভিডি তিনশো টাকা দরে বিক্রি করেছে কলকাতা পুলিশ।

● **পাটশিল্প নিয়ে কেন্দ্রের বৈঠকে গরহাজির রাজ্য :**

কেন্দ্রের ডাকা বৈঠকটির আলোচনার মূল বিষয় ছিল পাটশিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংকট। অথচ সেখানে হাজির ছিলেন না রাজ্যের একজন প্রতিনিধিও। ফলে পাটশিল্পের সংকট নিয়ে কার্যত কোনও কথাও হতে পারেনি।

৫ নভেম্বর দিল্লিতে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের ডাকা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ১০টি রাজ্যের বস্ত্রমন্ত্রীরা। আরও ১৬টি রাজ্য পাঠিয়েছিল বস্ত্র দপ্তরের অফিসারদের। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছিলেন না কেউই। অথচ রাজ্যে ২০টিরও বেশি চটকল বন্ধ। সংকটে বার্ষিক ১৪ হাজার কোটি টাকা লেনদেনের পাটশিল্প।

তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া রাজ্যে আর কোনও শিল্পে এত বেশি লেনদেন হয় না। সম্প্রতি এই শিল্পে কাঁচা পাটের জোগান নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছে। একের পর এক চটকল বন্ধ হচ্ছে। এসব নিয়ে আলোচনার জন্যই কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার এদিন বৈঠক ডাকেন। সংশ্লিষ্ট সব রাজ্যকেই বৈঠকে ডাকা হয়।

● **শিল্পের অভাবে রাজ্যে ঝিমিয়ে নির্মাণ প্রকল্পও :**

চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে কলকাতায় অফিস তৈরির জায়গার চাহিদা কমেছে ৩০ শতাংশ। উলটোদিকে, ঠিক একই সময়ে মুম্বই, দিল্লি থেকে শুরু করে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই শহরে তা বেড়েছে। কলকাতায় চাহিদার অভাব সরবরাহের ক্ষেত্রেও ছাপ ফেলেছে। নতুন প্রকল্প তৈরি করতে ভরসা পাচ্ছে না নির্মাণ সংস্থারা। পরিস্থিতি এতটাই বেহাল যে, নির্মীয়মাণ প্রকল্পে কাজের গতি কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের খবর। পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রকল্প সম্পূর্ণ করার সময়সীমা। কারণ শহর জুড়ে অফিস তৈরির যে-পরিমাণ জায়গা ফাঁকা, তার জন্যই খদ্দের পাচ্ছে না নির্মাণ সংস্থারা।

সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ সংস্থা সিরিলের সমীক্ষা বলছে, চলতি আর্থিক বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে কলকাতায় মাত্র ১ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গফুট জায়গা অফিস তৈরির জন্য নিয়েছে কর্পোরেট মহল। মুম্বই ও দিল্লি শহরে এই অঙ্ক যথাক্রমে ১০ লক্ষ ও ২৬ লক্ষ বর্গফুট। বেঙ্গালুরুতে ২৮ লক্ষ বর্গফুট। চেন্নাইয়ে ৩০ লক্ষ বর্গফুট। চাহিদার ঊর্ধ্বগতি যে এই সব শহরে রয়েছে, তার মূল কারণ ই-কমার্স, তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম শিল্পের রমরমা।

● **ছ'টি রাজ্য হাত মিলিয়ে নয়া খনন সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে :**

বীরভূমের মহম্মদবাজার ব্লকে দেউচা-পাচামি কয়লাখনি পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচটি রাজ্যের নামে বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রক। সম্প্রতি ওই ছ'টি রাজ্য মিলে তৈরি করেছে বেঙ্গল বীরভূম কোলফিল্ডস লিমিটেড। এই সংস্থার তত্ত্বাবধানেই দেউচা-পাচামি থেকে কয়লা তোলা হবে। ২৮ অক্টোবর সংস্থার পরিচালন পর্ষদের প্রথম বৈঠকে ঠিক হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব কয়লা তোলা শুরু হবে।

খনন শুরু হলে ওই অঞ্চলের মানুষের যেমন কর্মসংস্থান হবে, তেমনই আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোও বদলে যাবে। দেউচা থেকে কয়লা পাবে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও কর্ণাটক, বিহার, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ। মোট কয়লার ২৮ শতাংশ পাবে পশ্চিমবঙ্গ।

● **এবার নেটে মঞ্জুষার পণ্য :**

আগস্টের চুক্তি অনুযায়ী, ২৮ অক্টোবর, থেকে নেট-বাজারের বিকিকিনিতে নাম লেখাল পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম (মঞ্জুষা)। হস্তশিল্পের রকমারি পণ্য অনলাইনে বিক্রি করতে ই-কমার্স সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে মঞ্জুষা। ই-কমার্স সংস্থাটির ওয়েবসাইটে তাদের পণ্য বিক্রি শুরু হল এ দিনই। সল্টলেকে নিগমের দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে তার সূচনা করলেন মঞ্জুষার চেয়ারম্যান অজয় দে।

১৯৭৬ সালে তৈরি হওয়া মঞ্জুষা। পণ্য বিক্রি ও বিপণনের জন্য বিপণি, প্রদর্শনী, মেলা ও অনুষ্ঠানে হাজির থাকার পাশাপাশি এবার নেট-বাজারকেও আঁকড়ে ধরল তারা। সংস্থা-কর্তারা মানছেন, তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নতুন পথ খোঁজা ছাড়া উপায় ছিল না।

সেই কারণেই অনলাইনের হাত ধরা। প্রযুক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরাসরি ক্রেতাদের দরজায় হস্তশিল্প পৌঁছে দিতে বেশ কিছুদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠছে ই-কমার্স সংস্থাগুলি।

● **ভুল স্বীকার করল রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ :**

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই উপচে ওই এলাকার বক্রেশ্বর এবং চন্দ্রভাগা নদীকে দূষিত করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়া নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিল রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। ১৩ নভেম্বর পরিবেশ আদালতে হলফনামা দিয়ে নিঃশর্ত ক্ষমাও চেয়েছেন পর্ষদের সদস্য-সচিব সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং ইঞ্জিনিয়ার অঞ্জন ফৌজদার।

ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ছাড়পত্র দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল আদালত। ছাড়পত্র দেওয়ায় কেন সদস্য-সচিব এবং সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারকে জরিমানা করা হবে না, সে প্রশ্নও তুলেছিল বিচারপতি প্রতাপ রায় ও বিশেষজ্ঞ-সদস্য পি সি মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন দুই পর্ষদ-কর্তা হলফনামা দিয়ে ক্ষমা চাইলেও তাঁদের শাস্তি হবে কি না, তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কলকাতায় জাতীয় পরিবেশ আদালতের (ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল) পূর্বাঞ্চলীয় ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত জানিয়েছে, আগামী ৩০ নভেম্বর এ ব্যাপারে রায় ঘোষণা করা হবে।

● **নির্মল বাংলা গড়তে সাহায্য ইউনিসেফের :**

দেশজুড়ে চলা 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানের অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে শুরু হয়েছে নির্মল বাংলা অভিযান। আর নির্মল বাংলা অভিযানে রাজ্যের পাশে দাঁড়াবে ইউনিসেফ। রাজ্য সরকারকে তারা প্রযুক্তিগত ও অন্য সহায়তা দেবে।

'নির্মল বাংলা' অভিযানে কী কাজ হয়েছে তা নিয়ে ৫ নভেম্বর সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের এক প্রতিনিধি দল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে তাঁরা বৈঠক করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং নির্মল বাংলা অভিযানে যুক্ত রাজ্য পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে।

● **আইআইইএসটি-তে বর্জ্য পচিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নয়া প্রকল্প :**

রান্নাঘরের বর্জ্য যেমন পচা ফুলকপির অংশ, কুমড়ো বা আলুর খোসা, পচা ডিম বা মাছের কাঁটা—এই সব ব্যবহার করেই এ বার বিদ্যুৎ তৈরির সিদ্ধান্ত নিল হাওড়ার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইইএসটি)। ওই সমস্ত বর্জ্য পচিয়ে বিদ্যুৎ তৈরির কাজ শুরু করলেন হাওড়ার ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও পড়ুয়ারা। ৯ নভেম্বর, এই প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা অজয় রায়।

গত বছর রাজ্য সরকারকে এ রকম একটি প্রকল্পের প্রস্তাব দেয় আইআইইএসটি। এ বার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থ এবং সরকারি সহায়তায় ওই প্রকল্প চালু করা হল। পরিবেশকে দূষিত না করে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পাঁচ বছর আগেই 'কালচার অব এক্সেলেন্সেস অব গ্রিন এনার্জি' গঠন করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। এই প্রকল্প তারই অংশ।

● **প্রাক্তন স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিম প্রয়াত :**

২ নভেম্বর সকাল ১০টা ১০ নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০। বেশ কিছু দিন ধরেই শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তিনি। প্রায় ২৯ বছর তিনি একটানা স্পিকারের দায়িত্ব সামলেছেন। গোটা দেশে এমন উদাহরণ আর নেই।

রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে ১৯৭৭-এ। সেই বছরই সিপিএম প্রার্থী হিসেবে উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙা থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন হালিম। এর পর তিনি ৬ বার বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছেন। তবে শেষ পাঁচ বছর তিনি এন্টালির বিধায়ক ছিলেন। প্রথম বার বিধায়ক হয়েই আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান। পাঁচ বছর সেই দায়িত্ব সামলানোর পর ফের জিতে বিধানসভায় পেলেন নতুন দায়িত্ব। ১৯৮২-তে হালিম বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত হন। সেই থেকে ২০১১-য় রাজ্যে পালাবদলের সরকার আসার আগে পর্যন্ত তিনিই সামলেছেন স্পিকারের দায়িত্ব।

অর্থনীতি

● **রঘুরাম রাজন বিআইএস পর্ষদের ভাইস-চেয়ারম্যান :**

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর রঘুরাম রাজন ১০ নভেম্বর থেকে শুরু করে আগামী তিন বছরের জন্য ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটলমেন্টস-এর (বিআইএস) পরিচালন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করে নতুন পদে রাজনকে স্বাগত জানিয়েছেন পর্ষদের চেয়ারম্যান জেনস উইডম্যান।

বিআইএস পরিচালন পর্ষদের ডিরেক্টর হিসেবে রাজন যোগ দিয়েছিলেন গত ২০১৩ সালে। এবং বর্তমানে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারপার্সন জেনেট ইয়েলেন, ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর মার্ক কার্নি, ব্যাংক অব জাপানের গভর্নর হারুহিকো কুরোদা প্রমুখ।

বিশ্বের প্রাচীনতম আর্থিক সংস্থা বিআইএসের কাজ হল, বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন ও সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা। যাতে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। সুইৎজারল্যান্ডের বাসেলে সদর দফতর থাকা বিআইএস বছরে ছ'বার বৈঠকে বসে।

● **আইএমএফ-এ সুবীর গোকর্ণ :**

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (আইএমএফ) পর্ষদে এগ্‌জিকিউটিভ ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন সুবীর গোকর্ণ। তিনি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (আরবিআই) প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর। আরবিআইয়ের আর এক

প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর রাকেশ মোহনের জায়গায় এলেন গোকর্ণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি এতে সায় দিয়েছে। আইএমএফে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং ভুটানের প্রতিনিধিত্ব করবেন গোকর্ণ।

● ভারতীয় রেলের ইঞ্জিন ও কামরা বানাবে অ্যালস্টম, জেনারেল ইলেকট্রিক :

এ বার এ দেশে রেলের বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেনগুলি বানাবে ফরাসি সংস্থা 'অ্যালস্টম'। আর, ডিজেলে চলা ট্রেনগুলি বানাবে মার্কিন সংস্থা 'জেনারেল ইলেকট্রিক'।

ওই ট্রেনগুলি বানানোর জন্য মার্কিন ও ফরাসি সংস্থার সঙ্গে ৩৭ হাজার কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে ভারতীয় রেলের। চুক্তি মোতাবেক, ভারতীয় রেলের ৮০০টি বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেন বানিয়ে দেবে ফরাসি সংস্থা 'অ্যালস্টম'। ওই ট্রেনগুলি বানানোর জন্য ফরাসি সংস্থাটি বিহারে একটি কারখানা গড়বে। আর মার্কিন সংস্থা 'জেনারেল ইলেকট্রিক' বানিয়ে দেবে এক হাজার ডিজেলে চলা ট্রেন। ওই ট্রেন বানানো আর তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এ দেশে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে মার্কিন সংস্থাটি। ডিজেলে চলা ট্রেনগুলি বানিয়ে দেওয়ার জন্য 'জেনারেল ইলেকট্রিক'-এর সঙ্গে ১৭ হাজার কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে ভারতীয় রেলের।

● ভোডাফোন ফের ১৩ হাজার কোটি লগ্নি করবে ভারতে ১৪ নভেম্বর :

এ বার লন্ডনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে ভোডাফোন গোষ্ঠীর শীর্ষ কর্তা ভিত্তোরিও কোলাও জানালেন, আগামী দিনে এ দেশে তাঁরা আরও ১৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন।

সংস্থা জানিয়েছে, এর মধ্যে ৮ কোটি টাকা খরচ করা হবে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ খাতে। প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে এ দেশে দু'টি ক্ষেত্রে মোট ৪ হাজার কোটি টাকা লগ্নি করবেন তাঁরা।

হাচিসন-এসারের সিংহভাগ শেয়ার কিনে নিয়ে ২০০৭-এ ভারতে ব্যবসা শুরু করেছিল ব্রিটিশ বহুজাতিকটি। উল্লেখ্য, এখন ভারতীয় সংস্থাটি ব্রিটিশ বহুজাতিকের সম্পূর্ণ শাখা সংস্থা। এই ব্রিটিশ বহুজাতিক টেলিকম সংস্থাটি এখনও পর্যন্ত ভারতে ১ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

গত অক্টোবর মাসে কোলাও ভারত সফরের সময়ে এ দেশের বাজারে শেয়ার ছাড়ার ইঙ্গিত দেন। এ বার লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে নতুন করে লগ্নির কথা জানাল তারা।

● উন্নত পরিষেবা দিতে বিকল্প পথে বিএসএনএল :

গ্রাহকের ভোগান্তি ও ব্যবসার ক্ষতি এড়াতে এ বার পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিএসএনএল। কারণ, শুধু টাকার অঙ্কে লোকসানই নয়, পরিষেবা বন্ধ থাকলে তা সংস্থার ভাবমূর্তিকেও ধাক্কা দেয়।

নিজেদের ওএফসি-র পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থায় ফোনের পরিষেবা চালু রাখতে তারা পাওয়ার গ্রিড-এর 'ওভারহেড' ওএফসি-ও ভাড়া করছে। পাওয়ার গ্রিডের যে-লাইন দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়, তারই মধ্যে থাকা ওএফসি দিয়ে আলাদা ভাবে ফোনের পরিষেবাও দেবে বিএসএনএল-এর পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল। মাস দেড়েকের মধ্যে গোটা ব্যবস্থা চালু হবে বলে আশা সংস্থা-কর্তাদের। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো দেশের কিছু এলাকায় এই ব্যবস্থায় ফোনের পরিষেবা চললেও পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম তা চালু হবে।

● আয়কর আইন সরল করতে কমিটি :

আয়কর আইনের কোন কোন ধারা নিয়ে জটিলতা তৈরি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে ২৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি আর ভি ঈশ্বরের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করেছে।

এক দিকে বিনিয়োগের পথ মসৃণ করা। অন্য দিকে আইনি জটে আটকে থাকা রাজস্ব উদ্ধার করে সরকারি কোষাগারের ঘাটতি পূরণ। এই দুই লক্ষ্য পূরণ করতে আগামী বাজেট আয়কর আইন সরল করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ, জটিলতা তৈরি হওয়ার ফলে থমকে থাকছে কর আদায়।

দশ সদস্যের ওই কমিটিকে আগামী বছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সুপারিশ জমা দিতে বলা হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে ২০১৬-'১৭-র বাজেট পেশের সময়েই সেই সুপারিশ মেনে কিছু ঘোষণা করা হতে পারে।

এ দিকে, সাধারণ আয়করদাতাদের সুবিধার্থে 'ই-সহযোগ' পোর্টাল চালু করল অর্থমন্ত্রক। আয়কর রিটার্নের হিসেবে কোনও ফারাক থাকলে ওই পোর্টালে গেলেই তা দেখা যাবে। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের প্যান-কার্ড তৈরির জন্যও বিশেষ শিবির চালু করছে মন্ত্রক। এখন ১ লক্ষ টাকার উপরে যে-কোনও লেনদেনেই প্যান-নম্বর জানাতে হয়। তাই আরও বেশি মানুষের জন্য প্যান-কার্ড তৈরি করাতে চাইছে সরকার।

● ক্রমশ এগোচ্ছে ভারতীয় প্রযুক্তি বাজার :

বিশেষজ্ঞ সংস্থা গার্টনারের সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে আন্তর্জাতিক স্তরের প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছে ভারতীয় প্রযুক্তি বাজার।

২৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি চিহ্নিত করেছে গার্টনার। সংস্থার দাবি, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নতির জন্য এগুলি প্রাসঙ্গিক। গার্টনারের সমীক্ষা বলছে, কয়েক বছর আগেও দেখা যেত, ভারতের প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক স্তরের তুলনায় প্রায় দু'বছর পিছিয়ে। সেই ফারাক ক্রমশ কমছে বলে দাবি তাঁর।

গার্টনারের দাবি, চলতি বছরে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবসা ৫.৫ শতাংশ হারে বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা বাস্তবায়িত হলে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত হারে বাড়তে থাকা বাজার।

● **একে-৪৭ রাইফেল এবার 'মেড ইন ইন্ডিয়া' :**

একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল এ বার ভারতেই বানানো যাবে। এ দেশেই বানানো হবে ওই বিদেশি অস্ত্র নির্মাণ সংস্থার বেশ কয়েকটি সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও।

সৌজন্যে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগান। যার জন্য বিদেশি অস্ত্র এ দেশে বানাতে সরকারি লাইসেন্স পাওয়ার হ্যাপা অনেকটাই কমে গিয়েছে ভারতীয় কোম্পানিগুলির।

এ দেশে কালাশনিকভ রাইফেল-সহ তাদের অন্যান্য কয়েকটি সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বানানোর জন্য একে-৪৭ রাইফেল প্রস্তুতকারক সংস্থাটি রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ভারতীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। অ্যাসল্ট রাইফেল-সহ বিভিন্ন সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বানানোর জন্য তারা ভারতীয় অস্ত্র নির্মাণ সংস্থাগুলিকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ দিতেও রাজি হয়েছে।

কালাশনিকভ প্রস্তুতকারক সংস্থার (সাবেকি নাম-ইঝমাশ) সিইও আলেক্সি ক্রিভোরুচকো ৯ নভেম্বর এ কথা জানিয়েছেন।

● **মুডিজের পূর্বাভাস :**

ভারতের অর্থনীতির জন্য কিছুটা স্বস্তির বার্তা বয়ে নিয়ে এল মার্কিন উপদেষ্টা সংস্থা মুডিজের পূর্বাভাস—বহির্বিশ্বের ঝুঁকি সামলে ২০১৫ ও ২০১৬ সালে এ দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার হবে ৭-৭.৫ শতাংশ। যা জি-২০ গোষ্ঠীর দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

২২ অক্টোবর প্রকাশিত এক রিপোর্টে মুডিজ জানিয়েছে, অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক দ্রুত বৃদ্ধির চাকায় গতি ফেরাতে পারা এবং সংস্কারের পথে হাঁটার ইতিবাচক প্রভাব ভারতের অবস্থান পোক্ত করেছে। যে কারণে বাইরের জগতের ঝুঁকিগুলি সহজে কাবু করতে পারবে না এই অর্থনীতিকে।

রিপোর্টে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তুরস্ক, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ার মতো সম্ভাবনাময় বাজারের দেশগুলিকেও। বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক নানা ধরনের ঝুঁকি সামলানোর ক্ষমতা রয়েছে এদেরও। তবে ভারতকে সকলের থেকেই এগিয়ে রেখেছে তারা। উপদেষ্টা সংস্থাটির সমীক্ষা অনুযায়ী, চাপ কাটিয়ে উঠে বৃদ্ধির পথে ফেরার ক্ষমতা পুরোমাত্রায় বহাল রয়েছে ভারতীয় অর্থনীতিতে।

● **ভারত এগোল বিশ্বব্যাংকের তালিকায় :**

শিল্প-বাণিজ্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির নিরিখে বিশ্বব্যাংকের তালিকায় উপরে উঠে এল ভারত। গত বছর ১৮৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১৪২-তম স্থানে। এ বার এক লাফে ১২ পা এগিয়ে ১৩০-তম স্থানে উঠে এল ভারত।

বিশ্বব্যাংকের মুখ্য অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু ২৯ অক্টোবর ওয়াশিংটনে বলেছেন, এক ধাপে ১২ পা এগিয়ে যাওয়া ইতিবাচক ইঙ্গিত। এ ভাবেই যদি আর্থিক সংস্কারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে থাকে এবং সেই সংস্কারের গতি আর একটু বাড়ে, তাহলে ভারত প্রথম ১০০টি দেশের তালিকায় চলে আসতে পারে।

উল্লেখ্য, চীন এবার এক পা পিছিয়েছে। ফলে মন্দাগ্রস্ত চীনের তুলনায় ভারতকে লগ্নির গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা আরও সহজ হবে।

● **স্বর্ণমুদ্রা-সহ সোনা নিয়ে নতুন ৩ প্রকল্পের সূচনা :**

সোনা নিয়ে ৫ নভেম্বর নতুন ৩ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীনতার ৬৯ বছরে দেশে এই প্রথম চালু হল স্বর্ণমুদ্রা। চালু হল ঘরের সোনাদানা ব্যাংকে জমা রেখে তার ওপর সুদ পাওয়ার প্রকল্প। নতুন একটি স্বর্ণ-বন্ড প্রকল্পও চালু করা হল।

দেশের প্রথম স্বর্ণমুদ্রার এক পিঠে রয়েছে অশোকচক্র। অন্য পিঠে 'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধীর মুখ। প্রাথমিকভাবে বাজারে ছাড়া হচ্ছে পাঁচ ও দশ গ্রাম ওজনের স্বর্ণমুদ্রা।

একই সঙ্গে ঘরের সোনাদানা ব্যাংকে জমা রেখে বাড়তি রোজগারের এক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। এর লক্ষ্য, ঘরের আলমারি বা ব্যাংকের লকারে থাকা সোনাকে ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা, যাতে সোনা আমদানির পরিমাণ কমানো যায়। কমানো যায় রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণও।

নতুন স্বর্ণ-বন্ড প্রকল্পে দেওয়া হবে পৌনে তিন শতাংশ সুদ। এর ফলে বাজার থেকে সোনা কেনার হিড়িক কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সোনা আমদানির জন্য ২০১৩ সালে দেশের রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৯ হাজার কোটি ডলার। সেটা ছিল একটা 'রেকর্ড'। গত বছরে তা অনেকটা কমে হয়েছিল ৩৪০০ কোটি ডলার।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **৪০০০ কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি-৪'-এর সফল উৎক্ষেপণ :**

ওড়িশা উপকূলের আবদুল কালাম দ্বীপে ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ (আইটিআর) থেকে ৯ নভেম্বর সকাল পৌনে দশটায় 'অগ্নি-৪' ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ হয়। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি পরমাণু অস্ত্র ছোঁড়ার ক্ষমতা রাখে চার হাজার কিলোমিটার দূরের টার্গেটেও।

১৭ টন ওজনের কুড়ি মিটার লম্বা, ভূমি থেকে ভূমিতে ছোঁড়ার ওই ক্ষেপণাস্ত্রটির সফল উৎক্ষেপণ হয় এদিন সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে।

ওই সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রের কম্পিউটার-প্রযুক্তি পঞ্চম প্রজন্মের। আকাশে কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ হলে, তা মেরামত করে নিয়ে

ক্ষেপণাস্ত্রটিকে তার লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

খেলার জগৎ

● **চায়না ওপেনে হেরে গেলেন সাইনা নেহওয়াল :**

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরও জয় ছিনিয়ে নিতে পারলেন না সাইনা নেহওয়াল। ১৫ নভেম্বর চায়না ওপেনের ফাইনালে চীনের লি জুয়েরুইয়ের কাছে ১২-২১ এবং ১৫-২১ পয়েন্টে হেরে যান তিনি।

ফাইনালে ওঠার পর থেকেই সাইনা নেহওয়ালের উপর প্রত্যাশা যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। এদিন কোর্টে নামার পর থেকেই একটু চাপে ছিলেন সাইনা। খেলা শুরু হতেই সেই চাপ কাটিয়ে উঠে প্রতিপক্ষকে যোগ্য জবাবও দিচ্ছিলেন। কিন্তু লি যেভাবে একের পর এক পয়েন্ট সংগ্রহ করছিলেন, তাতে বেশ চাপেই পড়ে যান সাইনা। প্রথম গেমের প্রথম দিকে দুজনের লড়াই ছিল দেখার মতো। দর্শকে ঠাসা গ্যালারি যেন শ্বাস বন্ধ করে খেলা উপভোগ করছিলেন। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, লি-এর আক্রমণের ঝাঁঝও তত বেড়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয় গেমে ফের ছন্দে ফিরে আসেন সাইনা নেহওয়াল। প্রথম দিকে ৪-০-তে লিড নেয়। মুভমেন্টও যথেষ্ট ভাল ছিল তাঁর। আরও রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় গেম। লি পিছিয়ে থেকেও সাইনা নেহওয়ালকে একটা সময় ছুঁয়ে ফেলেন। স্কোর তখন ১৫-১৫। তারপর সাইনাকে আর ঘুরে দাঁড়ানোরই সুযোগ দেননি লি। সেখান থেকে ১৫-২১-এ ম্যাচ বের করে নিয়ে যান।

● **আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দুই ভারতীয় তারকার অবসর :**

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে জাহির খান (১৫ অক্টোবর) ও বীরেন্দ্র সেহওয়াগ (২০ অক্টোবর) অবসর ঘোষণা করলেন।

জাহির খান মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার শ্রীরামপুর শহরে ৭ অক্টোবর, ১৯৭৮ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০০০ সাল থেকে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দল বা টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম সদস্য। জাহির খান ৩ জানুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ৩য় টেস্টের ১ম ইনিংসে জ্যাক ক্যালিসকে কট আউটের মাধ্যমে ২৭০টি উইকেট লাভ করেন।

বীরেন্দ্র সেহওয়াগের জন্ম ২০ অক্টোবর ১৯৭৮। ১৯৯৯ সালে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার অভিষেক ঘটে এবং ২০০১ সালে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলে জায়গা পান। তিনি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ডানহাতি ব্যাটসম্যান এবং ডানহাতি অফ ব্রেক বোলার। তিনি একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ২১৯ রান করে এই ধারায় রেকর্ডধারী হিসেবে স্বীকৃত।

বিবিধ সংবাদ

● **ভীম রাও আম্বেদকর জাদুঘরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী :**

১৪ নভেম্বর ভীম রাও আম্বেদকর জাদুঘরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে পড়াকালীন উত্তর লন্ডনের চক ফার্মের এই বাড়িটিতেই থাকতেন আম্বেদকর। মহারাষ্ট্র সরকারের সৌজন্যে বর্তমানে সেই বাড়িটিকে জাদুঘর হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত বাড়ির এক তলাকেই সাজানো সম্ভব হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ২০ ডিসেম্বরের পরে জাদুঘরটিকে আরও সাজিয়ে তোলার জন্য তা কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশও।

● **৩৫০০ বছরের সমাধি ও সম্পদ মিলল গ্রিসে :**

গ্রিসের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের প্রাচীন শহর পাইলোয় প্রত্নতত্ত্ববিদ দম্পতি জ্যাক এল ডেভিস এবং শ্যারন আর স্টকারের নেতৃত্বে খননকার্য চালাচ্ছিল একটি দল। গত ২৫ বছর ধরে পাইলোতেই কাজ করছেন তাঁরা। সেখানে একটি ৫ ফুট গভীর, ৪ ফুট চওড়া এবং লম্বায় প্রায় ৮ ফুট সমাধির খোঁজ পান।

সমাহিত ব্যক্তির দেহাবশেষের পাশাপাশি পাওয়া গেছে সোনা, রুপো এবং ব্রোঞ্জের সম্পদ। সমাহিত ব্যক্তির পায়ের কাছে ছিল হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি করা একটি স্মারক। তাতে খোদাই করা ছিল 'গ্রিফিন' নামের এক পৌরাণিক প্রাণীর অবয়ব। ড. ডেভিস এবং ড. স্টকার তাই ওই সমাধির নাম দিয়েছেন 'গ্রিফিন যোদ্ধার সমাধি'।

'গ্রিফিন যোদ্ধার' সমাধিতে যেসব জিনিস পাওয়া গিয়েছে, সেগুলিতে মিনো সভ্যতার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু যে জায়গা থেকে সমাধিটি উদ্ধার হয়েছে সেখানে গড়ে উঠেছিল মাইসিন সভ্যতা। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে মিনো এবং মাইসিনরা একাধিকবার যুদ্ধে জড়িয়েছে। ফলে 'গ্রিফিন যোদ্ধা'-র সমাধি থেকে পাওয়া সম্পদগুলি তাঁর নিজের এলাকার নাকি লুঠতরাজ করে পাওয়া—সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এমনকী যে ধরনের জিনিসগুলি তাঁর সমাধিতে দেওয়া হয়েছে, তার কোনও অন্তর্নিহিত অর্থ থাকতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। দুই সভ্যতার বহু অজানা প্রশ্নের উত্তর এই সমাধিতেই লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

● **খরায় জলস্তর কমে মেক্সিকোর প্রাচীন গির্জার ফের আত্মপ্রকাশ :**

সেই ১৯৬৬ সালে জলের অতলে মুখ লুকিয়েছিল সে। মাঝে একবার মাথা তুলেছিল ২০০২ সালে। সেই শেষ। তারপর এতদিন বাদে, পাক্কা ১৩ বছর পরে জল থেকে মাথা তুলে দেখা দিল মেক্সিকোর ষোড়শ শতকের অ্যাপোস্টল সান্তিয়াগো গির্জা। খরায় জলস্তর কমে যাওয়াতেই গির্জাটির এহেন নাটকীয় আত্মপ্রকাশ।

প্রায় ৪৫০ বছরের পুরনো এই গির্জাটি স্থাপিত হয়েছিল ডমিনিকান সন্তদের হাতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এর উপর নেমে আসে জরাজীর্ণতার ছাপ। তারপর ১৯৬৬ সালে গ্রিজালভা নদিতে বাঁধ দেওয়ার সময়েই ঘটে দুর্যোগ। ছাপিয়ে যাওয়া জলের তলায় চিরতরে মুখ লুকোয় অ্যাপোস্টল সান্তিয়াগো গির্জা।

২০০২ সালে প্রায় ৬০ মিটার মতো দেখা গেলেও এবারে অবশ্য জলের ভিতর থেকে গির্জাটি মাত্র ১৫ মিটার মাথা তুলেছে। যদিও এতদিন ধরে জলের তলায় থাকতে থাকতে গির্জাটির ছাদ ভেঙে গিয়েছে। এখন সেই ভাঙাচোরা গির্জার থামের উপর এসে বসছে পাখি। কাছে গেলে দেখা যাচ্ছে, গির্জার দেওয়ালে জমেছে পুরু শ্যাওলা। সেভাবে জনপ্রিয় দ্রষ্টব্য না হলেও মেক্সিকোয় এখন এই গির্জা-ভ্রমণ শুরু হয়েছে। বলা তো যায় না, আবার কবে জলের তলায় মুখ লুকায় সে।

আর, সে আশঙ্কা অমূলকও নয়। ইতিমধ্যেই ভারী বর্ষণে বাড়তে শুরু করেছে নদীর জলস্তর। শতাব্দী প্রাচীন এই স্থাপত্য হয়তো ফের চলে যাবে জলের তলায়!

● **আফ্রিকার বিশালতম হাতির শিকার :**

জিম্বাবোয়ের গোনারঝৌ ন্যাশনাল পার্কের লাগোয়া এলাকায় অর্থের বিনিময়ে শিকারের অনুমতি মেলে। সম্প্রতি ৬০ হাজার ডলার খরচ করে সেখানে হাতি শিকারের অনুমতি নেন এক জার্মান শিকারি। স্থানীয় এক অভিজ্ঞ শিকারিকেও তিনি সঙ্গে নেন।

এই শিকারি যে হাতিটিকে শিকার করেছে, তার বয়স ৪০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। বিশাল পাহাড়ের মতো চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়ালে তার দাঁত দুটি মাটিতে ঠেকত। গত ৩০ বছর ধরে সেই ছিল আফ্রিকার সবচেয়ে বড় হাতি। জিম্বাবোয়ের গোনারঝৌ ন্যাশনাল পার্কে সে দিনই প্রথম দেখা গিয়েছিল তাকে। সেই শেষ দেখা। এখন তার অস্তিত্ব শুধুই সোশ্যাল সাইটে, ছবি হিসেবে।

শিকারির গুলি খেয়ে হাঁটু মুড়ে মাটিতে নেমে এসেছে পাহাড়ের মতো শরীরটা। পাশে বন্দুক হাতে উল্লাসের ভঙ্গিতে জার্মান শিকারি। এই ছবি সোশ্যাল সাইটে আসতেই নিন্দায় সোচ্চার পরিবেশ ও পশুপ্রেমীরা। ক্ষোভ ছড়িয়েছে অন্যান্য মহলেও।

মাস তিনেক আগেই সিসিল নামে একটি সিংহকে শিকারের খবর প্রকাশ্যে আসায় তোলপাড় হয়েছিল বিশ্বজুড়ে। এক মার্কিন দন্ত চিকিৎসক শখের শিকারে গিয়ে হংগে অভয়ারণ্যে একটি সিসিল নামে সিংহ শিকার করেন।

● **হার্ভার্ড হিউম্যানিটারিয়ান পুরস্কার পেলেন কৈলাস সত্যার্থী :**

নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী কৈলাস সত্যার্থীকে এবার বিশেষ সম্মান জানাল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। শিশু অধিকার রক্ষা ও শিশু শ্রমিক প্রথা অবলোপের জন্য তাঁর লড়াইয়ের কথা মাথায় রেখে তাঁকে দেওয়া হল এ বছরের 'হার্ভার্ড হিউম্যানিটারিয়ান পুরস্কার'। কৈলাস সত্যার্থীই প্রথম ভারতীয়, যিনি এই সম্মান পেলেন।

এর আগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া এই দুর্লভ সম্মান পেয়েছিলেন মার্টিন লুথার কিং সিনিয়র এবং রাষ্ট্রসংঘের চার মহাসচিব কোফি আন্নান, বুত্রোস বুত্রোস ঘালি, জেভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলার ও বান কি-মুনের মতো বিশিষ্ট জনেরা।

● **টুইটারে প্রথম অ-মার্কিন ইমোজি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' :**

টুইটারে এল প্রথম অ-মার্কিন কোনও ব্র্যান্ডের ইমোজি। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নামে এই ইমোজি ভারতকে বিশ্বে অন্যতম উৎপাদনশীল দেশ হিসেবে টুইটারে প্রচার করবে।

কমলার ওপর কালো সিংহের এই লোগো হ্যাশট্যাগ 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র পরই আসবে। সরকারি প্রচারমূলক এই লোগো সারা বিশ্বের টুইটার পেজে দেখা যাবে। ভারতীয় শিল্পের প্রচার বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম প্ল্যাটফর্ম টুইটার। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' খুব ভালো সাড়া পেয়েছে। ভারত এখন বিশ্বে বিনিয়োগের অন্যতম কেন্দ্র। ভারতকে বিশ্বের কাছে অন্যতম উৎপাদনশীল দেশ হিসেবে তুলে ধরার মাধ্যমে হবে টুইটার। সানফ্রান্সিসকোয় টুইটারের সদর দপ্তরে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ টুইটার সিইও জ্যাক ডোরসের সঙ্গে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনাও করেন।

● **ভারতের প্রথম রূপান্তরকামী সাব-ইন্সপেক্টর :**

এক ঐতিহাসিক রায়ে ৫ নভেম্বর মাদ্রাজ হাইকোর্ট তামিলনাড়ু ইউনিফর্মড সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (টিএনইউএসআরবি)-কে জানায়, সাব ইন্সপেক্টর পদে যোগ দেওয়ার সব যোগ্যতাই রয়েছে চেন্নাইয়ের কে পৃথিকা যশিনির। অতএব অবিলম্বে যেন তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। প্রথম রূপান্তরকামী হিসেবে সাব-ইন্সপেক্টর পদে যোগ দিলেন যশিনি। লিঙ্গ সাম্যের দিকে আর এক ধাপ এগোল এ দেশ।

একই সঙ্গে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, এবার থেকে চাকরিতে নিয়োগের সময় রূপান্তরকামীদের জন্য 'থার্ড ক্যাটাগরি'-র উল্লেখ করতে হবে। মাদ্রাজ হাইকোর্ট জানিয়েছে সংবিধান মেনেই একইরকম সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে যশিনির মতো সমস্ত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া ভিন্ন লিঙ্গের মানুষরা সরকারি শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে সবরকম সংরক্ষণের আওতায় পড়েন।

আদালতের এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন লিঙ্গের মানুষদের সমাজে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে অনেকটাই সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়।❑

সংকলক : পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

বিজ্ঞান এক্সপ্রেস—জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত এক অভিনব প্রয়াস

মর্যাদাপূর্ণ বিজ্ঞান (সায়েন্স) এক্সপ্রেস জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত থিমে নতুন রূপে সাজিয়ে তুলে গত ১৫ অক্টোবর থেকে 'সায়েন্স এক্সপ্রেস ক্লাইমেট অ্যাকশন স্পেশাল' (SECAS) হিসেবে চালানো হচ্ছে। এই বিশেষ ট্রেনের উন্নতমানের প্রদর্শনীর প্রধান লক্ষ্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে, বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রশমন ও অভিযোজনের মাধ্যমে কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করা যায়, সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের তরফ থেকে জলবায়ু শিক্ষা কেন্দ্র এই ট্রেনের ১৬ কামরার মধ্যে ৮ কামরায় ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী চালাচ্ছে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রথম পর্যায়ে ৭ মাসে সারা দেশে প্রায় ১৯,৮০০ কিমি রেলপথ সফর করবে। ২০টি রাজ্যের ৬৪টি স্থানে থামবে এই বিজ্ঞান প্রদর্শনী ট্রেন। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ও জানার আগ্রহ সঞ্চারে উৎসাহিত করতে এই সায়েন্স এক্সপ্রেস উদ্যোগ। এই প্রদর্শনী জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে এবং এর প্রভাব নিয়ে বিতর্ক-আলোচনা করারও সুযোগ করে দেবে। তেমনি প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে সমাধানের সম্ভাব্য কৌশল নিরূপণে দিশা দেখাতে ও দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পথকে সুস্থায়ী উন্নয়নের দিকে দ্রুত অভিযাত্রায় ভূমিকা পালন করবে। প্রদর্শনীটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাছে প্রাসঙ্গিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া। রেলমন্ত্রক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক, এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগ, 'সায়েন্স এক্সপ্রেস' ইতোমধ্যেই সারা ভারতে ৭ বার সফলভাবে সফর সেরেছে।

ভারত সরকারের এই উদ্ভাবনামূলক ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীটি চলছে ১৬ কামরার বাতানুকূল ট্রেনে। গত ৭ বছরে 'সায়েন্স এক্সপ্রেস' ১ লাখ ২২ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে—১৪০৪ দিনে ৩৯১ জায়গায় দাঁড়িয়ে ১.৩৩ কোটি দর্শকদের প্রদর্শনী দেখার সুযোগ দিয়েছে। এইভাবেই 'সায়েন্স এক্সপ্রেস' সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দর্শনার্থী-সহ হয়ে উঠেছে দেশের বৃহত্তম ও দীর্ঘতম ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, লিমকা বুক অফ রেকর্ডস-এ ৬ নজির গড়েছে এ পর্যন্ত।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নতুন ওয়েবসাইটের সূচনা

কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক একটি নতুন ওয়েবসাইট www.justclimateaction.org-এর সূচনা করেছে। ফ্রান্সের প্যারিসে আসন্ন জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন পর্যন্ত জাতীয়-স্তরে নির্ধারিত অভিপ্রেত নির্গমনের মতো ভারতের প্রতিশ্রুতি ও প্রচেষ্টাগুলিকে তুলে ধরার জন্যই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় জাতীয় স্তরে ভারতের পদক্ষেপ, এই সব পদক্ষেপের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসা এবং পদক্ষেপ সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত ও পরামর্শ প্রকাশ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় সব স্তরে স্বচ্ছতা রাখার ওপরও ওয়েবসাইটটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ওয়েবসাইটে যে সমস্ত উপাদান রয়েছে, তার অধিকাংশই ভিডিও। এই ওয়েবসাইটের যে কোনও পেজ, প্রতিবেদন বা ভিডিও আলাদাভাবে ('ব্রেক-অ্যাওয়ে অ্যান্ড প্লে' প্রযুক্তির মাধ্যমে) সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে শেয়ার করা যেতে পারে। প্রতিবেদন, ছবি ও ভিডিও মিলিয়ে মোট ৩০০ গিগা-বাইট (জিবি)-এর সম্ভার রয়েছে এই সাইটে। স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের মতো সমৃদ্ধ আঙ্গিক ব্যবহার করে দর্শকদের মন আকৃষ্ট করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

চার রাজ্যের সবুজ ভারত জাতীয় মিশনের পরিকল্পনা অনুমোদিত

সবুজ ভারত জাতীয় মিশনের জাতীয় প্রশাসনিক পরিষদের এক সাম্প্রতিক বৈঠকে মিজোরাম, মণিপুর, ঝাড়খণ্ড এবং কেরলা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করা হয়েছে। চার রাজ্য মিলিয়ে ৫-১০ বছরের পরিকল্পনা কালের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় মোট ৯০,২০২.৬৮ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় এ বছরের জন্য ১১,১৯৫.৩২ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কালে বনাঞ্চল ও অ-বন এলাকা মিলিয়ে মোট ১,০৮,৩৩৫ হেক্টর জমি সবুজ ভারত জাতীয় মিশনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮১,৯৩৯ হেক্টর বনাঞ্চলের উন্নয়ন ঘটানো হবে, এবং ১৬,৩৬৯ হেক্টর হল নতুন এলাকা। চলতি আর্থিক বছরের জন্য এই পরিসংখ্যান যথাক্রমে ২৮,২৫০ হেক্টর ও ৭,৮২৭ হেক্টর। চলতি আর্থিক বছরে ২৭,০৩২টা আর গোটা পরিকল্পনা কালে মোট ৮১,২৩৩টা গৃহস্থ পরিবারে জৈব গ্যাস, সৌরশক্তি, এল.পি.জি. এবং বায়োমাস-ভিত্তিক বিকল্প জ্বালানি সংস্থানের বিষয়টিও বৈঠকে অনুমোদন করা হয়। এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট সুবিধার পাশাপাশি অরণ্যের ওপর চাপ কমবে ও 'কার্বন বেনিফিট' বাড়বে।

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 20.00

December, 2015
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।